NAEEM
কিশোর থ্রিলার
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ৫৪
রকিব হাসান
সেবা
প্রকাশনী

ভলিউম-৫৪

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-1489-8
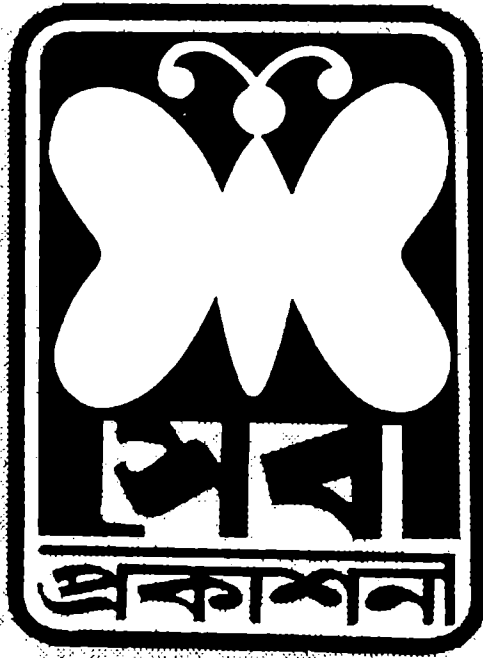
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩
রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ
হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩
Volume-54
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

ছেচল্লিশ টাকা

তিন গোয়েন্দা

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নামঃ
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অপরজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরনো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি এবার—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে!

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

গরমের ছুটি

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

বিশাল এক জঙ্গলের মধ্যে বাড়িটা। জমিদার বাড়ি। কুমিল্লা থেকে এসে ময়নামতি ছাড়িয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার মহাসড়ক ধরে কয়েক মাইল এগোলে পথের বাঁ পাশে পড়বে বিশাল এক বটগাছ। সেটার কাছে নেমে একটা ইঁট বসানো সরু রাস্তা ধরে আরও কিছুদূর গেলে সেই জঙ্গল, হীরামতির বাগ, অর্থাৎ বাগিচা। গরমের এই ছুটিতে সেটাই আমাদের গন্তব্য। হ্যাঁ, আমি রবিন বলছি। আবার এসেছি বাংলাদেশে বেড়াতে, আমরা তিন বন্ধু—আমি, কিশোর পাশা, এবং মুসা আমান।

অন্যান্যবারের মত এবারেও কিশোরের মামা রিটায়ার্ড ডিআইজি আরিফ চৌধুরী সাহেবের ঢাকার বাসাতেই উঠেছিলাম আমরা। একটা দিন ওখানে কাটিয়ে পরদিনই রওনা হলাম কুমিল্লার উদ্দেশে। গন্তব্য হীরামতির বাগ। নামটা শুনলে কেমন লাগে, তাই না? মনে হয়, প্রচুর হীরা-মতি পাওয়া যায় বুঝি ওই জঙ্গলে। আসলে তা নয়, হীরা আর মতি নামে দুই ভাইবোন ছিল, জমিদারের সন্তান। বিশাল এক দীঘি কাটিয়েছিলেন জমিদার আইন উদ্দিন সরকার. সেই দীঘিতে ডুবে মারা গিয়েছিল ছেলেমেয়ে দুটি। তখন থেকেই সেই দীঘির নাম হয়ে গেল হীরামতির দীঘি। কালক্রমে দীঘির চারপাশের বাগান সংস্কারের অভাবে জঙ্গল হয়ে গেল, দীঘির নামেই নাম হয়ে গেল সেই জঙ্গলেরও।

এই কাহিনী শুনেছি আমরা কিশোরের চাচা রাশেদ পাশার মুখে। তিনিই আমাদের এখানে আসতে অনুরোধ করেছেন। জঙ্গলের মধ্যে যে পুরানো জমিদার বাড়ি আছে, তার মালিক এখন রেহান উদ্দিন সরকার, রাশেদ পাশার দূর সম্পর্কের ফুফা। আইন উদ্দিন সরকারের শেষ বংশধর। আমেরিকায় বসেই শুনেছেন রাশেদ পাশা, তার ফুফুর খুবই দুরবস্থা চলছে এখন। তাই আমাদেরকে এখানে এসে নিজের চোখে সব দেখে খোজখবর করে যেতে বলেছেন রাশেদ আংকেল। সম্ভব হলে তখন সাহায্য করবেন।

ঢাকা থেকে কুমিল্লার বাসে চড়েছি আমরা। ময়নামতিতে নেমে স্কুটার নিয়েছি।

বটগাছের গোড়ায় কয়েকটা ছোট ছোট দোকান—মুদি, চা-পান-বিড়ি, এ সবের। ওগুলোর কাছে এসে ড্রাইভারকে থামতে বলল কিশোর। এগিয়ে এল কয়েকজন লোক, কৌতূহলী হয়ে দেখতে লাগল আমাদের। জমিদার বাড়িটা কোনদিকে জিজ্ঞেস করতে সবাই হাত তুলে দেখিয়ে দিল ইঁট বিছানো রাস্তাটা।

সেই পথ ধরে এগোল আমাদের স্কুটার। অনেক পুরানো রাস্তা, জমিদারী আমলে সরকারদের কোনও একজন তৈরি করেছিলেন নিজের খরচে। এখন অনেক জায়গারই ইঁট নেই, ক্ষতের মত হয়ে আছে, জায়গায় জায়গায় গর্ত। মেরামত হয় না কত বছর কে জানে।

বেশ গরম পড়েছে। ঘেমে যাচ্ছি। পথের দু-পাশে মাইলের পর মাইল কেবল খেত আর খেত। তরমুজ-বাঙ্গী ফলে আছে। এলোমেলো মাতাল হাওয়ায় ধুলোর ঘূর্ণি উড়ছে। চাষীদের বাড়িঘর চোখে পড়ে ক্বচিৎ-কদাচিৎ। ওরা এই খোলা মাঠে বাস করে না, থাকে দূরে, খেতের সীমানায় ওই যে ওই গ্রাম চোখে পড়ছে, সেখানে।

অবশেষে দেখতে পেলাম জঙ্গলটা। তিন পাশ ঘিরে খেত, একধারে নদী। কিছুদূর খোলা জায়গা ধরে এগিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল পথটা। ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে কয়েকশো গজ এগোতে দেখতে পেলাম জমিদার বাড়ির চৌহদ্দি। জঙ্গলটা আগে জঙ্গল ছিল না, বাড়ির আশপাশে বিশাল সব বাগান ছিল, আস্তে আস্তে সেই বাগান জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। বিরাট সিংহদরজার প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই আর এখন, কেবল দু-পাশের দুটো স্তম্ভ বাদে। একটা স্তম্ভের গোড়ায় একপাশে এখনও থাবা উঁচিয়ে বসে আছে শ্বেতপাথরের এক মস্ত সিংহ।

খোয়াবিছানো লম্বা গাড়িপথ পার হয়ে বিশাল এক প্রাসাদের সামনের গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়াল স্কুটার। রোদে ঝকঝক করছে ছড়ানো উঠান। সেখানে দানা খুঁটছিল একঝাঁক পায়রা আর ঘুঘু। স্কুটারের শব্দে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল একসঙ্গে। কয়েকটা পায়রা গিয়ে বসল বাড়ির কার্নিসে, বাকবাকুম জুড়ে দিল।

'খাইছে!' হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা, 'কি সুন্দর জায়গা!'

স্কুটার থেকে নেমে আমিও হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সত্যিই অসাধারণ! জঙ্গলের মাঝে এমন একটা বাড়ি থাকতে পারে, না দেখলে ভাবাই যায় না। অনেক পুরানো বাড়ি। সংস্কারের অভাবে এখানে ওখানে বেরিয়ে পড়েছে লাল ইঁট, জানালার শার্সিগুলো অপরিষ্কার, আনাচে কানাচে লতাগুল্ম আর শ্যাওলার রাজত্ব। পলকে একটা দিবাস্বপ্ন দেখে ফেললাম—এককালে আমাদেরই মত কত কিশোরের আনাগোনা ছিল এখানে, খেলে বেড়াত তারা, হই-চই করত, আজ একেবারে নীরব।

'ওই যে, দাদী!' বলে উঠল কিশোর।

উঁচু বারান্দার ওপরের বড় দরজাটা খুলে গেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধা। বয়েস ষাটের বেশি, কিন্তু এখনও মনে হয় চল্লিশের কোঠায়। অপরূপ সুন্দরী ছিলেন এককালে, বোঝা যায়। হবেনই, অত সুন্দরী না হলে কি আর জমিদার বাড়িতে বিয়ে হয়।

আমাদের আসার খবর চিঠিতে আগেই জানিয়েছেন রাশেদ আংকেল। সুতরাং আমাদের পরিচয় দিতে হলো না তাঁকে। হাসিমুখে সাবলীল ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে লাগলেন আমাদের দিকে। শুধু বললেন, 'এসেছিস। তোদের অপেক্ষাই করছি।'

কোন রকম দ্বিধা নেই, জড়তা নেই, প্রথমেই আমাকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেয়ে আদর করলেন। আমি যে বিদেশী, অন্য ধর্মের মানুষ, বাঙালী মুসলিম পরিবারের মেয়ে হয়েও তার পরোয়াই করলেন না তিনি। মুহূর্তে পছন্দ করে ফেললাম তাঁকে, মনে হলো তিনি আমার নিজের দাদী। তারপর মুসাকে চুমু খেলেন তিনি, আমার পেছনেই ছিল সে। সবশেষে কিশোরকে, স্কুটারের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে

উঠে আসতে দেরি করে ফেলেছিল সে।

'আয়, ঘরে আয়,' ডাকলেন দাদী। আমি জানি, তাঁর ডাকনাম হীরা, অবশ্যই রাশেদ আংকেলের কাছে জেনেছি। এই নামটার জন্যেই আইন উদ্দিন সরকারের বাবা কনেকে বেশি পছন্দ করেছেন, কারণ তাঁর ছেলের ডাকনামও তিনি রেখেছিলেন মতি। সুযোগ পাওয়ামাত্র মিলিয়ে দিলেন হীরামতিকে। হীরামতির বাগ নামটাকে সার্থক করার জন্যেই যেন।

উঠানের কোণ থেকে উঠে বার দুই 'ঘাউ! ঘাউ!' করে হাঁক ছেড়ে এগিয়ে এল একটা নেড়ি কুকুর। নেড়ি হলেও স্বাস্থ্য বেশ ভাল, খাবারের অভাব হয় না।

'ও আমাদের কালু,' হেসে পরিচয় করিয়ে দিলেন দাদী। 'আদর করে একবার ডাকলেই হয়, ভাব হয়ে যাবে।'

সবার আগে মুসার সঙ্গে ভাব করে নিল কুকুরটা। আমাদেরও অবজ্ঞা করল না।

দোতলায় আমাদের থাকার ঘর গুছিয়ে রেখেছেন দাদী। দেখিয়ে দিলেন। বললেন, 'হাতমুখ ধুয়ে আয়, আমি নাস্তা দিচ্ছি।'

ঘরটা দেখার মত। দেয়াল, ছাত, কড়ি-বরগাগুলো মোটেও মসৃণ নয়, দমকা বাতাসে পুকুরের শান্ত পানিতে যেমন কুচি কুচি ঢেউ ওঠে অনেকটা তেমনি, তার ওপর বিচিত্র অলঙ্করণ। অনেক বড় বড় জানালা। বাইরে বাগান। প্রজাপতি, ফড়িঙ আর পাখির ভিড় সেখানে। আমার মনে হতে লাগল আমি বাস্তবে নেই, পরীর রাজ্যে এসে পড়েছি।

মুখহাত ধুয়ে, কাপড় পাল্টে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নিচতলায় নেমে এলাম মস্ত হলঘরে। বাবুর্চিখানা, চাকরদের ঘর, খাবার ঘর আর রান্নাঘরে ঢোকা যায় সে ঘর থেকে। রান্নাঘর থেকে আরেকটা ছোট ঘরে চলে যাওয়া যায় উল্টোদিকের একটা দরজা দিয়ে, পরে জেনেছি। ওই ঘরটা কোন কাজে লাগে না, তবে অনেকটা সিঁড়িঘর হিসেবেই ব্যবহার হয়। মেঝেতে একটা লোহার শিকের জালিকাটা ঢাকনা, তার নিচে কয়লার ঘর। এককালে রান্নাঘরের চুলায় কয়লা ব্যবহার হত, এখন গ্যাস আসায় বাতিল হয়ে গেছে ওসব চুলা। কয়লা জমিয়ে রাখারও আর প্রয়োজন হয় না। রান্নাঘর দিয়ে ছাড়াও ওই সিঁড়িঘরে ঢোকার আরও একটা পথ আছে, আমাদের শোবার ঘর থেকে। একটা আলমারি আছে দেয়াল ঘেঁষে, প্রথম দেখে তাই মনে হয়েছিল। পরে দেখে অবাক হয়েছি, ওটা আলমারি নয়, একটা গোপন দরজা, অন্য পাশে সরু একটা অন্ধকার সিঁড়ি নেমে গেছে। দেখে খুব রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। যাই হোক, সে-সব কথায় পরে আসছি।

হলঘরের দেয়ালে ঝোলানো বিরাট বিরাট ছবি, বেশির ভাগই হাতে আঁকা, ফ্রেমে বাঁধানো। সরকার পরিবারের পূর্বপুরুষদের ছবি। আধুনিক ছবি অর্থাৎ ফটোগ্রাফ আছে একটাই, হীরাদাদু আর মতিদাদার যুগল ছবি, দু-জনেই বিয়ের সাজে সজ্জিত, বর আর কনে। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম ছবিটা। খুব সুন্দর।

খাবার ঘরে খেতে বসে কিশোর জানতে চাইল মতিদাদা কোথায়।

দাদী জানালেন, আক্কেল আলীকে নিয়ে শহরে গেছেন কাজে। জানা গেল,

আক্কেল আলী এ বাড়ির একমাত্র কাজের লোক। টাকার অভাবে একজনের বেশি লোক রাখার ক্ষমতা নেই আর এখন রেহান উদ্দিনের। অথচ দাদুর যখন বিয়ে হয়, প্রথম আসেন এ বাড়িতে, তখনও অনেক চাকর-বাকর ছিল। আর তার আগে তো কথাই নেই, গিজগিজ করত নাকি মানুষে।

সন্ধ্যার মুখে শহর থেকে ফিরলেন দাদা। পুরানো, ঝরঝরে একটা মোটরগাড়িতে করে। আমরা তখন বাগানে। ছবির মানুষটারই মত আছেন এখনও, কেবল চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে, এবং চোখের কোণে আর গলার নিচে ভাঁজ।

গাড়ি থেকে নেমেই আমাদের দেখলেন। ঋজু ভঙ্গিতে এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। 'এসে গেছ তাহলে। ভেরি গুড।'

বিশাল থাবা দিয়ে চেপে ধরলেন আমার হাতটা। ঝাঁকিয়ে দিলেন আন্তরিক ভঙ্গিতে।

দুই

পরের দু-তিনটে দিন কালুকে নিয়ে দারুণ কাটল আমাদের। ফলগাছের অভাব নেই বাড়িটাতে। আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল তো আছেই, আরও নানা রকম ফলের ছড়াছড়ি। বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াই আমরা, ফল খেয়ে পেট ভরে থাকে, ভাত খাওয়ার আর জায়গা থাকে না। আমেরিকা থেকে এসে আমরা ভাত খাই শুনে নিশ্চয় অবাক লাগছে তোমাদের। কিন্তু সত্যি বলছি, এখানে এসে রুটির চেয়ে ভাতই বেশি প্রিয় হয়ে উঠেছে আমার। বোধহয় আবহাওয়াটা এমন যে এই খাবারই ভাল লাগে।

কালু ছাড়াও আরও একটা প্রাণী আছে এ বাড়িতে, অনেক বড় একটা কালো হুলো বেড়াল, টিক্কা খান। নামটা আক্কেল আলীর দেয়া। বেড়ালটার বড় বড় গোঁফ দেখলেই নাকি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নেতা জেনারেল টিক্কা খানের কথা মনে পড়ে যায় তার। বেড়ালটাকে পাখিরাও পছন্দ করে না, সে উঠানে নামলেই চমকে যায় পায়রা আর ঘুঘুর দল, নিমেষে ডানা ঝাপটে উড়ে পালায়।

আক্কেল আলী নিজেও একটা চরিত্র বটে। সেই ছেলেবেলায় সাত-আট বছর বয়েসে সে ঢুকেছে এ বাড়িতে, তারপর আর যায়নি। সবাই চলে গেছে একে একে, সে রয়ে গেছে। এখন চাকর-মালী থেকে শুরু করে মতিদাদার শোফারের কাজ, সব সে একা করে। হালকা-পাতলা খাটো শরীর, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, বসে যাওয়া চোয়াল দেখে বোঝার উপায় নেই তার আসল বয়েস কত।

মাত্র কয়েকটা দিনেই বাড়িটার প্রতি ভীষণ মায়া পড়ে গেছে আমার। মনে হতে থাকে, সহজেহ সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারি এখানে।

তিন দিনের দিন সকালে সামনের বাগানে আমগাছের ছায়ায় বসে আছি, এই সময় গাড়ির শব্দ কানে এল। গাড়িপথে ঢুকল একটা চকচকে গাড়ি। গাড়ি বারান্দায় থামিয়ে নেমে গিয়ে পেছনের দরজা খুলে দিল শোফার। নামলেন বেশ সম্ভ্রান্ত

পোশাক পরা একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। বয়েস মতিদাদার সমানই প্রায় হবে। ছুটে গিয়ে হলঘরের দরজা খুলে দিল আক্কেল আলী। দু-জনকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

আয়েসী ভঙ্গিতে গাছের গোড়ায় বসে ছুরি দিয়ে কেটে আম খেতে খেতে গল্প করতে লাগলাম আমরা। দারুণ টেস্ট, আমের মত এত স্বাদ পৃথিবীর আর কম ফলেরই আছে। গাড়ির শব্দে উড়ে গিয়েছিল, একটা দুটো করে আবার উঠানে নেমেছে আট-দশটা ঘুঘু আর পায়রা।

ঘণ্টাখানেক পর চলে গেল মেহমানরা। তাঁদের সঙ্গে গেলেন মতিদাদা। আরেকটু পরে দাদীকে দেখলাম পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দীঘির শান বাঁধানো ঘাটে বসলেন। ওটাই হীরামতির দীঘি। পাথরে তৈরি সোফার মত আসনে বসে তাকিয়ে রইলেন পানির দিকে, সাদা শাপলাগুলো যেদিকে ফুটেছে সেদিকে মুখ। চুপচাপ বসে রইলেন তিনি।

আমের রসে হাত ভরে গেছে। ধোয়ার জন্যে চললাম দীঘির দিকে। ঘাটের কাছে এসেই থমকে দাঁড়ালাম। এ-কি! দাদী কাঁদছেন! গাল বেয়ে নেমেছে পানির ধারা। কি হয়েছে তাঁর?

আমার সাড়া পেয়েই তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে ফিরে তাকালেন। জোর করে হেসে বললেন, 'ও, রবিন! কি রে, খুব গরম?'

'না, হাত ধুতে এসেছি। দাদী, তুমি কাঁদছ কেন?'

'কই? চোখে কি যেন পড়ল…'

'মিথ্যে কথা বোলো না। আমি তোমাকে স্পষ্ট কাঁদতে দেখলাম।'

দ্বিধা করলেন একবার দাদী। তারপর হাত দিয়ে তাঁর পাশের জায়গাটা চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'আয়, বোস।'

বসলাম তাঁর পাশে।

'একটু আগে লোকটা এল না, গাড়িতে করে, দেখেছিস নিশ্চয়?'

'তিনি তোমাকে কিছু বলেছেন?'

'না, বলেনি, তবে কাঁদিয়েছে! ও এই বাড়ি কিনতে চায়। আমাকে আর তোর দাদাকে চিরকালের জন্যে চলে যেতে হবে এখান থেকে। ভাবলেই বুক ফেটে যায় আমার!'

'কেন দাদী, চলে যেতে হবে কেন? এতটাই অভাবে পড়ে গেছ তোমরা?'

'বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারও ফুরায়, রবিন। জমিদারের ছেলে কাজকর্ম তো কিছু শেখেনি, টাকার দরকার হলেই জমি বেচেছে। এ বাড়ির আশেপাশে যত জমি আছে সব এককালে সরকারদের ছিল। শত শত একর। আজ আর এক বিঘেও অবশিষ্ট নেই, শুধু এই বাড়িটা বাদে। দুর্ভাগ্যের সূচনা সেদিন থেকেই, যেদিন সরকারদের সৌভাগ্য হারিয়ে গেল!'

'সরকারদের সৌভাগ্য মানে!' পেছন থেকে বলে উঠল কিশোর। আমাদেরকে একান্তে কথা বলতে দেখে কৌতূহলী হয়ে সে আর মুসাও চলে এসেছে।

'আয়, বোস,' দু-জনকে বসতে বললেন দাদী।

দীঘির পানিতে ডোবাডুবি করছে দুটো পানকৌড়ি। সেদিক তাকিয়ে আছে মুসা। শিকারীর দৃষ্টি। একটা বন্দুক হাতে পেলেই এখন গুলি করে বসত।

তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে দাদীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোনও জিনিসের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, অনেক দামী কিছু জিনিস,' আমাদের আগ্রহ দেখে মুচকি হাসলেন দাদী। 'প্রায় দুশো বছর আগে, ইংরেজ আমলে এ বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা আইন উদ্দিন সরকারকে ওগুলো উপহার দিয়েছিলেন আগরতলার এক মহারাজা।'

'কি কি জিনিস ছিল?' আগ্রহে বকের মত গলা বাড়িয়ে দিয়েছে কিশোর।

'মুক্তার হার, হীরার জড়োয়া সেট, চুণি-পান্না বসানো সোনার একটা পানপাত্র, আর আরও নানা রকম জিনিস।'

'কিন্তু হারাল কি করে ওগুলো?'

'দেশ বিভাগের সময় হিন্দু-মুসলমানে যখন দাঙ্গা লাগল, এই এলাকায় তখন হিন্দুদের আধিপত্য। সেই সময় হঠাৎ করে মারা গেলেন তোর মতিদাদার দাদা আমিন উদ্দিন সরকার। সেই থেকে গায়েব হয়েছে জিনিসগুলো।'

'কি করে মারা গেলেন?'

'সেটাও এক রহস্য। একদিন দীঘির ওই পাড়ের ঘাটলার কাছে তাঁকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। অভিশপ্ত এই দীঘি। কত মানুষকে যে নিল!'

'খুন করেনি তো?'

'কেউ কেউ সে রকম সন্দেহ করেছে। তাদের ধারণা ছিল, জিনিসগুলোর লোভে খুন করা হয়েছিল মানুষটাকে। যাই হোক, ওগুলো আর পাওয়া গেল না। তাঁকে খুন করে হয়তো জিনিসগুলো নিয়ে গিয়েছিল কেউ। কিংবা সেই লোকের হাতে পড়ার আগেই তিনি কোথাও লুকিয়ে ফেলেছিলেন ওগুলো। আর তা করে থাকলে এখন এ বাড়িরই কোনখানে আছে। কারণ দাঙ্গা শুরুর পর আর একটি দিনের জন্যেও বাড়ির সীমানার বাইরে যাননি আমিন উদ্দিন সরকার।'

'এ বাড়িতেই আছে বলছ?' আনমনে বলল কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হয়ে গেছে তার। কি ভাবছে সে, পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমি।

'থাকতেও পারে। তবে আমার বিশ্বাস, নেই।'

'নেই মনে হওয়ার কারণ?' জানতে চাইল কিশোর।

'কারণ ওগুলোকে সরকারদের সৌভাগ্য নাম দিয়েছিলেন আইন উদ্দিন সরকার। যতদিন ছিল, রমরমা অবস্থা ছিল সরকারদের, যেই গেল, অমনি শুরু হলো পতন।'

'এ সব কুসংস্কার। জমিদারী বিলুপ্তির পর টাকা রোজগারের অন্য কোন উপায় করেনি বলেই আসলে ফকির হয়েছে ওরা।'

'একেবারে ভুল বলিসনি কথাটা। অকর্মা বলেই তো এখন শেষ সম্বল বাড়িটাও বিক্রি করতে হচ্ছে!' দাদীর কণ্ঠে ক্ষোভ।

'বাড়ি বিক্রি মানে?' কিশোর শোনেনি খবরটা।

তাকে আর মুসাকে আবার সব খুলে বললেন দাদী। এখান থেকে চিরতরে চলে যাওয়ার কথা বলতে গিয়ে আবার গলা ধরে এল তাঁর।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে ঘনঘন কয়েকবার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। তারপর মুখ তুলল, 'বাড়িটা বাঁচানোর এখন একটাই উপায়, একসঙ্গে অনেকগুলো

টাকা পেয়ে যাওয়া।'

মলিন হাসি হাসলেন দাদী। 'একটা কানাকড়িও নেই আর তোর দাদার কাছে। অনেক টাকা কোথায় পাবেন?'

'আছে, উপায় আছে। গুপ্তধনগুলো খুঁজে বের করতে পারলেই আর টাকার অভাব হবে না তোমাদের।'

'সে আশার গুড়ে বালি। অনেকেই খুঁজে-খুঁজে হয়রান হয়েছে, পায়নি। তার মানে নেই এখানে। আমিন উদ্দিন সরকারকে খুন করে কেউ নিয়ে গেছে ওগুলো। কে নিয়েছে, তা-ও জানি। তাঁর এক মুন্সী ছিল। তিনি যেদিন মারা গেলেন, সেদিন থেকেই ওই লোকটাও নিখোঁজ হলো। আর তাকে দেখা যায়নি।'

'হুঁ!' সহজে নিরাশ হতে জানে না কিশোর পাশা। 'তবু, একবার যখন গুপ্তধনের গন্ধ পেয়েছি, সহজে হাল ছাড়ছি না আমি। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, দাদী, এ বাড়িতে থাকলে আমরা ওগুলো খুঁজে বের করবই!'

তিন

সেইদিন থেকেই গুপ্তধন খোঁজায় লেগে গেলাম আমরা। কিন্তু কিশোর পাশাও বেকায়দায় পড়ে গেল। কোন সূত্রই নেই হাতে, কিসের সাহায্যে খুঁজবে? তেমন কোন সূত্রই দিতে পারলেন না দাদী। আক্কেল আলীকে জেরা করেও কিছু জানা গেল না। প্রায় পঁয়তিরিশ বছর ধরে আছে এ বাড়িতে, অনেক ইতিহাস জানে এখানকার, কিন্তু গুপ্তধন উদ্ধারের ব্যাপারে সে-ও কোন সাহায্য করতে পারল না।

পরদিন সকালে উঠে নাস্তা খেয়ে আবার বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল কিশোর। গোপন দরজা কিংবা গোপন কুঠুরি আছে কিনা খুঁজছে। দাদী বললেন, 'একটা গোপন সিঁড়িই আছে জানি, যেটার দরজা আলমারির মত, যেটা দিয়ে তোদের ঘরে চলে যাওয়া যায়। আর কিচ্ছু নেই।'

আসলেও মনে হলো নেই। কারণ অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিছু পেলাম না আমরা। নিরাশই হয়ে গেলাম। আমাদের অবস্থা দেখে শেষে দাদী বললেন, 'দেখ, বেড়াতে এসেছিস, বেড়িয়ে যা। ওসব গুপ্তধন খোঁজা বাদ দে। ওগুলো নেই এখানে। থাকলে অনেক আগেই পেয়ে যেত লোকে।'

'কিন্তু...' তর্ক করতে গেল কিশোর।

তাকে থামিয়ে দিয়ে দাদী বললেন, 'ওসব কিন্তু-ফিন্তু বাদ দিয়ে বনের ভেতর থেকে ঘুরে আয়গে, যা। ভাল লাগবে। অনেক কিছু দেখার আছে। যা।'

প্রায় জোর করেই আমাদেরকে ঘর থেকে ঠেলে বের করে দিলেন তিনি।

ভোর বেলা উঠেই শহরে চলে গেছেন দাদা, বোধহয় বাড়ি বিক্রির কাজেই। আমরা ঘুম থেকে উঠে দেখিনি তাঁকে। বাগানে দেখা হয়ে গেল আক্কেল আলীর সঙ্গে। গাছের গোড়ায় নিড়ানি দিচ্ছে। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

জানালাম।

কোথায় গেলে কি দেখতে পাব, বলে দিল সে। একটা জায়গায় যেতে নিষেধ করল, বনের ভেতরে একটা মজা পুকুর। জায়গাটা নাকি ভাল না।

সঙ্গে সঙ্গে মুসা ধরল, 'কি ভাল না? ভূত আছে নাকি?'

আবার হাসল আক্কেল আলী, 'তা জানি না। তবে বড় বড় সাপ আছে। এই তো, আর বছরই তো একটা বিরাট কেউটে মারলাম। জাম পাড়তে গিয়েছিলাম, দেখি গাছের গোড়া বেড় দিয়ে পড়ে আছে।'

'বেড় দিয়ে পড়ে থাকে! এত্তোবড়!'

মুসার কথার জবাবে মাথা নাড়ল আক্কেল আলী। আরও একটা ব্যাপারে সাবধান করল আমাদের, জলার কাছে না যেতে। বেশ বড় একটা জলা আছে। তাতে নাকি পানির চেয়ে কাদা বেশি। পা পড়ে গেলে হড়াৎ করে একেবারে হাঁটু পর্যন্ত দেবে যায়।

পুকুরটা কোন দিকে আছে জেনে নিল কিশোর। সিংহ-দরজা দিয়ে বেরিয়ে সেদিকের পথই ধরল। আক্কেল আলী মানা করায় তার কৌতূহল বেড়ে গেছে।

আমাদের আগে আগে চলেছে কালু। অচেনা বনে-বাদাড়ে সঙ্গে কুকুর থাকলে অনেক সুবিধে।

বনে ঢুকে পড়লাম আমরা। ঘন হয়ে জন্মে আছে আম আর কাঁঠাল গাছ। বিরাট বিরাট কালোজামের গাছও আছে। মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড়। বনের মধ্যে এক ধরনের সবুজাভ আলো। গাছের মাথা দিয়ে যেন চুরি করে নেমে এসে মাটিতে পড়েছে রোদ, গোল গোল হয়ে পড়ে বনতলে সোনালি অলঙ্করণ করে দিয়েছে যেন।

প্রচুর শেয়ালের গর্ত দেখা গেল। আর আছে বেজি ও গোসাপ। প্রথম জানোয়ারটার দিকেই কালুর আগ্রহ বেশি দেখা গেল। গর্ত দেখলেই ছুটে যাচ্ছে সেদিকে, নাক নামিয়ে শুঁকছে। মাঝে মাঝে হাঁক ছাড়ছে ঘাউ ঘাউ করে, যেন বলতে চাইছে: *বেরিয়ে আয় ব্যাটা শিয়ালের ছাও, হয়ে যাক একহাত! চুরি করে হাঁস-মুরগী খাওয়া তোমার আমি বের করব!*

চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল মুসা। তাকিয়ে আছে সামনের দিকে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

হাত তুলে দেখাল মুসা, 'ওই যে।'

গাছের ফাঁক দিয়ে আমরাও দেখতে পেলাম পুকুরটা। কালচে-সবুজ পানি।

'সুন্দর!' বিড়বিড় করল কিশোর।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, খুব। শাপলা ফুটে আছে কেমন দেখছ? দারুণ!'

লাল আর সাদা শাপলায় ছেয়ে আছে পুকুরটা।

'তুলতে পারলে কাজ হত,' বললাম। 'দাদীর জন্যে নিয়ে যেতে পারতাম।'

'হ্যাঁ, নামো,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল মুসা, 'আর অমনি টুক করে সিন্দুকে টেনে নিয়ে যাক!'

'সিন্দুক?' বুঝতে পারলাম না, 'সেটা আবার কি?'

'ও, জানো না এখনও। বাংলাদেশের অনেক পুকুরেই সিন্দুক থাকে। পুরানো দীঘি, পুরানো বড় আন্ধা পুকুর—যেগুলোর চারপাশে জংলা হয়ে থাকে, পানি কালো, সে-গুলোতে বাস করে এই ভূতুড়ে সিন্দুক। বড় বড় শেকল থাকে। যেই

পানিতে নামবে, আস্তে করে এসে পায়ে পেঁচিয়ে ধরবে। তারপর একটানে একেবারে মাঝপুকুরে, পানির তলায়।'

হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'নিয়ে গিয়ে কি করে?'

হাত উল্টে মুসা বলল, 'আমি কি জানি? হয় গোলাম বানিয়ে রাখে, নয়তো ভূতুড়ে সিন্দুক বানিয়ে নিজেদের দলভারি করে। কিছু তো একটা করেই, নইলে নেয় কেন?'

কিশোরের মতই আমারও ভূতপ্রেতে তেমন বিশ্বাস নেই, কিন্তু পুকুরটার দিকে তাকিয়ে মনে হলো সত্যিই থাকতে পারে ও রকম ভূতুড়ে কিছু, শাপলা পাতায় ঢাকা কালো পানি দেখলে কেমন গা ছমছম করে।

পুকুরের একটা পাড়ে ঝোপঝাড় একটু হালকা, বাকি তিন পাড়ে ঘন জঙ্গল হয়ে আছে। বেতবন নেমে এসেছে একেবারে পানির ওপর। বেত গাছের গোড়া বিছুটি আর লজ্জাবতী গাছে ছাওয়া। গাঢ় গোলাপী রঙের ফুল ফুটে আছে।

যে পাড় হালকা, সেই পাড়ে এসে দাঁড়ালাম আমরা। লাফ দিয়ে সরে গেল একটা ব্যাঙ। ছড়ছড় করে পানির ওপর দিয়ে পিছলে চলে গেল অনেক দূর।

ব্যাঙটা যেখানে বসে ছিল সেখানে তাকাতেই একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। একটা চৌকোণা পাথর। ফুটখানেক পানির নিচে আরও একটা। কাত হয়ে আছে। শ্যাওলায় ছাওয়া। পিচ্ছিল যে হয়ে আছে বোঝার জন্যে পা রাখার দরকার নেই, দেখেই বোঝা যায়। পা দিলেই আছাড় খেয়ে পড়তে হবে পানিতে।

'আশ্চর্য!' ভুরু কুঁচকে পানির নিচে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল কিশোর, 'এখানে সিঁড়ি বানাল কে?'

'সিঁড়ি নাকি?' সিন্দুকের ভয় ভুলে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে তাকাল মুসা।

'তা ছাড়া আর কি?'

'তাই তো। পুকুরে তো সিঁড়ি বানায় মানুষ ঘাটলা তৈরি করলে। নেমে গোসল করার জন্যে।'

'কিংবা ঘাটলার সিঁড়িতে বসে আয়েশ করার জন্যে।'

'তাহলে কে সেই আয়েশী লোক?'

'নিশ্চয় সরকারদের কেউ। দেখো, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কাছাকাছি ঘরবাড়ি আছে। বাগানবাড়ি থাকলেও অবাক হব না।'

এদিক ওদিক তাকাতে শুরু করল কিশোর। ঘাটের কাছ থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে বিশাল এক বেতের ঝাড়। সেটার দিকে চোখ আটকে গেল তার। আনমনে হাত নেড়ে আমাদের বলল, 'চলো তো, দেখি!'

বেত গাছের সাংঘাতিক কাঁটা। লম্বা লম্বা লতা হয়, তাতে আঁকশির মত কাঁটা, ছোঁয়া লাগলেই চামড়া ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে যায়।

পড়ে থাকা একটা মরা ডাল খুঁজে আনল মুসা। সেটা দিয়ে কোনমতে বেত ফাঁক করে করে ভেতরে তাকাল। চোখে পড়ল একটা দেয়াল। আর কোন সন্দেহ নেই। সত্যিই একটা বাড়ি আছে এখানে।

'ভেতরে কি আছে দেখতে হয়,' কিশোর বলল।

'এখানে গুপ্তধন আছে ভাবছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'সম্ভাবনা কম। তাহলে পেয়ে যেত লোকে। তবু দেখতে চাই কি আছে।'
'ঢুকবে কি করে?' জিজ্ঞেস করলাম। 'যা বেতের বেত, চোখের পলকে ছিলেছুলে দেবে!'
'বাড়ি গিয়ে দা এনে কাটতে হবে। চলো, আক্কেল আলীর কাছ থেকে নিয়ে আসি।'
সব শুনে আক্কেল আলী বলল, 'তোমাদের না ওদিকে যেতে মানা করেছি, তা-ও গেলে...'
'আরে দূর,' হাত নেড়ে উড়িয়ে দিল কিশোর, 'গেলে কি হয়? এর চেয়ে অনেক গভীর আর বিপজ্জনক জঙ্গলে ঢুকেছি আমরা। দুটো দা দাও। ভেতরে ঢুকব।'
'সাপের কামড় খেয়ে মরার ইচ্ছে হয়েছে আরকি। চলো, আমিও যাব। একলা ছেড়ে দিলে মা বকবেন।'
'তোমার আর যাওয়ার দরকার নেই,' মুসা বলল, 'আমরাই কাটতে পারব।'
'তাহলে মা-কে বলে যেতে হবে। নইলে আমিই বলে দেব। তোমাদের কিছু হলে শেষে মা আমাকে আস্ত রাখবেন না।'
দাদীকে বলতে গেলে বাধা দিয়ে বসতে পারেন, এই ভয়ে আক্কেল আলীর কথার আর প্রতিবাদ করলাম না। তাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হতে যাব, এই সময় বারান্দায় বেরোলেন দাদী। 'এসেছিস তোরা? এ-কি, এখনও গোসলই করিসনি। যা যা, জলদি যা। আমার রান্না হয়ে গেছে।'
মুগডাল দিয়ে রুইমাছের মাথার মুড়িঘণ্ট, রুইমাছ ভাজা, চালকুমড়া ভাজি আর ডাল দিয়ে গলা পর্যন্ত গিললাম। তারপর যখন ক্ষীরের মত ঘন দুধ আর শহর থেকে কিনে আনা ফজলি আম নিয়ে এলেন দাদী, করুণ চোখে ওগুলোর দিকে তাকাতে লাগলাম। কারণ আমার আর একটা দানা গেলারও সামর্থ্য নেই। তবে মুসা ছাড়ল না। ইয়া বড় বড় দুটো ফজলি আম আর বড় এক বাটি দুধ মেরে দিল অনায়াসে। কম করে হলেও এক হাজার বার আউড়াল—এর চেয়ে সুস্বাদু খাবার পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই।
ভরপেট খেয়ে তক্ষুণি আর বেরোতে পারলাম না। আধঘণ্টা মত গড়াগড়ি দিয়ে নিলাম বিছানায়। তারপর উঠে আক্কেল আলীকে সঙ্গে করে দা নিয়ে রওনা হলাম মজা পুকুরের পাড়ে।

চার

আক্কেল আলীকে সঙ্গে এনে খুব ভাল করেছি। খানিক পরেই বুঝলাম, সে না এলে ওই বেত কেটে ভেতরে ঢোকার সাধ্য আমাদের হত না। সাংঘাতিক শক্ত গোড়া। সারা গায়ে বড় বড় কাঁটা। বেতগাছ কাটতে হলে একটা বিশেষ কায়দায় কাঁটা বাঁচিয়ে কোপ দিতে হয়। সামান্য এদিক ওদিক হলেই কনুই থেকে হাতের নিচের অংশের চামড়া আর থাকবে না, ফালাফালা হয়ে যাবে কাঁটার আঘাতে। আক্কেল

আলীর বক্তব্য, পাগল না হলে এই বেত কেটে ওই পোড়োবাড়িতে ঢোকার কথা ভাবে না কেউ। অর্থাৎ তার ধারণায়, আমরা তিনজনই পাগল।

বাড়িটা যে আছে ওখানে, জানা ছিল তার। বানিয়েছিলেন এখানকার প্রথম জমিদার, আইন উদ্দিন সরকার। এতটাই পোড়ো, ঢুকে দেখার কথা মনে হয়নি কখনও আক্কেল আলীর। পঁয়তিরিশ বছর আগে সে যখন এসেছিল, তখনও এমনই কাঁটা ছিল এখানটায়। তার মনে হয়েছিল—কি আর আছে এর মধ্যে দেখার মত, সাপ আর ইঁদুর-শজারু ছাড়া? শুধু ওসব দেখার জন্যে কাঁটার খোঁচা খেয়ে ঢোকার কষ্ট কে করে।

শেষ পর্যন্ত আক্কেল আলীর চেষ্টাতেই ঘরে ঢোকা সম্ভব হলো। দুই কামরার বাড়ি, বাগানবাড়ি নয়, তবে প্রচণ্ড গরমের সময়, কিংবা মন ভাল না লাগলে এসে একাকী কাটানোর জন্যে একটা চমৎকার জায়গা ছিল এটা একসময়। সামনে পুকুর, বন-জঙ্গল, গরমের দিনে চাঁদনী রাতে নিশ্চয় অপরূপ দৃশ্য হয়।

ভেতরে মাকড়সার জালের ছড়াছড়ি, পা বাড়ালেই হাতে, মুখে লাগে। সঙ্গে করে আনা ছোট একটা ডাল দিয়ে সামনের জালগুলো ছিঁড়ে সরিয়ে টর্চের আলো ফেলল কিশোর। জানালা আছে দুটো, কিন্তু বাইরে থেকে লতাপাতায় এমন করে জড়িয়ে আটকে রেখেছে, ঠেলে খোলা মুশকিল।

ভেতরের দিকের ঘরে দেয়ালের কাছে বহু পুরানো একটা বেঞ্চ রাখা, তাতে পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে। টেবিলও আছে একটা, তাতেও ধুলো। আরেকটু কাছে এগোল কিশোর। আমরা রইলাম তার পেছনে।

দুটো গ্লাস দেখতে পেলাম টেবিলে।

কিশোর বলল, 'শেষবার যারা ঢুকেছিল এখানে, কথা বলেছিল বসে, তারা নিশ্চয় এই গ্লাসে করে কিছু খেয়েছিল। দু-জন লোক।'

আক্কেল আলী বলল কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গেই, 'কি আর খাবে! মদ খেয়েছিল আরকি! এ বাড়িতে তো এক সময় রীতিই ছিল, পুরুষমানুষের মদ খেতে হবে।'

একটা গ্লাস তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে কিশোর বলল, 'এ রকম গ্লাস রান্নাঘরের আলমারিতেও দেখেছি।'

খাটো খাটো গ্লাস, খুব ভারি কাঁচে তৈরি, ইংল্যান্ডের একটা কোম্পানির নাম ছাপ দিয়ে লেখা রয়েছে তলায়।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ঘরগুলোতে আর কোন জিনিস পেলাম না। গুপ্তধনের কোন চিহ্ন না পেয়ে কিছুটা নিরাশই হলাম।

রাতে খাবার টেবিলে বসে পোড়ো বাড়িতে ঢোকার খবরটা জানালাম আমরা।

গ্লাস দুটো পেয়ে খুশি হলো দাদী।

মতিদাদা বললেন, 'ঘরটা সুন্দর। তোমাদের বয়েসে চাঁদনী রাতে, বৃষ্টির দিনে, কতদিন গিয়ে একা একা বসে থেকেছি ওখানে। বন দেখতে খুব ভাল লাগত। বিশেষ করে পুকুরটা। শাপলায় ভরা, চাঁদের আলোয় রহস্যময় হয়ে উঠত। মুষলধারে বৃষ্টি যখন হত, তখন লাগত আবার আরেক রকম। শাপলাপাতায় বৃষ্টির নাচন দেখেছ? দুর্দান্ত!'

'চাঁদনী রাতে সিন্দুকেরা নিশ্চয় ছানাপোনা নিয়ে বেরোত!' মুসা বলে উঠল।

'উঠে আসত পানি থেকে। ধাড়িটা থাকত আগে আগে, তার পেছনে মাদীটা, আর তাদের পেছনে ছানার দল। হেলেদুলে এগোচ্ছে বড় দুটো, আর পিচ্চিগুলো নাচানাচি করছে। ছবি তুলে রাখতে পারলে কোটিপতি হয়ে যাওয়া যেত।'

ভুরু কুঁচকালেন দাদা। 'কারা বেরোত?'

মুসার ভূতুড়ে সিন্দুকের কথা বুঝিয়ে বলল কিশোর।

হা-হা করে হাসলেন দাদা। বললেন, 'তাহলে একদিন গিয়ে রাতে থেকেই দেখো, বেরোয় কিনা?'

'থাক থাক,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন দাদী, 'ছেলেগুলোকে আর কুবুদ্ধি দিয়ো না। সাপখোপের আড্ডা, শেষে কামড় খেয়ে মরবে।'

কিন্তু 'কুবুদ্ধিটা' কিশোরের মাথায় ঠিকই ঢুকে গেল। ঘরে ফিরে এসে শলা-পরামর্শ করতে লাগল আমাদের সঙ্গে, ঘরটা পরিষ্কার করে ওখানে রাত কাটালে মন্দ হয় না। আমরা 'না' করলাম না। একবার যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে, সেটা করবেই, আর তাকে ফেরানো যাবে না। তা ছাড়া ভয় ভয় করলেও ওখানে থাকতে আমাদের যে একেবারেই ইচ্ছে করছিল না, তা নয়।

সুতরাং পরদিন থেকেই দাদীকে না জানিয়ে কাজ শুরু করে দিলাম আমরা। ধুয়ে মুছে ঝকঝকে তকতকে করে ফেললাম বাড়িটাকে। আশপাশের জঙ্গল সাফ করলাম। জানালা খুলে দেয়া গেল। আরেকটা চমৎকার জিনিস বেরোল, একটা অ্যাকোয়ারিয়াম। মাটিতে বেশ বড় একটা ট্যাংক বানিয়ে, চারপাশ পাকা করে দেয়া হয়েছে। নালা কেটে পুকুর থেকে পানি ঢোকার ব্যবস্থা আছে। তাতে কিছু জলজ উদ্ভিদ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এমন করে, যাতে মাছের আগ্রহ জন্মায়। ওই অ্যাকোয়ারিয়ামে এসে ঢোকে ওরা। বহু দিন পরিষ্কার করা হয় না বলে ময়লা হয়ে আছে এখন ট্যাংকটার পানি, গাদা গাদা পাতা পড়ে পচে আছে তলায়। ওই পানিতেই কয়েকটা পুঁটি আর একটা টাকি মাছকে ঘুরতে দেখলাম।

দু-দিন লাগল সব ঠিকঠাক করতে।

তৃতীয় দিনের দিন বিকেলে ওই বাড়িতে বসেই চা খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। খাবার আর চায়ের কেটলি গুছিয়ে নিয়ে রওনা হলাম।

ঘরের দাওয়ায় বসে বসে প্রকৃতি দেখতে লাগলাম আমরা।

করুণ গলায় টেনে টেনে বিলাপ করছে ঘুঘু। মাঝে মাঝে অলস ভঙ্গিতে শিস দিচ্ছে দোয়েল। পুকুরের পানিতে শাপলার ফাঁকে ফাঁকে পোকা আর ছোট মাছ খুঁজে বেড়াচ্ছে দুটো জলমুরগী।

পশ্চিমে যতই ঢলতে লাগল সূর্য, বনতলে লম্বা হতে লাগল গাছের ছায়া।

চা খাওয়া শেষ করলাম আমরা।

হঠাৎ মাথার ওপর কর্কশ গলায় ডেকে উঠল একটা পেঁচা। চমকে চোখ তুলে তাকালাম। চালার খাপে বাসা ওটার। দিন শেষ হয়ে রাত আসছে, জেগে উঠছে বনের নিশাচরেরা। খানিক আগেই উঁকি দিয়ে গেছে একজোড়া শেয়াল।

বাসাটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে উঠল কিশোর, 'ওটা কি?'

উঠে দাঁড়াল সে।

আমি আর মুসাও তাকালাম।
'কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম।
'বাসাটার পাশে দেখো। বাক্সের কোণা মনে হচ্ছে না?'
'খাইছে! তাই তো!'
মোটেও দেরি করল না মুসা। খাপের ফাঁকে গুঁজে রাখা ছোট কাঠের বাক্সটা বের করে আনল। প্রায় দু-শো বছরের পুরানো বাক্স, সারা গায়ে পিতলের পাত বসিয়ে নকশা করা। নিশ্চয় কারও শখের জিনিস ছিল এটা। বেশ ভারি।
'এর মধ্যে গুপ্তধন নেই তো?' কানের কাছে নিয়ে বাক্সটা ঝাঁকি দিয়ে ভেতরে কি আছে বোঝার চেষ্টা করল মুসা।
'না, বেশি ছোট,' কিশোর জবাব দিল। 'ভাবছি, খাপের মধ্যে গেল কি করে? পাখিতে নিতে পারেনি। এটা তোলার সাধ্য হবে না কোন পাখিরই। তাহলে কেউ রেখেছে। মানুষ!'
'আছে কি এর মধ্যে?' জিজ্ঞেস করলাম।
'খুলেই দেখা যাক না,' মুসার হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে ডালা খোলার চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু ডালাটা যে কোন্ দিকে, কোন্টা ওপর আর কোন্টা নিচ, সেটাই বোঝা গেল না। বেশ কায়দা করে তৈরি বাক্সটা।
অন্ধকার হয়ে গেছে। আলোয় না দেখে বাক্সটা খোলা যাবে না বুঝতে পেরে সেই চেষ্টা আর করলাম না আমরা। ওটা নিয়ে বাড়ি ফিরে চললাম।

পাঁচ

গাড়ি-বারান্দায় সেই গাড়িটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম আবার—বাড়ি কিনতে চায় যে লোকটা, তার। ঘনঘন আসা-যাওয়া করছে, কিনেই ছাড়বে। খুব তাড়াতাড়ি গুপ্তধনগুলো আমরা উদ্ধার করতে না পারলে বাঁচানো যাবে হীরাদাদীর এত সাধের এই জমিদার বাড়ি।
দাদা-দাদী নিশ্চয় লোকটার সঙ্গে হলঘরে আছে, ওখানে বসে বাক্স খোলা নিরাপদ নয়, তাই ডাইনিং রুমে চলে এলাম আমরা। টেবিলে বসেই বাক্সটা খোলায় মন দিল কিশোর। বাক্সের গায়ে হালকা একটা রেখা চোখে পড়ল। বোঝা গেল, ওটাই জোড়া, কিংবা ঢাকনার কিনারা। ঘর থেকে গিয়ে তার ব্যাগ থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা এনে দেয়ার অনুরোধ করল আমাকে।
এনে দিলাম।
গ্লাস দিয়ে দেখে নিশ্চিত হলো সে, ঢাকনা কোনটা। সূক্ষ্ম ফাঁকটায় ছুরির মাথা ঢুকিয়ে চাড় দিতে লাগল। সামান্যতম নড়ল না ঢাকনাটা। আরও জোরে চাড় দিতেই সামান্য ফাঁক হলো মনে হলো। জোরে জোরে চাড় দিতে লাগল তখন।
অবশেষে খুলে গেল ঢাকনা। মনে হলো, কোন ধরনের আঠা মাখিয়ে তারপর চেপে বসিয়ে দেয়া হয়েছিল ওটা, সে জন্যেই খুলতে অত কষ্ট হয়েছে।

ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে আগ্রহে সামনে ঝুঁকে পড়লাম আমরা তিনজন।

হতাশ হতে হলো। কিছুই নেই! কিচ্ছু না! একটা সোনার মোহর কিংবা একটা সাধারণ আঙটিও নেই। গুপ্তধন তো দূরের কথা।

বাক্সটা টেবিলে রেখে দিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর।

খালি বাক্স হাতে নিয়ে আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল কিছুক্ষণ মুসা। তারপর নিরাশ ভঙ্গিতে রেখে দিয়ে বলল, 'দূর, খামোকা সময় নষ্ট!'

আমি হাতে তুলে নিলাম বাক্সটা। ব্যাপারটা আমার চোখেই পড়ল প্রথম। বাইরের দিকটা যত বড়, ভেতরের দিকটা তার চেয়ে অনেকটাই ছোট, বিশেষ করে নিচের দিক। অতটা তো হওয়ার কথা নয়! অত পুরু নয় কাঠ! তাহলে? কিশোরকে বললাম আমার সন্দেহের কথাটা।

থাবা দিয়ে আমার হাত থেকে বাক্সটা কেড়ে নিয়ে একবার তাকিয়েই বলে উঠল কিশোর, 'তাই তো! ফলস বটম আছে!'

বাক্সের নিচে বসানো চোরা কুঠুরিটা খোলার চেষ্টা করতে করতে ঘেমে গেল সে, কিন্তু লাভ হলো না। খুলতে পারল না। শেষে রেগে গিয়ে মারল এক আছাড়। ভেঙে ফেলতে চায়। আর তাতেই হয়ে গেল কাজ। প্রচণ্ড আঘাতে ছুটে গেল ভেতরের স্প্রিঙ, খুলে গেল কুঠুরির ঢাকনা।

হুমড়ি খেয়ে পড়লাম আমরা তিনজন।

ভেতরে রয়েছে একটা পুরানো খাম।

ছোঁ মেরে তুলে নিল কিশোর। খামের ভেতর থেকে বেরোল একটা অনেক পুরানো চাবি, আর এক তা ভাঁজ করা কাগজ। চাবিটা নিশ্চয় সিন্দুক কিংবা আলমারির, ভাবলাম, আর কাগজটা গুপ্তধন কোথায় আছে তার নকশা। দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

চাবিটা পকেটে রেখে ভাঁজ করা কাগজটা মেলল কিশোর।

আরেকবার হতাশ হতে হলো আমাদেরকে। কোন নকশা-টকশা নেই, কলম দিয়ে আঁকা একজন মানুষের ছবি। বিশেষত্ব একটাই, কয়েক রঙে আঁকা হয়েছে ছবিটা, একই কলম ব্যবহার করে, ভিন্ন ভিন্ন রঙের কালি দিয়ে। নিখুঁত করে আঁকা। কার ছবি চিনতে পারলাম। হলঘরে দেখেছি। জমিদার আমিন উদ্দিন সরকারের।

'মানে কি এর?' বিড়বিড় করল কিশোর।

'ঘোড়ার ডিম!' রেগে গেছে মুসা।

'হতে পারে ওই ছবিটাই খুব দামী...' বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। চোখের কোণ দিয়ে চোখে পড়ল একজন মানুষ। নিঃশব্দে কখন এসে দাঁড়িয়েছেন ঘরে, উত্তেজনায় খেয়াল করিনি।

মুখ তুলে তাকালাম। গভীর আগ্রহে ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছেন সেই ভদ্রলোক, যিনি বাড়ি কিনতে চান। আমরা তাকাতেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় পেয়েছ এটা?'

'বাক্সের মধ্যে,' জবাব দিয়ে দিল মুসা।

'বাক্সটা কোথায় পেলে?'

কিশোরের বার বার চোখ টেপা সত্ত্বেও খেয়াল করল না মুসা, বলে দিল,

'পোড়োবাড়িতে। মজা পুকুরের ধারে বেতবন আছে না, সেখানে।'

'একটু দেখতে পারি ছবিটা?' হাত বাড়ালেন ভদ্রলোক।

এই সময় ঘরে ঢুকলেন মতিদাদা। জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসের ছবি?...এ-কি, এ তো আমার দাদার! কোথায় পেলে?'

জানানো হলো তাঁকে।

লক্ষ করলাম, ছবিটার দিকে তাকিয়ে চকচক করতে লাগল ভদ্রলোকের চোখ, যিনি বাড়ি কিনতে এসেছেন। ছবিটা রেখে খোলা বাক্সটাও হাতে নিয়ে দেখলেন। তারপর টেবিলে রেখে ঘুরে তাকালেন দাদুর দিকে, বললেন, 'হ্যাঁ, বাকি ঘরগুলো দেখার আর দরকার নেই আজ। রাতের বেলা না দেখে অন্যদিন এসে দিনের বেলা দেখব।'

'কিন্তু আপনিই তো দেখার জন্যে চাপাচাপি করলেন!' ভদ্রলোকের এই হঠাৎ মত পরিবর্তনে যেন কিছুটা অবাকই হয়েছেন দাদা।

'তা বলেছি। এখন বুঝতে পারছি, ঠিকই বলেছেন, রাতের বেলা ভালমত দেখা যায় না সব।'

বেরিয়ে গেলেন আবার দু-জনে।

রাতের বেলা খাবার টেবিলে ছবিটা নিয়ে আলোচনা হলো। দাদু বললেন, 'আমার দাদু কিছুটা পাগলাটে স্বভাবের ছিলেন। ধাঁধা আর রহস্যের প্রতি বেজায় ঝোঁক ছিল তাঁর। নিজে নিজে অনেক ধাঁধা তৈরি করেছেন। ছবিও ভাল আঁকতে পারতেন।'

'তোমার কি মনে হয়,' জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'এই ছবিটাও কোন ধরনের ধাঁধা? গুপ্তধন কোথায় আছে তার ইঙ্গিত?'

তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন দাদা। 'তোর মাথায়ও দেখি উদ্ভট সব ভাবনা খেলে বেড়ায়। দাদার সঙ্গে মিলত ভাল। হাহ্ হাহ্!'

'তুমি গুরুত্ব দিচ্ছ না? তাহলে বাক্সটার মধ্যে অত যত্ন করে উঠিয়ে চালার খাপে ভরে রাখলেন কেন?'

'ওটাও আরেক পাগলামি।'

কিন্তু মেনে নিতে পারল না কিশোর, তার মুখ দেখেই বোঝা গেল।

খাওয়ার পর ঘরে এসে চাবিটা দরজার চৌকাঠের নিচের একটা ফোকরে লুকিয়ে রাখল কিশোর। বলল, 'সাবধানের মার নেই।'

ডাইনিং রুমে তখন যে কথাটা শেষ করতে পারিনি, সেই কথাটাই তুললাম আবার, 'ছবিটা দামী কোন ছবি নয় তো? হয়তো আমিন উদ্দিন সরকারের ছবির নিচে আঁকা আছে অনেক দামী কোন শিল্পীর ছবি। হতে পারে না?'

'পারে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'আমার মনে হয়,' মুসা বলল, 'ছবিটার নিচে কোন গোপন দরজা আছে। ফ্রেমটা কত বড় দেখেছ?'

'সেটাও সম্ভব। চলো, বরং দেখেই আসি।'

শূন্য হলঘর। দাদা-দাদী শোবার ঘরে চলে গেছেন। আক্কেল আলী থাকে বাইরের একটা ঘরে, আগে মালী থাকত ওঘরে। সেটার দরজাও বন্ধ, তার মানে

আক্কেল আলীও শুয়ে পড়েছে। বাড়ির বাইরে বাগানে পাহারা দিচ্ছে কালু। আমরা টর্চের আলো ফেলতেই এগিয়ে এল লেজ নাড়তে নাড়তে।

গুপ্তধন খোঁজার এটা চমৎকার সময়। আবার হলঘরে ফিরে এলাম আমরা। আমিন উদ্দিন সরকারের ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। আসল না নকল, নিচে আরও ছবি আঁকা আছে কিনা বোঝার উপায় নেই।

'এ ভাবে দেখে কিছু বুঝব না,' কিশোর বলল। 'বুঝতে হলে ল্যাবরেটরিতে পাঠাতে হবে।'

'নিচে পথ আছে কিনা দেখে ফেলি না কেন?' মুসা বলল।

বেশ শক্ত করে দেয়ালে লাগানো আছে ভীষণ ভারি ফ্রেমটা। খুলে সরাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো।

সরিয়ে আবারও হতাশ হলাম। কোন ফাঁক-ফোকর নেই। একেবারে নিরেট দেয়াল। দেয়ালে ঠুকে ঠুকে দেখলাম, একটা ইঞ্চি জায়গাও পেলাম না যেখান থেকে ফাঁপা আওয়াজ বেরোয়।

কি আর করব। ছবিটা আবার আগের জায়গায় বসিয়ে রাখলাম।

আপাতত আর কিছু করার নেই এখানে। তদন্তের কাজ রাতের মত স্থগিত রেখে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ার প্রস্তাব দিল মুসা। সানন্দে রাজি হলাম আমি। তবে কিশোরের যাওয়ার ইচ্ছে নেই। সে জানাল, 'কিছু থাকলে এই ঘরটাতেই আছে। আমার মন বলছে!'

'থাকলে সেটা সকালেও বের করা যাবে,' বললাম আমি। 'চলো, গিয়ে শুয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করি আগে।'

ছয়

উত্তেজনায় ভাল ঘুম হলো না সে রাতে। দুঃস্বপ্ন দেখলাম। পাহাড়ের গুহায় আলিবাবার রত্ন খুঁজে পেয়েছি যেন আমরা, কিন্তু বের করে আনার আগেই কেড়ে নিল চল্লিশ ডাকাত। আমাদের ধরে বেঁধে ফেলল। মুসাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল পাথরের বেদিতে। তার মুণ্ড কাটবে। হাউমাউ করে চিৎকার করতে লাগল মুসা। আরেক ডাকাত এসে আমার কাঁধ চেপে ধরে ঝাঁকাতে লাগল।

ভেঙে গেল ঘুম। দেখি, ওঠার জন্যে আমার কাঁধ ঝাঁকাচ্ছে কিশোর।

নাস্তা সেরে দাদা চলে গেলেন শহরে, দাদী রান্নাঘরে। আমরা চলে এলাম হলঘরে। আগের রাতের অসমাপ্ত কাজটা শেষ করার জন্যে। কিশোরের ধারণা, রহস্যের সমাধান রয়েছে আমিন উদ্দিন সরকারের ছবিটাতে। গুপ্তধনের চাবিকাঠি ওটাই।

কিন্তু তাকিয়ে তাকিয়ে, তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ব্যথা করে ফেললাম। অস্বাভাবিক কিছুই বের করতে পারলাম না ছবিটার। নিরেট কাঠে তৈরি ফ্রেম,

ফাঁপাও নয় যে তার ভেতর কোন নকশা জাতীয় কিছু ভরে রাখা যাবে।

কিন্তু কিশোর হাল ছাড়ল না। সামনে এগিয়ে, পিছিয়ে গিয়ে, মাথা এপাশে কাত করে, ওপাশে কাত করে দেখতে লাগল। সেই সঙ্গে চলল তার নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা।

আচমকা আনমনে বলে উঠল, 'ব্যাপারটা অদ্ভুত!'

'কি অদ্ভুত?' জানতে চাইলাম আমি আর মুসা।

'আমিন উদ্দিন সরকারের বাবরি চুল।'

'চুলে আবার কি করল?' বুঝতে পারলাম না।

'হয়তো কোন ফকির কিংবা পীরের মুরিদ ছিলেন,' মন্তব্য করল মুসা। 'এ দেশে অনেককেই তো ও-রকম রাখতে দেখি, যেন মুরিদ হলে বাবরি না রাখলে চলে না।'

'পীরের অনুকরণ করে আরকি,' কিশোর বলল। 'আমিন উদ্দিন সরকার কেন ও রকম চুল রেখেছিলেন, সেটা তাঁর ব্যাপার, আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমার প্রশ্ন হলো, বাক্সের ছবিটাতে খাটো করে ছাঁটা চুল এঁকেছেন কেন তিনি?'

'আঁকার সময় হয়তো তাঁর ছোট চুল ছিল।'

'সেই কথাটাই ভাবছি। কি করে জানব?' দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আবার ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। দু-বার চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'রবিন, ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা নিয়ে আসবে? ছবিটাও নিয়ে এসো।'

ঘর থেকে ওগুলো এনে দিলাম তাকে।

দুটো ছবি মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে লাগল সে।

বাবরির ওপর ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা ধরে রাখল দীর্ঘক্ষণ। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল তার মুখে। মাথা দুলিয়ে বলল, 'হুঁ, বুঝেছি! এত্তো সহজ, অথচ...'

'কি বুঝেছ!' প্রায় চিৎকার করে উঠলাম আমি আর মুসা।

কিন্তু কিশোর জবাব দেয়ার আগেই ঝটকা দিয়ে খুলে গেল সদর দরজা। ছুটে ঘরে ঢুকল আক্কেল আলী। ভীষণ উত্তেজিত। চিৎকার করে ডাকতে লাগল, 'মা, ও মা, জলদি বেরোন! সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে! মা-আ!'

রান্নাঘর থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরোলেন দাদী। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে রে! অত চিৎকার করছিস কেন?'

'সর্বনাশ হয়ে গেছে, মা! সাহেব অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন! লোক এসে খবর দিল, এখুনি হাসপাতালে যেতে হবে আপনাকে!'

কিসের গুপ্তধন খোঁজা, আর কিসের ছবি-রহস্যের সমাধান, দল বেঁধে হাসপাতালে ছুটলাম আমরা।

খুব ব্যথা পেয়েছেন মতিদাদা। সারা গায়ে ছোট-বড় ব্যান্ডেজ, বাঁ পায়ে প্লাস্টার। হাড় ভেঙে গেছে। তবে হুঁশ আছে তাঁর। আমাদের দেখে মলিন হাসি হাসলেন। প্রথমেই দাদীকে সাবধান করে দিলেন চিৎকার করে কান্নাকাটি না করতে।

তাঁর মুখেই জানলাম, রঙ সাইড থেকে একটা ট্রাক এসে গুঁতো মেরেছিল তাঁর

গাড়িকে। ভাগ্যিস তিনি আস্তে চালাচ্ছিলেন, তাই অনেকটা সামলে নিতে পেরেছেন। নয়তো মুখোমুখি সংঘর্ষেই ভর্তা হয়ে যেত গাড়িটা। রাস্তার পাশের খাদে উল্টে পড়াও বিচিত্র ছিল না। যা-ই ঘটুক না কেন, এ কাহিনী বলার জন্যে আর বেঁচে থাকতেন না তাহলে। ট্রাকের নম্বর রাখতে পারেননি তিনি। তবে একটা ব্যাপার তাঁর মনে হয়েছে, ইচ্ছে করেই এসে গুঁতো লাগিয়েছে ট্রাকটা। যেন মারার জন্যেই রাস্তার মোড়ে ওত পেতে বসে ছিল।

ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হলো আমার কাছে। প্রশ্ন জাগল, এই দুর্ঘটনার সঙ্গে গুপ্তধনের কোন সম্পর্ক নেই তো? কিন্তু আমরা যে গুপ্তধন খুঁজছি কে জানে? কারও তো জানার কথা নয়!

হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার শেষ হলো। বাড়ি ফিরে যেতে হবে। দাদাকে দেখাশোনার জন্যে তাঁর কাছে রয়ে গেলেন দাদী। বার বার দুঃখ প্রকাশ করলেন, আমাদের খুব অসুবিধে হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা সে-কথা উড়িয়ে দিয়ে বললাম, কোন অসুবিধে হবে না। আক্কেল আলী থাকলেই যথেষ্ট। সে না থাকলেও অসুবিধে নেই, আমরাই রান্না করে খেতে পারব। বাড়িটা খালি হয়ে যাওয়ায় মনে মনে খুশি হলো বরং কিশোর—পরে বলেছে আমাকে আর মুসাকে, রহস্যটার সমাধান করতে সুবিধে হবে।

সকালে চমৎকার রোদ ছিল, কিন্তু হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এখন দেখি কেমন যেন মুখ গোমড়া করে রেখেছে আকাশ। গুমোট গরম, বাতাস স্তব্ধ। আকাশের ঈষাণ কোণে একটুকরো সুরমা রঙের মেঘ যেন গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। ভাবেসাবে মনে হলো, কোন কারণে যেন রেগে গেছে প্রকৃতি, ফেটে পড়ার অপেক্ষায় আছে। সন্দেহ হলো, কালবোশেখি আসছে না তো?

বাড়ি ফিরে উঠানে ঘুঘুর পালকে দানা খুঁটতে দেখলাম না। কবুতরগুলো গিয়ে বসেছে ছাতের কার্নিশে, বকবকম নেই, চুপ করে থাকার মধ্যেও যেন কি এক ধরনের অস্থিরতা। বিপদের আশঙ্কা করছে বোঝা গেল।

যাই হোক, খাওয়া-দাওয়া সেরে আর কোন কাজ না থাকায় কিশোরের উৎসাহে ছবি-রহস্য সমাধানের কাজে লেগে গেলাম আমরা। দাদার এখন অনেক টাকা দরকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গুপ্তধনগুলো উদ্ধার করা গেলে ভাল।

যে কথাটা তখন বলতে গিয়ে বলতে পারেনি কিশোর, দাদার অ্যাক্সিডেন্টের কথায় থেমে যেতে হয়েছিল, সেটাই বলল, 'বাক্সে পাওয়া ছবির চুলের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ? খাটো করে আঁকা-ই হয়েছে দেয়ালে ঝোলানো ছবিটার বাবরি চোখে পড়ানোর জন্যে। আর এর মধ্যেই করে রাখা হয়েছে কারসাজি। ভাল করে দেখো আরেকবার, তোমরাও বুঝতে পারবে।'

দেখলাম, যতভাবে সম্ভব। সেই আগের মতই অন্ধকারে রইলাম। মুসা বলল, 'দেখো, পারলে আগেই পেরে ফেলতাম; ঝুলিয়ে না রেখে বলেই ফেলো না ছাই!'

কিশোর বলল, 'যত কারসাজি চুলের মধ্যে করে রাখা হয়েছে। দেখো, ভিন্ন ভিন্ন রঙে অতি খুদে খুদে অক্ষর আর নম্বর লেখা।'

প্রায় ছোঁ মেরে কিশোরের হাত থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা কেড়ে নিলাম। সত্যিই তো! খুব সরু নিবের কলম দিয়ে এমন করে আঁকা হয়েছে ওগুলো, মিশে

রয়েছে কোঁকড়া চুলের মধ্যে। জানা না থাকলে মনে হবে চুলের অলঙ্করণ করার জন্যে ওসব এঁকেছে আর্টিস্ট। ভাল বুদ্ধি করেছিলেন আমিন উদ্দিন সরকার।

'নিশ্চয় কোন তথ্য দিয়েছেন!' মুসা বলল। 'গুপ্তধনের খোঁজ!'

'তা দিয়েছেন,' কিশোর বলল। 'তবে খুবই গোলমেলে জিনিস। সাঙ্কেতিক। সঙ্কেতের মানে বের করতে না পারলে বোঝা যাবে না কোথায় আছে।'

'তাহলে বসে আছো কেন? শুরু করে দাও না। আমরা যে পারব না, অন্তত আমি পারব না এ তো জানা কথাই।'

আবার ম্যাগনিফাইং গ্লাস তুলে নিল কিশোর। দেখতে লাগল খুদে অক্ষর আর নম্বরগুলো।

'দেখো, একটা নিয়ম মেনে চলা হয়েছে। চুলের দুটো করে ভাঁজের ফাঁকে, মাঝখানে একসারিতে রয়েছে অক্ষরগুলো। একেক সারির একেক রঙ। লালচে, ধূসর, বাদামী, ছাই রঙ···রঙের এই বিভিন্নতা কেন? একেকটা রঙ কি একেকটা বাক্য গঠন করেছে?'

'অক্ষরগুলো এত ছোট, ঠিকমত পড়া যায় না,' বললাম।

'ইচ্ছে করেই অত ছোট করেছে, নইলে তো যে কারোই চোখে পড়ে যেত। গ্লাস দিয়ে চেষ্টা করলে পড়া যাবে। এক কাজ করো, কাগজ কলম নিয়ে এসো।'

নোটবুক আর পেন্সিল পকেটেই থাকে আমার। বের করে তৈরি হয়ে বসলাম।

বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ বাজ পড়ল প্রচণ্ড শব্দে। ভীষণ চমকে গেলাম। ছুটে দরজার বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি আর মুসা। তাজ্জব হয়ে দেখলাম আকাশের রূপ। সেই সুরমা রঙের মেঘের টুকরোটাই বিরাট-বিশাল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় আধখানা আকাশ জুড়ে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তার ভেতর। আরও কিছু ছেঁড়া মেঘের টুকরো ছুটাছুটি করছে আকাশের ইতিউতি।

'কালবোশেখি আসছে,' পেছন থেকে বলে উঠল কিশোর।

মালীর ঘর থেকে বেরিয়ে এল আক্কেল আলী আর কালু। আক্কেল আলী বলল, 'ঘরে যান, ঝড়বৃষ্টি হবে।'

আমি বললাম, 'আসুক। ঝড় দেখব আজ।'

হাসল আক্কেল আলী। বলল, 'আম কুড়ানোর ইচ্ছে আছে নাকি?'

'আছে!' লাফিয়ে উঠল মুসা। 'অসুবিধে হবে?'

'কিছু হবে না, যদি আসল ঝড়টা আসার আগেই ঘরে ঢুকে যান। বেশি ঝড়ে ডাল ভেঙে পড়ে, গাছ উপড়ায়, মাথায় পড়লে মরবেন।'

শাঁই শাঁই একটা আওয়াজ কানে আসছিল, বুঝতে পারছিলাম না কিসের, গাছের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই বুঝলাম বাতাসের শব্দ শুনছিলাম। অনেক জায়গায় অনেক রকমের ঝড় দেখেছি, কিন্তু এর যেন তুলনা হয় না। স্তব্ধ হয়ে থাকা গাছের ডালপাতা আচমকা ভীষণ দুলতে আরম্ভ করল। প্রচণ্ড আঘাতে শুকনো পাতা উড়তে লাগল। টুপটাপ খসে পড়তে লাগল পাকা আম।

লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে গেলাম আমরা তিনজন। পাকা আম কুড়াতে শুরু করলাম। কিন্তু কটা কুড়াব! দু-হাতে দুটো তুলে নিতে না নিতেই আশপাশে আরও দশ-বিশটা করে পড়ে। আম কুড়াতে যে এত মজা জানতাম না।

মহাআনন্দে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল কালু। আম তো তুলতে পারে না, চারপাশে নাচানাচি আর ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিল। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে আক্কেল আলী।

কয়েক মিনিট পর ক্ষণিকের বিরতি দিয়ে আবার বইতে শুরু করল বাতাস। আগের চেয়ে দ্বিগুণ জোরে। সেই সঙ্গে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়তে লাগল। এইবার শঙ্কা দেখা দিল আক্কেল আলীর চোখে। জরুরী গলায় বলল, 'জলদি ঘরে যান! তুফান এসে গেছে!'

বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। কিন্তু প্রবল বাতাস আর বৃষ্টির দাপটে সেখানেও টিকতে পারলাম না। ঘরে ঢুকে যেতে হলো। আমাদের সঙ্গে ঢুকল আক্কেল আলী আর কালু।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে বইল ভয়াবহ ঝড়। তারপর হঠাৎ যেমন এসেছিল তেমনি করেই থেমে গেল আবার। কমে গেল বাতাস, আস্তে আস্তে বৃষ্টি পড়াও থেমে গেল। বাইরে বেরিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। পশ্চিম আকাশে বিশাল এক মেঘের পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে পড়ন্ত সূর্য। আশ্চর্য তার রূপ আর রঙ! বিশ্বাসই হতে চায় না—এই কয়েক মিনিট আগেও কালিগোলা অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল এখানে পৃথিবী। মাটিতে পড়ে থাকা ঝরাপাতার স্তূপ, ভেঙে পড়া ডাল আর পানি জমা না থাকলে ঝড় হয়ে গেল যে সেটাই বোঝা যেত না।

অনেক আম পাওয়া গেল। খেতে খেতে গলা পর্যন্ত ভরে গেল আমাদের। দু-হাত, মুখ রসে মাখামাখি। ফল যে কোনদিন এত মজা করে, এভাবে খাওয়া যায়, তা-ও জানতাম না। এত মায়া, এত মাধুর্য আছে যে এই দেশটাতে, এখানে কেউ না এলে, বাস না করলে অনুভব করা তো দূরের কথা, আন্দাজও করতে পারবে না।

সন্ধ্যা হলো। প্রচণ্ড ঝড়ের পর কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে প্রকৃতি। দূর থেকে আজান শোনা গেল। ধ্যানমগ্ন হয়ে গেছে বুঝি সবাই—ওই যে গোধূলির কালচে আকাশ, নিচের গাছপালায় ছাওয়া প্রকৃতি, পোকামাকড়, পশুপাখি, সব, সবাই যেন স্রষ্টার প্রার্থনায় মগ্ন। দেখতে দেখতে মনটা বিষণ্ন হয়ে যায় অকারণে।

আলো জ্বেলে দিল আক্কেল আলী। রাতের জন্যে রান্না করতে গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে। আমরা তিন বন্ধু আবার ফিরে এলাম হলঘরে, আমিন উদ্দিন সরকারের ছবির কাছে। সাঙ্কেতিক অক্ষরের সমাধান করতে বসলাম।

অক্ষর আর নম্বরগুলো সাজিয়ে ফেলতে লাগল কিশোর। সে বলতে লাগল, আমি লিখে নিলাম। প্রথমে লালচে রঙে লেখা অক্ষর, লাইনটা দাঁড়াল এ রকম:

নিজচে২ খোঁজজো৪ আধাজর৩ জালেজর১

তারপর বাদামী:

আজছে২ তাজাহার৩ ভেজতর৪ সিজন্দুক১

একেক রঙে লেখা অক্ষরের একেকটা লাইন, সব মিলিয়ে হলো চারটে:

নিজচে২ খোঁজজো৪ আধাজর৩ জালেজর১
আজছে২ তাজাহার৩ ভেজতর৪ সিজন্দুক১
সাজত১ তিজন২ পাঁজচে৩ মিজলিয়ে৪ দেজখো৫
রজত্নরাজি৩ পেজয়ে১ যাজবে২

অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম বোকার মত, কিছুই বুঝতে পারলাম না।

মুসা তো বলেই ফেলল, 'খাইছে! এ কোন ভাষা!'

কারও কথার জবাব দিল না কিশোর। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অক্ষরগুলোর দিকে। তারপর নীরবে আমার হাত থেকে পেন্সিলটা নিয়ে বলল, 'মনে হয় বুঝতে পারছি। এক, দুই, তিন করে নম্বর দেয়া আছে। নম্বর অনুসারে অক্ষরগুলোকে পর পর সাজিয়ে ফেলা যাক।'

সাজিয়ে লেখার পর দাঁড়াল:

জালেজর নিজচে আধাজর খোঁজজো
সিজন্দুক আজছে তাজাহার ভেজতর
সাজত তিজন পাঁজচ মিজলিয়ে দেজখো
পেজয়ে যাজবে রজত্নরাজি

মুসা বলল, 'এতেই বা কি হলো? সহজ কি হয়েছে?'

হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। মাথা নেড়ে বলল, 'হয়েছে।' আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখনও বুঝতে পারছ না? একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ? প্রতিটি শব্দেই একটা করে বর্গীয় জ জুড়ে দেয়া হয়েছে, জটিল করে তোলার জন্যে। বাদ দিয়ে দাও...'

'বুঝে গেছি!' প্রায় চিৎকার করে উঠলাম। পানির মত সহজ হয়ে গেছে এখন। তাড়াতাড়ি নোটবুকে লিখে ফেললাম:

জালের নিচে আধার খোঁজো
সিন্দুক আছে তাহার ভেতর
সাত তিন পাঁচ মিলিয়ে দেখো
পেয়ে যাবে রত্নরাজি

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। বলল, 'মেসেজ পেয়ে গেছি! কোথায় খুঁজতে হবে বলে দিয়েছে! কাল থেকেই শুরু করব খোঁজা!'

সাত

সারাদিন অনেক পরিশ্রম গেছে। রাতের খাওয়া সেরে শোয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে

ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাঝরাতে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল আমার। কালুর ডাকে। নিচতলায় আক্কেল আলীর সঙ্গে ছিল সে। এখন বাইরে চলে গেছে। তার ঘেউ ঘেউ শুনে আক্কেল আলীর ঘুমও ভাঙল। ডাকতে ডাকতে বাইরে বেরোল সে।

মুসা আর কিশোরও জেগে গেল। সবাই বেরোলাম। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করলাম আক্কেল আলীকে। সে বলল, 'মনে হয় চোর ঢুকেছিল!'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু নিয়েছে?'

'বুঝতে পারছি না!'

ঘরে ফিরে এসে দেখতে লাগল সে, কিছু নিয়েছে কিনা। দেখা গেল সব ঠিকঠাকই আছে। কিছু খোয়া যায়নি। সময়মত কালু জেগে যাওয়াতেই বোধহয় খালিহাতে পালিয়েছে।

তবে খালি হাতে যে যায়নি, যা নিতে এসেছিল, নিয়েই গেছে, সেটা জানতে পারলাম পরদিন সকালে। আমাদের ঘরে টেবিলের ওপর রেখেছিলাম পোড়ো বাড়িতে পাওয়া বাক্স আর তার ভেতরের কাগজটা। অনেক খুঁজেও আর পেলাম না সেটা। বুঝলাম, ওটা নিতেই এসেছিল চোর।

আরও নিশ্চিত হয়ে গেলাম, সঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা। গুপ্তধনগুলো এখনও খোয়া যায়নি, এ বাড়িতেই আছে। তবে দুঃখের বিষয়, আমরা ছাড়াও আরও কেউ জানে সে-খবর। ছবিটাও নিয়ে গেছে। আমাদের আগেই যদি গুপ্তধন কোথায় আছে, বের করে ফেলে?

কিশোর বলল, 'ফেললে ফেলুক। সিন্দুকের চাবি আমাদের কাছে। খুলবে কি করে?'

'তালা ভেঙে,' জবাব দিল মুসা।

'দেখা যাক কি করে। আমরাও তো আর বসে থাকব না। আমাদের অনেক সুবিধে। বাড়ির যেখানে-সেখানে যখন-তখন খোঁজাখুঁজি করতে পারব, সে পারবে না। তাকে আসতে হবে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে।'

তা-ও বটে।

খাবার তৈরি করে, টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে হাসপাতালে রওনা হয়ে গেল আক্কেল আলী। আমরা বাড়িতেই রয়ে গেলাম। বলে দিলাম, বিকেলে ভিজিটিং আওয়ারে দাদাকে দেখতে যাব।

সকালের নাস্তা সেরেই আর দেরি করল না কিশোর, মেসেজটার মানে বের করতে বসে গেল। কয়েকবার করে পড়ল ছড়াটা। তারপর বলল, 'প্রথম লাইনটা থেকে শুরু করি—জালের নিচে আধার খোঁজো!'

'আধার মানে তো পাত্র, তাই না?' মুসার প্রশ্ন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ।'

'কি বলতে চায়? কোন জালটালের নিচে লুকিয়ে রেখেছে সিন্দুকটা?'

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'জাল এমন কোন জিনিস নয় যার নিচে দেখা যায় না। তা ছাড়া সুতার জাল আর কতদিন টেকে? ব্যবহার করলে তো যায়ই, পড়ে থাকলেও নষ্ট হয়ে যায়।'

'তাহলে?'

'সেটাই তো ভাবছি,' আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর।

আমি বললাম, 'আচ্ছা, দেখতে ভুল করোনি তো? হয়তো জল লিখেছে, তুমি পড়েছ জাল...'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে তুড়ি বাজাল কিশোর, 'ঠিক বলেছ! জলই হবে! তাহলে মিলে যায়! জলের নিচে আধার খোঁজো, তার ভেতরে সিন্দুক আছে! তার মানে কোন জলাশয় বা পানির নিচে লুকানো আছে একটা বড় পাত্র, তার মধ্যে রাখা হয়েছে সিন্দুকটা।'

'পুকুরের নিচে না তো?' মুসা বলল, 'মজা পুকুরটা! আমি বাবা ওর মধ্যে নামতে পারব না! সাধারণ সিন্দুক থাকলেই ওতে ভূত হয়ে যাবে, আর রত্ন ভরা লোহার সিন্দুক হলে তো কথাই নেই, ভূতুড়ে সিন্দুকদের রাজা হবে!'

'ওই পুকুরে ডুব দিতে আমারও ভয় লাগবে,' স্বীকার করল কিশোর। 'এক কাজ করতে পারি আমরা। আক্কেল আলী এলে, জেলে এনে মাছ ধরার ছুতোয় বেড়জাল নামিয়ে দিতে পারি। নিচে থাকলে জালে আটকাবেই সিন্দুকটা।'

'যদি দীঘিটাতে ফেলে দিয়ে থাকে?' আমি প্রশ্ন তুললাম।

'আমার তা মনে হয় না। এত বড় দীঘি থেকে যে সিন্দুক তোলা সহজ হবে না, এত নিচে নেমে কেউ খুঁজতে পারবে না, এটা জানা ছিল আমিন সরকারের। নিজেকে দিয়েই ভাবি, তার পরিস্থিতিতে আমি হলে কি করতাম? এমন কোথাও রাখতাম, যেখানে খোঁজার কথা সহজে মনে আসবে না কারও, কিন্তু জেনে গেলে বের করে আনতে আর অসুবিধে হবে না। দীঘির তলা থেকে তুলে আনা বেজায় কঠিন। একমাত্র উপায়, সমস্ত পানি সেঁচে ফেলা। তারপরেও কথা থাকে, কাদায় বেশিদিন জেগে থাকবে না ভারি সিন্দুক, দ্রুত তলিয়ে যাবে। তখন পানি সেঁচলেও আর পাওয়ার উপায় থাকবে না। দীঘির নিচে লুকানোটা মোটেও নিরাপদ না। এমন কোথাও রেখেছেন, যেখানে সহজে খুঁজে পাবে না কেউ, আবার নিরাপদেও থাকবে দীর্ঘদিন।'

'পুকুরের বেলায়ও তো এ কথা খাটে?'

'তা খাটে। তবে ছোট পুকুর তো, পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তা ছাড়া তখন তাড়াহুড়োয় কোনমতে সিন্দুকটা লুকিয়ে ফেলার কথাই কেবল ভেবেছেন আমিন সরকার...'

'আচ্ছা,' বাধা দিয়ে মুসা বলল, 'আরও সহজ জায়গার কথা ভাবছি না কেন আমরা?'

'কোথায়?' জানতে চাইলাম আমি আর কিশোর।

'পোড়ো বাড়িটার পাশের মাছের অ্যাকোয়ারিয়াম! ওটাও তো জলাশয়...'

'তাই তো!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর, 'আজকে আমার মাথাটার হলো কি? এটা ভাবলাম না কেন? জলদি চলো! শাবল, কোদাল নিয়ে যাব!'

কালুকে সঙ্গে করে সেই পোড়োবাড়ির কাছে চলে এলাম আমরা। অগভীর নালার মুখটা মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতেই পুকুরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অ্যাকোয়ারিয়ামের সামান্য পানি সেঁচে ফেললাম আমরা। নিচে কাদা।

কোদাল দিয়ে তুলে ফেলতে যথেষ্ট কষ্ট হলো। তারপরে মাটি খোঁড়া অবশ্য সহজ হয়ে গেল, ভেজা মাটি বেশ নরম। কোপ দিলেই উঠে চলে আসে।

কিন্তু ছয়…সাত…আট ফুট গর্ত করে ফেলার পরও কিছুই পাওয়া গেল না। শাবল কিংবা কোদালের ফলায় লেগে ঠং করে উঠল না লোহার সিন্দুক। আরও ফুট দুয়েক খুঁড়ে দেখল মুসা। গলগল করে পানি উঠে আসছে এখন গর্তের নিচে। ভরে যাচ্ছে।

বোঝা গেল, এখানে নেই সিন্দুকটা।

ক্লান্ত হয়ে বেতবন থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। সারা গা কাদায় মাখামাখি। দীঘির পানিতে ধুয়ে ফেললাম। খিদে ততটা পায়নি, কারণ কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর আম খেয়েছি।

খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে বাড়িতে এসে ভাত খেয়ে নিলাম। সকালেই রান্না করে রেখে গেছে আক্কেল আলী। তারপর আবার বেরোলাম গুপ্তধন খুঁজতে।

পুকুর আর দীঘিটা বাদে যত রকম জলাশয়, অর্থাৎ পানির আধার আছে ও বাড়িতে, সমস্ত জায়গায় খুঁজলাম। পানির ট্যাংকের ওপর উঠে ঢাকনা তুলে ভেতরটা দেখল মুসা। বাগানের ট্যাপের নিচে মাটি খুঁড়ে দেখা হলো। এমনকি ঘরে-বাইরে যতগুলো কল আছে, সবগুলোর আশপাশের, নিচের দেয়াল ঠুকে ঠুকে দেখলাম কোথাও ফাঁপা জায়গা আছে কিনা। টর্চের আলো ফেলে পুরানো পাতকুয়াটার নিচেটা দেখলাম। পানি নেই এখন। শুকনো। সিন্দুক জাতীয় কিচ্ছু চোখে পড়ল না।

বেশ হতাশ হয়েই বিকেল বেলা হাসপাতালে রওনা হলাম তিনজনে। কালুকে রেখে গেলাম বাড়ি পাহারায়। টিক্কা খানও রইল, তবে তাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। চোর এলে ঠেকাতে পারবে না সে, ঠেকাতে যাবেও না। সে নিজেই একটা বড় চোর।

মতিদাদার অবস্থা আজকে বেশ খারাপ মনে হলো। দাদীর মুখ শুকনো। কি ব্যাপার? ডাক্তার বললেন, না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। জখমগুলো ফুলেছে, প্রচণ্ড ব্যথা, সে-জন্যেই কষ্ট পাচ্ছেন দাদা। ব্যথা কমানোর ইনজেকশন দেয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে ঘুমের ওষুধ, সেরে যাবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বেন দাদা।

দুঃখ করে দাদী বলতে লাগলেন, আমরাও বেড়াতে এলাম, আর এ রকম একটা অঘটন ঘটল। আটকে বসে থাকতে হচ্ছে তাঁকে, আমাদের জন্যে কিছুই করতে পারছেন না।

তাঁকে নানা ভাবে সান্ত্বনা দিলাম। কিশোর ইঙ্গিত দিল, খুব তাড়াতাড়িই গুপ্তধনগুলোও বের করে ফেলা যাবে। ও বাড়িতেই যে আছে ওগুলো, এখন এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

ভিজিটিং আওয়ার শেষ হলে বাড়ি ফিরলাম আমরা।

সিংহ দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ভেবেছিলাম, গেটের কাছে বসে থাকবে কালু, কিন্তু তাকে দেখলাম না। উঠানে এসে দেখি নিশ্চিন্ত মনে খাবার খুঁটছে একজোড়া ঘুঘু আর কয়েকটা কবুতর। কালু নেই। গেল কোথায়? হঠাৎ তার ঘেউ ঘেউ শোনা গেল মালীর ঘর থেকে, আমাদের সাড়া পেয়েই বোধহয় ডেকেছে।

গিয়ে দেখি বাইরে থেকে দরজায় শেকল তুলে দিয়ে ঘরে আটকে রাখা হয়েছে তাকে। অবাক কাণ্ড! কে করল এ কাজ?

গম্ভীর হয়ে কিশোর বলল, 'ওই চোরটা এসেছিল! কোন ভাবে কুত্তাটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘরে আটকে রেখে গুপ্তধন খুঁজেছে! জলদি এসো, দেখি কি করল!'

আর কোথাও কোন পরিবর্তন দেখলাম না, কেবল হলঘরে আমিন উদ্দিন সরকারের ছবিটা মেঝেতে নামানো। তারমানে আমাদেরই মত ওটার পেছনে গুপ্তপথ আছে কিনা দেখতে চেয়েছে চোর। বোধহয় আমাদের সাড়া পেয়েই আর তোলার সময় পায়নি, তাড়াহুড়ো করে পালিয়েছে।

'আচ্ছা, আক্কেল আলী কিছু করছে না তো?' মুসার প্রশ্ন।

মাথা নাড়ল কিশোর, 'মনে হয় না। এ বাড়ির অনেক পুরানো চাকর সে...'

'পুরানো চাকরেরা যে অঘটন ঘটায় না, এমন তো কোন কথা নেই। হাসপাতাল থেকে আমাদের অনেক আগে বেরিয়ে এসেছে সে।'

'সে তো বাজারে যাবে বলে।'

'আমরা তো আর সঙ্গে যাইনি। দেখব কি করে? বাজারে যাওয়ার ছুতো করে হয়তো এখানে চলে এসেছিল।'

চুপ হয়ে গেল কিশোর। হ্যাঁ-না কিছু আর বলল না।

আমরা আসার ঘন্টাখানেক পর ফিরল আক্কেল আলী। হাসল আমাদের দিকে তাকিয়ে। বলল, 'আজ পাঙ্গাস মাছ রান্না হবে। অনেক বড় দেখে এনেছি। টমোটো দিয়ে মাছ, ফুলকপি ভাজি, ডাল। আম-কাঁঠাল-দুধ তো আছেই। চলবে?'

মুহূর্তে চোরের খাতা থেকে তাকে খারিজ করে দিল মুসা। তাড়াতাড়ি বলল, 'চলবে মানে! জলদি যাও, ভাই, রান্নাটা সেরে ফেলো! এতটা খিদে পেয়েছে বুঝিনি।'

আক্কেল আলী রান্নাঘরে চলে গেল। আমরা বেরিয়ে এসে বসলাম দীঘির ঘাটে। সূর্য তখন প্রায় ডুবে গেছে। পশ্চিম আকাশের বিশাল মেঘটা একটা লাল-কালো বিচিত্র পাহাড়ের মত লাগছে।

গুপ্তধনের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম আমরা।

কিন্তু কোন মানে বের করতে পারলাম না। মুসা বলল, 'দেখো, আমার মনে হয় ওই মজা পুকুরটাতেই খোঁজা দরকার। জেলে নামিয়ে দিয়ে দেখা উচিত।'

'দাদা থাকলে সুবিধে হত,' কিশোর বলল। 'বেকায়দা হয়ে গেল। দেখি আক্কেল আলীকে জিজ্ঞেস করে, সে কোন ব্যবস্থা করতে পারে কিনা।'

আট

খাবার টেবিলে বসে জিজ্ঞেস করা হলো আক্কেল আলীকে। কেন জাল ফেলতে চাই, জানতে চাইল সে। সব শুনে বলল, 'তা জেলের ব্যবস্থা করা যায়। নগদ

টাকা দিতে হবে না। মাছ যা উঠবে তার অর্ধেক দিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু ওই পুকুরটাতে ভাল জাতের মাছ কিছু নেই। শোল, গজার এসব ছাড়া।'

'ওসব মাছের ভাগ নিয়ে কোন জেলে জাল ফেলতে রাজি হবে না?' কিশোর জানতে চাইল।

'তা হয়তো হবে। শোল-গজারেরও মেলা দাম। মাছই পাওয়া যায় না আজকাল মোটে। ভোরবেলা বেরোব। পেয়ে যাব কাউকে না কাউকে।'

রাতটা নিরাপদেই কাটল।

পরদিন সকালে জেলের ব্যবস্থা ঠিকই করে ফেলল আক্কেল আলী।

তিনবার করে বেড় দেয়া হলো পুকুরটাতে। ভকভক করে নিচ থেকে কাদা উঠে ওপরের পানিও ঘোলা করে দিল, সর্বনাশ হয়ে গেল শাপলার। মাছ ধরা পড়ল প্রচুর—কই, শিং, মাগুর, টাকি, শোল এসব মাছ। জেলেরা অখুশি হলো না। অখুশি হলাম আমরা। সিন্দুক তো দূরের কথা, ছোটখাটো একটা বাক্সও পাওয়া গেল না।

মাছের ভাগ নিয়ে চলে গেল জেলেরা। ভাগে পাওয়া বাকি অর্ধেক মাছের বেশির ভাগই আবার পুকুরে ছেড়ে দিল আক্কেল আলী, কিছু জিইয়ে রাখল খাওয়ার জন্যে।

দাদা আর দাদীর জন্যে খাবার নিয়ে হাসপাতালে চলে গেল সে। আমরা আবার এসে বসলাম পুকুর পাড়ে।

কিশোর হাত বাড়াল আমার দিকে, 'দেখি, দাও তো তোমার নোটবইটা। মেসেজের মানে বুঝতে হয়তো ভুল করেছি আমরা। অন্য কিছু বোঝাতে চেয়েছে।'

কয়েকবার করে ছড়াটা পড়ল সে।

আমি বললাম, 'আচ্ছা, তোমার দেখার ভুল না তো? লিখেছে এক অক্ষর, তুমি পড়েছ আরেকটা, এমন হতে পারে না?'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'তা তো পারেই! চলো, দেখি!'

ভুল একটা সত্যিই হয়েছে, বেরোলো সেটা। প্রথম লাইনে 'জালের নিচে আধার খোঁজো'র জায়গায় হবে 'জালের নিচে আঁধার খোঁজো'। মাত্র একটা চন্দ্রবিন্দুর গোলমাল। কিন্তু ওই একটা চন্দ্রবিন্দুই যে এভাবে ভোগাবে আমাদের, তা কি আর জানতাম!

মুসা বলল, 'লাভটা কি হলো? আগের মতই গ্রীক ভাষা হয়ে আছে। জালের নিচে আঁধার কোথায়? জাল নিজেই তো একটা ফাঁকওয়ালা জিনিস...'

লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর। বলল, 'বোধহয়, বুঝেছি! এসো!'

সোজা আমাদের থাকার ঘরে চলে এল সে। চৌকাঠের নিচ থেকে বের করল লুকিয়ে রাখা চাবিটা। টর্চ নিয়ে এগোল আলমারির দরজার মত দরজাটার দিকে। কোন প্রশ্ন করলাম না। জানি, নিজে থেকে কিছু সে না বললে প্রশ্ন করে তার কাছে থেকে জবাব পাব না।

দরজা খুলে আমাদের নিয়ে চলে এল সিঁড়ির নিচে। জালের মত ঢাকনাটার কাছে এসে কিশোর বলল, 'দেখো, এইটাকে যদি জাল ধরে নিই, তাহলে এর নিচে কি আছে?'

'কয়লা,' নিরীহ স্বরে জবাব দিল মুসা।
আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'অন্ধকার!'
'হ্যাঁ, অন্ধকার,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'মানে, আঁধার। জালের নিচে আঁধার খুঁজতে বলা হয়েছে। চলো, সেটাই এখন খুঁজি।'
একটানে ঢাকনাটা খুলে নিয়ে সবার আগে নেমে পড়ল মুসা। আমি আর কিশোর নামলাম তার পেছনে। দেয়াল ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করলাম আমরা। মেঝে পরীক্ষা করলাম—জায়গায় জায়গায় ছাল-চামড়া ওঠা, মেরামত করার কথাও আর মনে হয়নি কারও। এখানে নামেই না কেউ। প্রায়োজন পড়ে না। কোথাও কোন ফাঁপা শব্দ হলো না। ঘরে কোন জানালা দরজা নেই, আলো আসার পথ নেই, ঢোকার একমাত্র পথ ওই জালিকাটা ঢাকনাটা।
সিন্দুকটা আছে কোথায়? প্রশ্নটা আমাদের সবারই মনে।
এককোণে অযত্নে ফেলে রাখা হয়েছে কিছু কয়লা, ছোট একটা স্তূপ। সেদিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে লাগল কিশোর।
বাইরে কালুর ঘেউ ঘেউ শোনা গেল। সে যে উত্তেজিত হয়ে ডাকছে, গুপ্তধনের চিন্তা আমাদের মাথায় না থাকলে হয়তো বুঝতে পারতাম। কিন্তু এ-মুহূর্তে কোন গুরুত্বই দিলাম না ডাকটাকে।
কয়লার স্তূপের দিকে হাত তুলল কিশোর, 'ওর নিচে দেখতে হবে।'
মরচে পড়া একটা বেলচা পড়ে আছে। সেটা তুলে নিল মুসা।
কয়লা সরাতে দেরি হলো না। মেঝেতে দেখা গেল খানিকটা জায়গার প্লাস্টার নেই। ইঁট বেরিয়ে আছে। ওরকম ইঁট ঘরের অনেক জায়গাতেই বেরিয়ে আছে। আলাদা কিছু না। খুব একটা আশা করতে পারলাম না।
শাবল দিয়ে চাড় মেরে সেগুলো তোলার পরই কিন্তু বেরিয়ে পড়ল একটা খুদে আয়রন সেফ। চিত করে শোয়ানো। ডালা এবং হাতল ওপরের দিকে করা।
উত্তেজনায় প্রায় কাঁপছি আমি। মুসার অবস্থাও আমারই মত।
আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। বলল, 'জালের নিচে আঁধার খোঁজো, সিন্দুক আছে তাহার ভেতর। এটুকু মিলে গেল। এবার পরের লাইন—সাত তিন পাঁচ মিলিয়ে দেখো। এটা সহজ,' নিজেই যেন নিজেকে বোঝাচ্ছে সে, 'লক কম্বিনেশন।' চাবির ফুটোয় চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিল। ঘুরল না। নব ধরে কম্বিনেশন মেলাতে শুরু করল—সাত…তিন…পাঁচ। কট করে একটা আওয়াজ হলো। আবার চাবিতে মোচড় দিতেই খুলে গেল তালা।
হাতল ধরে বাঁকা করে চাপ দিয়ে টেনে ডালা খুলল কিশোর।
হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম আমরা। টর্চের আলোয় যেন জ্বলতে লাগল সোনা আর পাথরে তৈরি মহামূল্যবান জিনিসগুলো।
দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকার পর নীরবতা ভাঙল মুসা, 'খাইছে, কি জিনিসরে বাবা! দাম কত হবে?'
খড়খড়ে গলায় জবাব এল ওপরের ঢাকনার কাছ থেকে, 'অনেক! কোটিখানেক টাকা হলেও অবাক হব না। অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে, খুঁজে বের করার জন্যে।'

ঝট করে ফিরে তাকালাম আমরা। অপরিচিত একটা লোক। হাতে পিস্তল। ধীরপায়ে সরু সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে শুরু করল সে।

কয়লার ঘরের মেঝেতে এসে দাঁড়াল লোকটা।

'কে আপনি?' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে কিশোর, বুঝতে পারছি।

'বললেই কি আর চিনবে?' খড়খড়ে গলায় বলল লোকটা, 'আমার নাম রবিউল। কিন্তু অনেকেই আমাকে দেখতে পারে না, বলে রবিগুণ্ডা। তাতে অবশ্য আমি কিছু মনে করি না, আড়ালে বলে তো। সামনে বলার সাহস কারও নেই।'

'কি চান?'

'সেটা আবার বলে দিতে হবে নাকি?' হাতে করে আনা একটা চটের ব্যাগ ছুঁড়ে দিয়ে বলল রবিগুণ্ডা, 'অনেক করেছ, ছোট্ট আরেকটা কাজ করো, জিনিসগুলো ভরে দাও, নিয়ে বিদেয় হই।'

'তারমানে আপনিই লেগেছিলেন পেছনে। ছবি চুরি করেছেন, খালি বাড়িতে এসে কালুকে মালীর ঘরে ভরে রেখে অনুসন্ধান চালিয়েছেন...'

'কালু কি কুত্তাটার নাম নাকি? ভীষণ পাজি। এখন ও তো ঢুকতেই দেবে না। শেষে মাথায় বাড়ি দিয়ে বেহুঁশ করে ফেলে রেখে আসতে হলো।'

'মতিদাদার গাড়িতেও আপনিই ধাক্কা লাগিয়েছিলেন নাকি?'

খিক খিক করে হাসল রবিগুণ্ডা। 'না, আমি না, আমার এক দোস্ত।'

'ও।' একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল কিশোর। গালে হাত ডলল। তারপর বলল, 'তার মানে একা কাজ করছেন না আপনি। দলে আরও লোক আছে। আপনাদের বস্ কে?'

হাসি হাসি ভাবটা দূর হয়ে গেল রবিগুণ্ডার মুখ থেকে। আচমকা খেঁকিয়ে উঠল, 'এত কথা জিজ্ঞেস করো কেন! যা বলছি, করো, জিনিসগুলো ব্যাগে ভরে দাও গুলি খেতে না চাইলে! জলদি!'

'আচ্ছা আচ্ছা, যাচ্ছি!' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। 'গুলি করবেন না!'

এক ধমকেই কাবু হয়ে গেল! এটা তো তার স্বভাব না। কোন চালাকি করছে না তো? পরস্পরের দিকে তাকালাম আমি আর মুসা।

আড়চোখে দেখলাম, সেফটার কাছে গিয়ে আবার বসে পড়ল কিশোর। লোকটার দিকে পেছন করে। হাঁ হয়ে খুলে থাকা ডালার নিচে হাত ঢুকিয়ে দিযে বের করে আনল চাবিটা, আলগোছে ফেলে দিল বুক পকেটে, লোকটার অলক্ষে। তারপর এক ঝটকায় ডালাটা আবার লাগিয়ে দিয়ে কম্বিনেশনের নব ঘুরিয়ে সব নম্বর দিল এলোমেলো করে।

'অ্যাই, কি করো, কি করো!' বলে চিৎকার করে উঠল লোকটা।

হাত ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'ডালাটা বন্ধ করে দিলাম।'

'খোলো, নইলে গুলি করব!'

পা বাড়াতে গেল মুসা। ঝট করে তার দিকে পিস্তল ঘুরিয়ে ধমক দিল রবিগুণ্ডা, 'খবরদার!'

থেমে গেল মুসা।

কঠিন কণ্ঠে বলল লোকটা, 'এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনব। এর মধ্যে না খুললে

প্রথমে পায়ে গুলি করব, তার পর…' কি করবে পিস্তল নাচিয়ে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল সে।

গুনল, 'এক!'

চুপ করে রইলাম আমরা। কিশোর কি করে দেখছি।

কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে আবার বলল রবিগুপ্তা, 'দুই!'

কিশোর চুপ।

উসখুস করছে মুসা। আমারও অস্থির লাগছে।

ঠিক এই সময় একটা নড়াচড়া লক্ষ করলাম ওপরে। দেখলাম, ঢাকনার কাছে নীরবে এসে দাঁড়িয়েছে কালু। লোকটা তিন গোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘাউ করে একটা হাঁক ছেড়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

নয়

একসঙ্গে ঘটে গেল কয়েকটা ঘটনা। আমাকে ওপর দিকে তাকাতে দেখেই সন্দেহ হওয়ায় রবিগুপ্তাও তাকিয়েছিল। সরে যাওয়ার চেষ্টা করল সে। তাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো কালু, টুঁটি কামড়ে ধরতে পারল না। তবে একেবারে বিফল হলো না তার আক্রমণ। ঝাড়া লেগে হাত থেকে পিস্তলটা উড়ে চলে গেল লোকটার।

এ রকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল মুসা। চোখের পলকে গিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। জাপটে ধরে এক ল্যাঙ মেরে ফেলে দিল মেঝেতে। আমিও চুপ রইলাম না। তুলে নিলাম পিস্তলটা।

আবার গলায় কামড় বসাতে গেল কালু। মার খেয়ে হিংস্র হয়ে উঠেছে, প্রতিশোধ নিতে চাইছে লোকটার ওপর। গলার কলার টেনে তাকে আটকাল কিশোর।

পিস্তলটা আমাদের দখলে চলে আসায় আর কিছু করতে পারল না রবিগুপ্তা। তা ছাড়া একা সে, আমাদের তিনজনের সঙ্গে পারবে না, তার ওপর রয়েছে সাংঘাতিক খেপে যাওয়া একটা কুকুর। আর গোলমাল করল না সে।

তাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা। ছাড়া রাখতে সাহস পাচ্ছি না। তাই একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলার ব্যবস্থা করলাম। এরপর বসলাম আলোচনায়, কি করা যায়?

কিশোর বলল, 'থানা অনেক দূরে। অতটা পথ তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ না। তা ছাড়া একটা লোককে পিছমোড়া করে বেঁধে পিস্তলের মুখে নিয়ে চললে ভিড় করে আসবে লোকে। কেন নিয়ে চলেছি, কি করেছে সে, জিজ্ঞেস করে করে জান অস্থির করে দেবে। বলতে হবে আমাদের। গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছি যে জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। চোর-ডাকাতের তো অভাব নেই। আরও অনেকেই এসে লুট করার চেষ্টা করবে তখন।'

'তাহলে কি করব?' বললাম, 'একে এখানে এভাবেই বেঁধে রেখে যাই। থানায়

গিয়ে পুলিশকে খবর দিই, পুলিশই এসে ধরে নিয়ে যাক।'

'এটাই ভাল,' মুসা বলল। রবিগুণ্ডার দিকে তাকাল সে। হেসে বলল, 'কি মিয়া, থাকতে পারবে না? কালুকে পাহারায় রেখে যাব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখানে পাখি দেখবে। সময়টা খারাপ কাটবে না।'

থানায় এসে দাদার পরিচয় জানিয়ে, আমরা তাঁর কি হই বলে, চোর ধরার খবরটা দিলাম। গাড়ি নিয়ে রওনা হলেন একজন সাব ইন্সপেক্টর। তাঁর নাম ফারুক হোসেন।

কিন্তু সাংঘাতিক একটা চমক অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে। গাছের কাছে এসে দেখলাম, রবিগুণ্ডা পালিয়েছে। কয়েক টুকরো কাটা দড়ি পড়ে আছে গোড়ায়। কালুকে ছেড়ে রেখে গিয়েছিলাম, তাকে এখন বেঁধে রাখা হয়েছে গাছের সঙ্গে। আমাদের দেখেই কেঁউ কেঁউ করে উঠল।

'অপদার্থ কুকুর! মার খায়, ধরা পড়ে, এ একটা কুকুর হলো নাকি! গাধা!' বিরক্ত হয়ে বলল মুসা। 'হত যদি জিনার রাফিয়ান, কিংবা আমাদের চিতা, টের পেত বাছাধন। পালাতে আর হত না। কিন্তু ছুটল কি করে লোকটা?'

গম্ভীর হয়ে কিশোর বলল, 'গিঁটগুলো হয়তো শক্ত করে দাওনি। ভুল হয়ে গেছে। আমাদের একজনের থাকা উচিত ছিল এখানে।'

আমরা যে মিথ্যে বলিনি, বিশ্বাস করলেন সাব-ইন্সপেক্টর। কাটা দড়িগুলো আছে। সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো পিস্তলটা। ওটা তাঁর হাতে তুলে দিলাম আমরা। চোরটাকে ধরার সব রকম চেষ্টা করা হবে—এই আশ্বাস দিয়ে চলে গেলেন তিনি।

আপাতত আর কোন কাজ নেই। খাওয়া-দাওয়া সেরে হাসপাতালে রওনা হলাম আমরা। দাদার খোঁজও নেব, গুপ্তধন পাওয়ার সুখবরটাও তাঁকে জানাব।

'বলো কি!' বিশ্বাসই করতে পারলেন না দাদা। 'সত্যি পেয়েছ! গোয়েন্দা বটে তোমরা! কিন্তু আর ও বাড়িতে ফিরে যাওয়া চলবে না তোমাদের। হোটেলে থাকবে। বলা যায় না, দলবল নিয়ে আবার ফিরে আসতে পারে রবিগুণ্ডা। ক্ষতি করবে তোমাদের।'

'তা পারবে না,' কিশোর বলল। 'সাবধান থাকব। ওর মত গুণ্ডাকে কেয়ার করি না আমরা। এর চেয়ে অনেক বড় বড় চোর-ডাকাতের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে আমাদের। ও কিছু করতে পারবে না। হোটেলে থাকলে গুপ্তধনগুলো পাহারা দেবে কে?'

'পুলিশকে বলোনি ওগুলোর কথা?' অবাক হলেন দাদা।

'না। বলেছি, পিস্তল দেখিয়ে ঘরে ডাকাতি করতে এসেছিল রবিগুণ্ডা। কালুর সাহায্যে আটকে ফেলেছি।'

'ইস্, অ্যাক্সিডেন্ট করার আর সময় পেলাম না। এখন বাড়ি থাকা উচিত ছিল আমাদের।'

'অ্যাক্সিডেন্টটা ইচ্ছে করে ঘটানো হয়েছে, আপনাকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে। রবিগুণ্ডা একা নয়, আরও লোক আছে। আমার বিশ্বাস, দলের নেতা অন্য কেউ। আড়ালে থেকে যে কলকাঠি নাড়ছে। ওরা ভেবেছিল, আপনি হাসপাতালে গেলে দাদীও বাড়ি থাকবে না। তাহলে আমাদেরকেও অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।

এই সুযোগে গুপ্তধনগুলো বের করে নিয়ে যেতে পারবে ওরা। আমরা যে থেকেই যাব, বাগড়া দেব, এটা ভাবেনি।'

'সেই জন্যেই তো ভয়। রাগ করে এখন তোমাদের ওপর শোধ তোলার চেষ্টা করবে। অ্যাক্সিডেন্টে আমি মরেও যেতে পারতাম। কেয়ার করেনি ওরা। তারমানে তোমাদের খুন করতেও হাত কাঁপবে না ওদের। তাই বলছি...'

'বলাবলির কিছু নেই,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর, 'আমরা ও বাড়িতেই ফিরে যাব। দেখাই যাক না, ওদের কতখানি দৌড়। গিয়েই জিনিসগুলো নিরাপদ কোথাও সরিয়ে ফেলব। আগের জায়গায় রাখা ঠিক হবে না।'

'কোথায় সরাবে?'

'দেখি গিয়ে। জায়গা একটা পেয়েই যাব। এতবড় বাড়িতে লুকানোর জায়গার অভাব হবে না।'

আক্কেল আলীকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম আমরা। দেখি, গাছেই বাঁধা রয়েছে কালু। আমরা বেরোনোর সময় ওকে ছেড়ে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের দেখে কুঁই কুঁই শুরু করল।

রাগ করে মুসা বলল, 'ঠিক হয়েছে! তোর মত একটা অপদার্থ গর্দভের ওরকম শাস্তিই হওয়া উচিত। গলায় দড়ি বেঁধে থাকতে কেমন লাগল?'

গুপ্তধনগুলো দেখার জন্যে ভেতরে ভেতরে তড়পাচ্ছে আক্কেল আলী। বাড়ি এসে আর থাকতে পারল না। বলল, 'চলুন না, জিনিসগুলো দেখি।'

তাকে নিয়ে কয়লা রাখার ঘরে ঢুকলাম আমরা। ঢুকেই চক্ষু স্থির। আয়রন সেফের ঢাকনা হাঁ হয়ে খুলে আছে। ভেতরে নেই জিনিসগুলো।

তাড়াতাড়ি গিয়ে হুমড়ি খেয়ে বসে পরীক্ষা করতে লাগল কিশোর। মুখ না তুলেই বলল, 'কোন ধরনের এক্সপ্লোসিভ দিয়ে তালা ভেঙে খোলা হয়েছে!'

'তারমানে অহেতুকই এত কষ্ট করলাম আমরা!' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'গেল জিনিসগুলো! আর পাওয়া যাবে না!'

বাতাসে বারুদের কড়া গন্ধ। নাক উঁচু করে শুঁকতে শুঁকতে কিশোর বলল, 'বেশিক্ষণ হয়নি গেছে।'

'তাতে কি? ধরা তো আর যাবে না।'

'তবু এখুনি গিয়ে পুলিশকে জানানো দরকার।'

থানায় গিয়ে সেই সাব ইন্সপেক্টরকে পাওয়া গেল—ফারুক হোসেন, তাঁর ডিউটি শেষ হয়নি। এইবার সব কথা, অর্থাৎ গুপ্তধনের কথাটাও খুলে বলতে হলো। মৃদু অনুযোগ করলেন তিনি, তখন জিনিসগুলোর কথা তাঁকে না জানানোয়। তাহলে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারতেন। ভুল যে হয়ে গেছে, স্বীকার করতেই হলো আমাদের।

ওয়্যারলেসে আশপাশের সমস্ত ফাঁড়িতে খবরটা জানিয়ে দিলেন তিনি। রেলস্টেশন, বাস স্টেশন আর যেদিকে যে-ক'টা মহাসড়ক বেরিয়ে গেছে, সবগুলোতে কড়া পাহারার ব্যবস্থা হলো। রবিগুণ্ডার চেহারার বর্ণনা দিয়ে দেয়া হলো। ওরকম চেহারার লোকের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে পুলিশ।

দু-জন কনস্টেবলকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে সরেজমিনে তদন্ত করে দেখে

গেলেন সাব ইন্সপেক্টর। বললেন, চোরটার কোন খবর পেলে আমাদের জানানো হবে।

আক্কেল আলী হাসপাতালে গিয়ে দাদাকে খবরটা জানানোর কথা বলল। কিশোর রাজি হলো না। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে সুখবর দেয়া যায়, কিন্তু দুঃসংবাদ জানানোটা উচিত নয়।

দশ

এরপর কয়েক দিন কেটে গেল। আর কোন ঘটনা ঘটল না। জমিদার বাড়িতে আছি আমরা। খাইদাই, ঘুরে বেড়াই আর গুপ্তধনগুলো পেয়েও হাতছাড়া হয়ে গেল বলে দুঃখ করি। ওগুলো উদ্ধারের আর কোন ব্যবস্থা করতে পারিনি।

দাদার অবস্থা ভাল হয়ে আসছে। পায়ের হাড় জোড়া লাগতে আরও দেরি হবে। তবে সে-জন্যে হাসপাতালে আর থাকার প্রয়োজন পড়বে না। শুনলাম, শীঘ্রি তাঁকে ছেড়ে দেয়া হবে।

রবিগুপ্তা ধরা পড়েনি। তার কোন হদিসই করতে পারেনি পুলিশ। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন সে।

'আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে ওকে,' একদিন বলল কিশোর।

'কি করে?' মুসার প্রশ্ন। 'কোন সূত্র নেই আমাদের হাতে। কোথায় খুঁজব? পুলিশই যেখানে বিফল হয়েছে, আমরা কি করতে পারি?'

'তা জানি না। তবে কিছু একটা করা দরকার!'

কোন ব্যাপারেই সহজে নিরাশ হওয়া কিশোরের ধাতে নেই।

যাই হোক, সূত্রটা হঠাৎ করেই পেয়ে গেলাম। কিংবা বলা যায় সূত্রের মালিককেই পাওয়া হয়ে গেল। সেদিন হাটের দিন। দুপুরের পর আক্কেল আলী বলল, হাটে যাবে। আমরাও রওনা হলাম তার সঙ্গে।

বিরাট হাট বসেছে ময়নামতি বাজারের আশপাশ জুড়ে। ঘুরে ঘুরে সওদা করতে শুরু করল আক্কেল আলী। সব পাওয়া যাচ্ছে এখানে—মাছ, তরিতরকারি, ডিম, নানা রকম ফল। খুবই ভাল লাগত আমাদের, কিন্তু মজা অনেকখানি নষ্ট করে দিল আমাদের প্রতি মানুষের অস্বাভাবিক কৌতূহল। বিদেশী দেখলেই বোধহয় এ রকম করে ওরা। দল বেঁধে শুধু যে ছোট ছেলেরা পেছনে লাগল, তা নয়, অনেক বড় মানুষও আমাদের পিছে পিছে ঘুরতে লাগল। কোথায় যাই, কি করি, দেখে। শেষে ধমক দিয়ে ওদের সরাতে হলো আক্কেল আলীকে। তা-ও কি আর পুরোপুরি সরে। কয়েকটা ছেলে লেগেই রইল, এমন ভাবভঙ্গি ওদের, আমরা যেন চিড়িয়াখানার জীব, কিংবা ভিনগ্রহ থেকে নেমেছি।

এক জায়গায় গরম গরম জিলিপি ভাজা হচ্ছে দেখে লোভ সামলাতে পারল না মুসা, খেতে বসে গেল। আমি আর কিশোরও বসলাম। লোকের কৌতূহলী নজর আমাদের দিকে, মুহূর্তের জন্যেও যেন সরাতে ইচ্ছে করছে না ওদের। আড়ষ্ট বোধ

করতে লাগলাম আমি। তবে মুসা ওসব কেয়ার করল না। কুড়মুড় করে খেয়েই চলল। দেখতে দেখতে সাবাড় করে দিল কেজিখানেক।

হঠাৎ এক চানাচুরওয়ালার ওপর চোখ পড়ল আমাদের। রঙিন বিচিত্র পোশাক পরনে, মাথায় লম্বা চোখা টুপি, মুখে চোঙ। সেটাতে ফুঁ দিয়ে বোঁ বোঁ আওয়াজ করছে, অদ্ভুত ভঙ্গিতে কথা বলছে। যেন সার্কাসের সঙ। তার চোখও আমাদের ওপর। আমরা তাকাতেই দ্বিধা করল, চোখ নামিয়ে নিল, তারপর সরে চলে গেল আরেক দিকে।

'লোকটাকে চেনা চেনা লাগল না?' লোকটার পেছনটা দেখা যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।

'কিসের চেনা,' জিলিপির আমেজে রয়েছে এখনও মুসা। পাশের দোকানে কদমা বিক্রি হচ্ছে। কদমার স্তূপের দিকে খেয়াল এখন তার। 'এখানে ওরকম সাজ সেজেই চানাচুর বিক্রি করে তো, পোশাকের জন্যে সবাইকেই এক রকম দেখা যায়।'

আমি সেটা মানতে পারলাম না। লোকটাকে পরিচিত মনে হয়েছে আমারও। নিচু গলায় বললাম, 'রবিগুণ্ডা নয় তো? ছদ্মবেশে আছে?'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। আমিও এগোলাম তার সঙ্গে।

চানাচুর কেনার ছুতোয় লোকটাকে ভালমত দেখলাম আমরা। চুল কেটে, গোঁফ কামিয়ে, মুখে রঙ মেখে অনেক পরিববর্তন করে ফেলেছে চেহারার, কিন্তু কিশোরের তীক্ষ্ণ চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না।

সরে এসে ফিসফিস করে আমাকে বলল সে, 'রবিগুণ্ডাই, কোন সন্দেহ নেই!'

'কি করব? পুলিশকে খবর দেব?'

'না, চোখ রাখতে হবে। বাজারের পর সে কোথায় যায় দেখব।'

আক্কেল আলীকে লাগিয়ে রাখলাম তার পেছনে। আমরা লাগলে সন্দেহ করবে। সে ছদ্মবেশে থাকা সত্ত্বেও আমরা যখন তাকে চিনেছি, আমাদেরকেও নিশ্চয় চিনে ফেলেছে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। বড় বড় কুপি বাতি জ্বেলে নিতে লাগল দোকানিরা, বাইরে যারা বসেছে। তবে আর বেশিক্ষণ চলল না হাট। ভেঙে গেল দ্রুত। বাজার থেকে বেরিয়ে একটা পায়েচলা মেঠোপথ ধরে রওনা হলো চানাচুরওলা। পিছু নিল আক্কেল আলী। তার সঙ্গে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে অনুসরণ করলাম আমরা তিনজন।

শুরুতে পিছু নেয়াটা খুব একটা কঠিন হলো না, কারণ হাটফেরতা প্রচুর লোক চলেছে, তাদের সঙ্গে মিশে গেলাম আমরা। আকাশে চাঁদ আছে বটে, তবে চার-পাঁচদিনের। আলো যা আছে তাতে রাস্তা দেখা যায়, কিন্তু কয়েক গজ দূর থেকেও মানুষ চেনা যায় না। চানাচুরওলাকে চেনা যাচ্ছে তার বিচিত্র পোশাকের জন্যে, বিশেষ করে মাথার চূড়াওয়ালা টুপিটাই তার অস্তিত্ব ফাঁস করে দিচ্ছে।

এক জায়গায় এসে দু-ভাগ হয়ে গেছে রাস্তাটা। মূল পথটা চলে গেছে গাঁয়ের দিকে, লোকজন সব সে-দিকে চলে গেল। রবি চলল অন্য পথটা ধরে নদীর দিকে। ভাগ্যিস এখানে চষা খেত আর নেই, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়েছে পথ, নইলে

আমাদেরকে দেখে ফেলত সে। মাথা নুইয়ে ঝোপঝাড়ে গা ঢেকে নিঃশব্দে এগোলাম আমরা।

বেশ কাছে থেকেই তাকে অনুসরণ করে চলেছে আক্কেল আলী। কাজটায় ভয় যেমন লাগছে তার, মজাও পাচ্ছে। চমৎকার রোমাঞ্চ বোধ করেছে—তার অনুভূতির কথা পরে সব বলেছে আমাদের।

হঠাৎ কি যেন ভেবে পেছন ফিরে তাকাল চোরটা। ঝট করে একটা ঝোপের পাশে বসে পড়ল আক্কেল আলী। তাকে আর দেখল না রবিগুণ্ডা।

এ কোথায় চলেছে সে?—অবাক হয়ে ভাবল আক্কেল আলী। ভাব দেখে তো মনে হচ্ছে নদীর পাড়ের শ্মশানের দিকে চলেছে। সর্বনাশ! লোকটার কি ভয়ডর বলে কিছু নেই? ওখানেই তো আছে ভয়ঙ্কর এক কালী মন্দির, পারতপক্ষে ওদিকে ঘেঁষে না লোকে। এমনকি গরু চরাতেও যায় না রাখালরা। নেহায়েত বাধ্য হলে কোন কারণে দিনের বেলায়ও লোকে ওটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দোয়া-দরূদ পড়ে বুকে ফুঁ দিতে দিতে যায়।

বিশাল এক নারকেল-সুপারির বাগানে ঢুকে গেছে পথটা। বাগানটার দুই পাশে বিরাট জঙ্গল। আম-কাঁঠাল-জাম ছাড়াও আরও নানা রকম গাছ আছে, মাঝে মাঝে বাঁশঝাড়। ভয়ানক জায়গা।

আক্কেল আলীকে অবাক করে দিয়ে একেবারে ওই কালী মন্দিরের সামনেই গিয়ে দাঁড়াল রবিগুণ্ডা। আরেক বার পেছনে তাকিয়ে দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল কেউ পিছু নিয়েছে কিনা। কাউকে না দেখে ভাবল, নেয়নি। সে-জন্যেই চোঙাটা নামিয়ে রেখে পকেট থেকে মোম আর দেশলাই বের করে ধরাল। আলো হাতে ঢুকে পড়ল মন্দিরের ভেতর।

পিছিয়ে এল আক্কেল আলী। ভয় পেয়েছে সে। দুই হাতে বাজারের ব্যাগ নিয়ে আরেকটু হলেই পড়েছিল আমাদের গায়ের ওপর।

'কি হলো?' জানতে চাইল কিশোর।

'কা-কা-ক্কালী মন্দিরে ঢুকল লোকটা!'

'তাতে কি?'

'বুঝতে পারছেন না? কাছেই শ্মশান, মড়া পোড়ানো হয়। আর ওই মন্দিরে কালীদেবীর পূজা হয়। বছরে একবার। বাকি সময়টায় খালিই পড়ে থাকে। লোকে বলে, ওই শ্মশানের যত ভূতের আড্ডা ওই মন্দিরে।'

'খাইছে!' আক্কেল আলীর চেয়ে বেশি ভয় পেয়ে গেল মুসা। 'আমি যাই!'

ঘুরতে গেল সে। খপ করে তার হাত চেপে ধরল কিশোর। 'দাঁড়াও! রবিগুণ্ডাকে যখন ভূতে কিছু করে না, আমাদেরও করবে না। চলো, দেখি।'

আগে আগে চলল কিশোর। তার পেছনে আমি। আমাদের পেছনে ভয়ে ভয়ে আসতে লাগল মুসা আর আক্কেল আলী।

মন্দিরের ভাঙা দরজা দিয়ে ভেতরের মোমের আলো দেখতে পেলাম। গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে রইলাম আমরা।

ফিসফিস করে কিশোর বলল, 'এখানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে গুপ্তধনগুলো। বেরও করতে পারছে না পুলিশের ভয়ে, নিয়ে পালাতেও পারছে না।

নিতে পারলে এতদিনে পালিয়ে যেত। পুলিশকে ফাঁকি দেয়ার জন্যেই চানাচুরওয়ালার ছদ্মবেশে থাকতে হচ্ছে।'

'কিন্তু এই ব্যাটা এখানে থাকে কি করে!' সাংঘাতিক অবাক লাগছে মুসার, 'এই ভূতের আড্ডায়!'

'তার মানেই তো বোঝা যাচ্ছে ভূতফুত কিছু নেই এখানে। কেউ আসেও না, নিরাপদ ভেবেছে জায়গাটা।'

'কি করব এখন আমরা?' জিজ্ঞেস করলাম। 'লোকটাকে ধরার চেষ্টা করব?'

'না। ভয়ানক লোক সে। আরও পিস্তল থাকতে পারে তার কাছে। গুলি খেতে যাওয়ার মানে হয় না। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক, তুমি আর আমি এখানে থাকি, মুসা আর আক্কেল আলী গিয়ে পুলিশকে খবর দিক। এখানে থেকে চোরটার ওপর নজর রাখব আমরা। আর তাকে পালাতে দেয়া যাবে না।'

এগারো

মুসা আর আক্কেল আলী চলে গেল।

চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। একে তো জঙ্গল, তার ওপর শ্মশান, ভূতে বিশ্বাস না থাকলেও গা ছমছম করতে লাগল আমার। পরিবেশটা খারাপ। সেটাকে আরও ঘোরাল করে তোলার জন্যেই যেন পেঁচা ডেকে উঠছে কর্কশ স্বরে, শোনা যাচ্ছে শেয়ালের হুক্কাহুয়া। কি করছে প্রাণীগুলো? নদীর ধারে কাঁকড়া খুঁজছে, না মড়ার তালাশে আছে?

কিশোর বলল, শ্মশ[illegible]ড়া থাকে না। এমন করে পুরো শরীরটাকে পুড়িয়ে ফেলা হয়, ছাই ছাড়া আর[illegible]ছুই থাকে না। কাঁকড়া খুঁজতেই গেছে শেয়ালগুলো।

এ সব আলোচনাও এখন ভয় ধরাচ্ছে মনে। মুসারা আসে না কেন? মনে হতে লাগল, অনন্তকাল ধরে অনুপস্থিত ওরা।

অথচ বেশি সময় কিন্তু লাগল না ওদের। রবিগুপ্তার ব্যাপারে সতর্ক হয়েই আছে পুলিশ। খবর শুনে একটা মুহূর্তও আর দেরি করলেন না সাব ইন্সপেক্টর ফারুক হোসেন। দলবল নিয়ে হাজির হয়ে গেলেন। গাড়ির শব্দ শুনলে সাবধান হয়ে গিয়ে পালানোর চেষ্টা করতে পারে চোরটা, সে-জন্যে খেতের কিনারে গাড়ি রেখে এতদূর হেঁটে এসেছেন।

সামান্যতম বাধা দিতে পারল না রবিগুপ্তা, কল্পনাই করেনি তার পিছু নিয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছি আমরা। ও বোধহয় ভেবেছিল, আমরা তাকে চিনতে পারিনি।

তাকে নিয়ে যাওয়ার সময় কিশোর অনুরোধ করল ফারুক সাহেবকে, 'স্যার, নিয়ে গিয়ে তো নিশ্চয় কথা আদায়ের চেষ্টা করবেন। কি বলল না বলল আমাদের জানাবেন?'

'নিশ্চয় জানাব। পুলিশকে অনেক সাহায্য করেছ তোমরা। ধন্যবাদ। এক

কাজ কোরো, কাল সকালে চলে এসো। আমার ডিউটি থাকবে তখন।'

সুতরাং পরদিন সকালে উঠেই থানায় গিয়ে হাজির হলাম আমরা।

আমাদের বসতে দিলেন ফারুক সাহেব। চা-বিস্কুট আনালেন। কোন খবর আছে কিনা জানতে চাইল কিশোর।

মাথা নাড়লেন তিনি। 'মহাপাজী। স্বীকার কি আর করে। অনেক চেষ্টা করেছি। একটা কথাই স্বীকার করেছে, পিস্তলটা তার, ওটা দেখিয়ে তোমাদের হুমকি দিয়েছে—না করে পারেনি, তার কারণ পিস্তলে তার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। কিন্তু গুপ্তধনের কথা কিছুই বলেনি সে। সেফের তালা ভেঙে সে নাকি নেয়নি।'

'মন্দিরের ভেতরটা ভালমত খুঁজে দেখা দরকার ছিল,' কিশোর বলল।

হাসলেন সাব ইন্সপেক্টর। 'দেখিনি মনে করেছ? আজ ভোরে উঠেই দু-জন লোক পাঠিয়েছি। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে সব। কিচ্ছু পায়নি।'

হতাশ হলাম।

আমাদের মুখ দেখে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বললেন তিনি, 'ধরা যখন পড়েছে, স্বীকার ওকে করতেই হবে। সরকার সাহেবকে বোলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওগুলো বের করে তাঁকে ফেরত দেয়ার চেষ্টা করব।'

হাসপাতালে দাদার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম আমরা। সব জানালাম তাঁকে, আর কিছু গোপন করলাম না। দাদা-দাদী দু-জনেই খুব বকলেন আমাদের, ওসব ভয়ঙ্কর চোর-ডাকাতের সঙ্গে লাগতে গিয়েছি বলে। শেষে দাদা বললেন, 'খবরদার, ওসবের মধ্যে আর যাবিনে। পুলিশ কিছু করতে পারে ভাল, না পারে নেই, টাকা লাগবে না আমার। তোদের যে কোন ক্ষতি হয়নি এতেই আমি খুশি।'

কিন্তু আমরা খুশি হতে পারলাম না। এত কষ্ট করে জিনিসগুলো উদ্ধার করলাম আমরা, আর সেটা কেড়ে নিয়ে যাবে একটা ছিঁচকে চোর, কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না।

কিশোর তো আরও পারল না। বাড়ি ফিরেই তার প্রথম কথা হলো, 'দাদুরা আসবেন পরশুদিন। তার আগেই বের করতে হবে গুপ্তধনগুলো।'

'কি করে?' জানতে চাইল মুসা।

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই কালী মন্দিরের কাছেই কোথাও আছে ওগুলো। ওখানে থেকেছে রবিগুণ্ডা, জিনিসগুলো দূরে কোথাও রাখবে না। চোখে চোখে রাখতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক।'

সুতরাং সেদিন দুপুরের খাওয়ার পর আবার গেলাম আমরা শ্মশানে। দিনের বেলা অতটা ভয় লাগে না জায়গাটাকে। তবে মানুষজনের আনাগোনা মোটেও নেই। পাখির ছড়াছড়ি। এত ঘুঘু দেখা গেল, এয়ারগানটা কেন নিয়ে এল না, সে-জন্যে আফসোসের সীমা রইল না মুসার।

মন্দিরের কাছে এসে আশপাশের বনের ওপর চোখ বোলাল মুসা। 'কোথায় থাকতে পারে, বলো তো?'

'আছে এখানেই কোথাও,' জবাব দিল কিশোর। 'মন্দিরের ভেতরে নেই, তাহলে পেয়ে যেত পুলিশ। তারমানে বাইরে রেখেছে। মাটিতে পুঁতেও রাখতে

পারে।'

'তাহলে বের করতে বুলডোজার লাগবে…' আচমকা থেমে গেল মুসা। কান পাতল। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'এই, মন্দিরের ভেতর লোক আছে! কথা শুনলাম!'

মুসার কানের ওপর ভরসা আছে আমাদের। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়লাম ঝোপের ভেতর।

চুপ করে বসে রইলাম পুরো একটা মিনিট। তারপর উঠে দাঁড়াল মুসা, 'তোমরা থাকো এখানে। আমি দেখে আসি।'

পা টিপে টিপে মন্দিরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। কান পেতে শুনল কয়েক মিনিট। ফিরে এসে বলল, 'দু-জন লোক। গুপ্তধন খুঁজতে এসেছে। রবিগুণ্ডার দলের। সে নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ওদের সঙ্গে। শফিক সাহেব বলে একজন লোকের কথা বলছে, ওই লোক ওদের বস্। ভয়ানক খেপে গেছে নাকি সে। রবিউলকে ধরতে পারলে চামড়া ছাড়াত, পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে বলে রক্ষা।'

আরও কয়েক মিনিট পর খালিহাতে বেরিয়ে এল লোকগুলো। খুব রেগেছে, চেহারা দেখেই আন্দাজ করা যায়। একজনের রোমশ শরীর, মুখটা শিম্পাঞ্জীর মত। আরেকজন রোগা-পটকা, খাটো। মুখে বসন্তের দাগ। পান-খাওয়া কালো দাঁত। মুখটা ছুঁচোর মত।

'অহেতুক এখানে সময় নষ্ট করছি, মাইনকা,' গরিলা বলল। 'রইব্বা হারামজাদাটা যে এত্তবড় শয়তান জানতাম না!'

'জানাজানি বাদ দিয়ে আরও খোঁজ,' ছুঁচো, অর্থাৎ মানিক বলল। 'খালিহাতে গেলে যত ঝাল আমাদের ওপর ঝাড়বে শফিক সাহেব।'

'আমরা কি করব, না পেলে?'

'রইব্বাটা আমাদেরও ফাঁসিয়ে দিয়ে গেল। খালিহাতে গেলে শফিক সাহেব ভাববে, আমরাও মিছে কথা বলছি। বেঈমানী করছি,' ক্ষোভের সঙ্গে বলল মানিক।

মন্দিরের বাইরেও খুঁজতে শুরু করল ওরা। দেখছে, কোনখানে মাটি খোঁড়া হয়েছে কিনা। মন্দিরের দেয়ালের ফাঁকফোকরও বাদ দিল না। যেখানেই কোন জিনিস লুকানোর মত জায়গা দেখছে, তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কিংবা উঁকি দিয়ে দেখছে। কথা বলছে। বেশির ভাগই রবিগুণ্ডাকে গালাগাল, আর নিজেদের ভাগ্যকে দোষারোপ। শিম্পাঞ্জীর মত লোকটার নামও জানতে পারলাম, বদু।

খুঁজতে খুঁজতে আমাদের কাছাকাছি চলে এল দু-জনে। ঠিক এই সময় মুসার পেল হাঁচি। কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না, হ্যাঁচচো করে উঠল প্রচণ্ড জোরে।

বারো

দৌড়ে এল দুই চোর।

ঝোপ থেকে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে বের করল আমাদের। চিনে ফেলল। নিশ্চয়

রবিগুপ্তার কাছে আমাদের কথা শুনেছে। বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগল, কেন এখানে এসেছি।

রোমাঞ্চকর এক গল্প ফেঁদে বসল কিশোর, বদুটাকে প্রায় বিশ্বাসও করিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু মানিককে ফাঁকি দেয়া গেল না। সে বলল, 'ওসব ধানাই-পানাই করে লাভ নেই। তোমরাই গুপ্তধনগুলো খুঁজে বের করেছ, শুনেছি। একবার যখন পেরেছ, আবারও পারবে। আর সেগুলো খুঁজতেই এসেছ তোমরা। ভালই হলো। খোঁজো, বের করে দাও। ছেড়ে দেব।'

কি আর করা? কিশোর বলল, 'মন্দিরের ভেতর থেকে শুরু করব।'

'ওখানে কি দেখবে?' বদু বলল। 'পুলিশ দেখেছে। আমরাও দেখেছি। কিছুই নেই।'

'তবু দেখব। বলা যায় না, আপনাদের চোখ এড়িয়েও গিয়ে থাকতে পারে।'

আমার মনে হলো, ফাঁকি দিতে চাইছে কিশোর। খামোকাই এখানে ওখানে খুঁজবে, কিছু না পেলে শেষে বিরক্ত হয়ে আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে লোকগুলো; তারপর গিয়ে আসল জায়গায় খুঁজব আমরা—এমন কিছু হয়তো ভাবছে সে।

কি যেন ভাবল মানিক। দ্বিধা করল একবার। তারপর বলল, 'বেশ, খোঁজো। এসো।'

আমাদের সঙ্গে আবার মন্দিরে ঢুকল ওরাও।

ভেতরটা আবছা অন্ধকার। কেমন একটা ধোঁয়াটে গন্ধ। মাকড়সার জাল ঝুলছে যেখানে সেখানে। একধারে বেদীতে কালীমূর্তি। লাল জিভ বের করা, গলায় মাটির তৈরি নরমুণ্ডের মালা। একহাতে খাঁড়া। ভয়ানক চেহারা।

মুসা তো দেখে আঁতকেই উঠল।

গুপ্তধন লুকানোর মত জায়গা তেমন নেই। এককোণে পড়ে আছে চানাচুরওয়ালার পুরানো টিনের বাক্স আর চোঙটা। বাক্সটায় তেল চিটচিটে ময়লা একটা কাপড় বাঁধা, গলায় ঝোলানোর জন্যে। বাক্সের ওপরে ছড়ানো গোল বারান্দামত জায়গাটায় অনেকগুলো খুপরি, তাতে তেল-মশলার শিশি। খোপে খোপে ডাল ভাজা, বাদাম ভাজা, পেঁয়াজ-মরিচ, আর চানাচুর বানানোর অন্যান্য উপকরণ সাজিয়ে রাখা।

অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম আমরা সবাই মিলে। মূর্তির পেছন দিকটা ভাঙা, ভেতরের খড়গুলো টেনে টেনে বের করা হয়েছে।

কিশোর জানতে চাইল, 'কে বের করেছে এগুলো? আপনারা?'

'না,' মাথা নাড়ল মানিক। 'আমার মনে হয়, প্রথমে এর মধ্যেই জিনিসগুলো লুকিয়েছিল রইব্বা, তারপর বের করে আবার অন্য কোথাও রেখেছে।'

ভাঙা ফোকরটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। চিন্তিত মনে হলো তাকে। কোমরে ঝোলানো টর্চ খুলে নিয়ে মূর্তির ভেতরে আলো ফেলে ফাঁপা জায়গাটা দেখল। আরও কিছু খড় বাদে আর কিছুই নেই ভেতরে।

মন্দিরের ভেতরে পাওয়া গেল না জিনিসগুলো।

গজগজ করতে লাগল বদু, 'বলেছি না নেই, শুধু শুধু সময় নষ্ট!'

বিরক্ত হয়ে ধমক দিল মানিক, 'আহ্, থাম তো তুই! ওদের কাজ ওদেরকে করতে দে!'

বাইরে এসে আবার খোঁজা হলো। মন্দিরের চারপাশে বেশ অনেকখানি জায়গার মাটি পরীক্ষা করা হলো। কোথাও নতুন খোঁড়া কোন গর্ত পাওয়া গেল না। গাছের কোটরও বাদ দেয়া হলো না। কিন্তু কোথায় যে গুপ্তধনগুলো লুকিয়েছে রবিগুপ্তা, তার কোন হসিদই পাওয়া গেল না।

নিতান্ত নিরাশ হয়েই আমাদের ছেড়ে দিল দুই চোর। শাসিয়ে দিল, ওদের পিছু নেয়ার চেষ্টা করলে ভাল হবে না।

হাঁটতে লাগল ওরা। একটাই রাস্তা। সুতরাং ওদের পিছু নেয়া ছাড়া উপায় থাকল না আমাদের। ওরাও জানে, কিছুদূর এগিয়ে দুটো রাস্তা দু-দিকে চলে গেছে। তাই আমরা পিছে পিছে হাঁটায় কিছু বলল না।

কথা বলতে বলতে চলেছে বদু আর মানিক, আমাদের আগে আগে। দ্রুত হাঁটছে ওরা। ফিরেও তাকাল না আমাদের দিকে। নারকেল বাগানের বাইরে বেরিয়ে ওরা চলে গেল একপথে, আমরা আরেক পথে।

খেত পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠতে উঠতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। গাঁয়ের মসজিদ থেকে আজান শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরল কিশোর। 'দাঁড়াও! বাড়ি যাব না আমরা!'

'তাহলে কোথায় যাবে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'গুপ্তধনগুলো আনতে!'

'খাইছে! বলো কি?' মুসাও আমার মতই অবাক হয়েছে। 'জানো নাকি কোথায় আছে ওগুলো? তাহলে বের করলে না যে?'

'বের করলেই তো নিয়ে যেত ওই দুই চোর।'

'কোথায় আছে?' জানতে চাইলাম আমি।

'চলো, গেলেই দেখবে।'

আকাশে চাঁদ আছে। পথ দেখে চলতে অসুবিধে হলো না। আবার এসে ঢুকলাম নারকেল বাগানে। সোজা মন্দিরের দিকে এগোল কিশোর। টর্চ আছে তার কাছে। কোমর থেকে খুলে নিয়ে জ্বালল।

আমাদের নিয়ে আবার মন্দিরে ঢুকল সে। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'বলো তো, কোথায় থাকতে পারে?'

সাফ মানা করে দিল মুসা, 'জানি না! হাজার বছর একনাগাড়ে ভাবলেও আন্দাজ করতে পারব না!'

'বেশ, সূত্র দিচ্ছি, দেখো বুঝতে পারো কিনা। ধরো, অনেক দামী কিছু জিনিস আছে তোমার কাছে। ওগুলো সবচেয়ে বেশি নিরাপদ কোন জায়গায় থাকলে? এমন কোথাও, যেখানে রাখলে তোমার অজান্তে কেউ খুঁজে পাবে না, তোমাকে না জানিয়ে নিতে পারবে না কিছুতেই...'

'সঙ্গে সঙ্গে রাখলে,' বললাম।

'ঠিক।' তুড়ি বাজাল কিশোর। 'রবিগুপ্তার পকেটে ছিল না জিনিসগুলো। তাহলে কোথায়...'

প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, 'চানাচুরের বাক্স!'

হেসে মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'হ্যাঁ। চলো, বের করে নিই।'

বাক্সের ওপরের ডালাটা আলগা। সেটা সরাতেই দেখা গেল বাক্সটা কানায় কানায় ভরা ডালভাজা আর বাদামভাজায়। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল কিশোর। বের করে আনল পানপাত্রটা। বলল, 'আর দেখার দরকার আছে? সব আছে এর মধ্যে।'

'কিশোর, তুমি একটা জিনিয়াস!' না বলে পারল না মুসা।

'নাও, চানাচুরওয়ালা সাজো এখন,' হেসে মুসাকে বলল কিশোর। 'বাক্সটা গলায় ঝোলাও। রাত হয়েছে অনেক, বাড়ি যেতে হবে।'

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তখনও কাটেনি। মন্দিরের দরজায় বেরোতেই দেখলাম দুই পাশে দুই প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে দুই চোর।

আমাদের দেখেই খিকখিক করে হেসে বলে উঠল মানিক, 'কি বদু, বলেছিলাম না, ছেলেগুলো বোকা নয়। ওরা ঠিক বুঝেছে কোথায় আছে মাল। আমাদের চেয়ে অনেক চালাক। তুই তো বিশ্বাসই করতে চাস না। ফিরে না এলে কি হত, ভাব।'

'রইব্বাটাও কম চালাক না,' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলল বদু। 'অমন একটা চানাচুরের বাক্সের মধ্যে রেখে দেবে, কে ভাবতে পেরেছিল! আমরা তো আমরা, পুলিশই ধোঁকা খেয়েছে···কিন্তু এ তিনটেকে এখন কি করি?'

'কি আর করব। আটকে রেখে যাব মন্দিরের মধ্যে। মালগুলো দরকার ছিল আমাদের, পেয়েছি, ব্যস। যাওয়ার আগে একটা ধন্যবাদও দিয়ে যাব ওদের। আমাদের অনেক ঝামেলা বাঁচিয়ে দিল বলে।' আবার খিকখিক করে হাসল মানিক। পকেট থেকে বের করল বড় একটা ছুরি। ফলা ধরে টানতেই কিটকিট শব্দ করে খুলে গেল ওটা। ঝিক করে উঠল চাঁদের আলোয়।

হাত বাড়াল সে, 'দাও, এবার বাক্সটা দিয়ে দাও দেখি। গোলমাল করলে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব।'

এই গুপ্তধন নিয়ে অনেক ঝামেলা সহ্য করেছি আমরা। বার বার উদ্ধার করছি, শেষ মুহূর্তে কেউ না কেউ এসে ছিনিয়ে নিচ্ছে। আর হাতছাড়া করতে রাজি নই আমরা কেউই।

কিশোর চুপ।

মুসাও চুপ। বাক্সটা দেয়ার কোন লক্ষণ দেখাল না।

'দাও বলছি!' ধমক দিয়ে বলল মানিক।

চুপ করে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বদু। আমরা কেউ গোলমাল করলেই হাত তুলবে, ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে।

কিশোরের দিকে একবার তাকিয়ে আস্তে করে গলা থেকে বাক্স ঝোলানোর কাপড়টা খুলে নিল মুসা। এক পা বাড়াল মানিকের দিকে, ওটা দেয়ার ভঙ্গিতে।

ছুরিটা বাঁ হাতে নিয়ে মানিকও হাত বাড়াল।

কাপড়টা দুই হাতে চেপে ধরে মানিকের মাথা সই করে আচমকা ঘুরিয়ে বাড়ি মারল মুসা। প্রচুর জিনিসপত্র বোঝাই থাকায় ভারি হয়ে আছে বাক্স। ডাল, বাদাম, তেল-মরিচ-পেঁয়াজ সব ঝরে পড়ল বৃষ্টির মত। প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে ডালাটা খুলে উড়ে গিয়ে পড়ল কয়েক হাত দূরে।

মাথার একপাশে বাড়ি লেগেছে মানিকের। উহ্ করে মাথা চেপে ধরে বসে পড়ল সে। ছুরিটা ছেড়ে দিয়েছে হাত থেকে। কিশোরের টর্চের আলোয় পলকের জন্যে দেখলাম, মানিকের আঙুলের ফাঁকে রক্ত।

বাক্সের কাপড়টা হাত থেকে ছেড়ে দিল মুসা। মাটিতে পড়ে ঝনঝন করে উঠল বাক্স। তাকালও না সে। প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়ে মাটি থেকে তুলে নিল মানিকের ছুরিটা।

নড়ে উঠল বদু। ঠেকানোর জন্যে এগিয়ে এল। ধরতে চাইল মুসাকে।

কিন্তু ততক্ষণে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ছুরি চালাল বদুর হাত সই করে। এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল তালু।

'মাগ্লোহ্!' বলে চিৎকার করে উঠল বদু।

বিমূঢ় হয়ে গেছে দু-জনেই। মুসা যে এই কাণ্ড করে বসবে কল্পনাই করতে পারেনি। ওরা ভেবেছিল, তিনজনেই আমরা ছেলেমানুষ, ছুরি দেখিয়ে ধমক দিলেই পেসাব করে দেব।

এত দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা, আমি বা কিশোরও স্তব্ধ হয়ে রইলাম একটা মুহূর্ত।

হাত বাড়াচ্ছে মানিক, মুসাকে ধরার জন্যে নয়, বাক্সটার দিকে।

আর একটা সেকেন্ডও দেরি করলাম না আমি। নিচু হয়ে এক থাবায় কাপড়টা ধরে হ্যাঁচকা টানে বাক্সটা তুলে নিয়েই দৌড় দিলাম বনের দিকে।

'ধরো! ধরো!' বলে চিৎকার করে উঠল মানিক।

পেছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম আলো নিভিয়ে দিয়েছে কিশোর। মুসাকে সাহায্য করতে হাত লাগিয়েছে।

কোন দিকে তাকালাম না। সোজা দৌড় দিলাম অন্ধকার বনের মধ্যে দিয়ে। আশা করলাম, পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পাব—বদু কিংবা মানিক, কোন একজন আমাকে তাড়া করে আসবেই।

কিন্তু এল না ওরা। মুসা আর কিশোর আটকে রেখেছে নিশ্চয় ওদের।

একটা ঘন ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। বাক্সটা দু-হাতে ধরে বসে বসে হাঁপাতে লাগলাম। কান খাড়া রেখেছি কেউ আসে কিনা শোনার জন্যে। প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি, যা হয় হবে, গুপ্তধনগুলো আর চোরের হাতে পড়তে দেব না।

লড়াইয়ের শব্দ কানে আসছে। এখনও মুসা আর কিশোরকে পরাজিত করতে পারেনি দুই চোর। সহজে পারবে বলেও মনে হয় না।

আমি ঠিক করলাম, পারুক আর না পারুক, আমি এই ঝোপ থেকে বেরোচ্ছি না।

এই সময় হঠাৎ করেই কানে এল কুকুরের ডাক। এগিয়ে আসছে।

রাতের বেলা এই জঙ্গলের মধ্যে গাঁয়ের নেড়িকুত্তাগুলোরও একলা আসার কথা নয়। তারমানে সঙ্গে লোক আছে। কে?

ধক্ করে উঠল বুক! আক্কেল আলী না তো! আসার সময় তাকে বলে এসেছিলাম, মন্দিরে যাচ্ছি আমরা। আমাদের দেরি দেখে হয়তো কালুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

আমার অনুমান যে ঠিক, খানিক পরেই বুঝতে পারলাম।

'বাবাগো, খেয়ে ফেলল গো!' বলে চিৎকার করতে করতে ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে এল একজন লোক। পেছনে ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করেছে একটা কুকুর।

আমার ঝোপের সামনে দিয়েই ছুটে গেল লোকটা। পায়ের কাছে লেগে রয়েছে কুকুরটা। দু-জনকেই চিনতে পারলাম—বদু আর কালু। অতবড় লোকটা যে কুকুরকে এ রকম ভয় পায়, না দেখলে বিশ্বাস হবে না। পড়িমরি করে নদীর দিকে চলে গেল সে। পেছনে কালু। হঠাৎ করেই যেন দুঃসাহসী হয়ে পড়েছে কাপুরুষ কুকুরটা।

হাসি পেল আমার। কিন্তু শব্দ শুনে ফেলার ভয়ে চেপে গেলাম।

আরেকটু পর আমার আর কালুর নাম ধরে ডাক শোনা গেল। মুসা ডাকছে আমাকে, আর আক্কেল আলী কালুকে।

ফিরে এল কুকুরটা। আমার ঝোপের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। নাক উঁচু করে কুঁই কুঁই করতে লাগল। তারপর ছোট্ট একটা হাঁক ছাড়ল, 'খেঁক!'

বুঝলাম আমার অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে গেছে। হেসে বললাম, 'দাঁড়া, বেরোচ্ছি।'

কালুর পেছন পেছন চললাম। অন্ধকারে বনের মধ্যে পথ হারিয়েছি, বুঝতে পারলাম। কুকুরটার সাহায্য না পেলে এখন পথ চিনে মন্দিরের কাছে যাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত।

গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে টর্চের আলো দেখা গেল। আমাকেই খুঁজতে আসছে কিশোররা।

আমাকে দেখেই বলে উঠল কিশোর, 'এই যে, আছ ঠিকঠাক? জিনিসগুলো আছে?'

'আছে,' জবাব দিলাম।

শুনলাম, আমি দৌড় দেয়ার পর মানিক আমার পিছু নিতে যাচ্ছিল, টর্চ দিয়ে তার মাথায় বাড়ি মারে কিশোর। দুই দুইবার বাড়ি খেয়ে কাহিল হয়ে পড়ে মানিক। বদুর সঙ্গে লড়তে থাকে মুসা। এই সময় আমাদের খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির হয় আক্কেল আলী। কুকুরকে সাংঘাতিক ভয় পায় বদু, দেখেই মারে দৌড়। তাকে তাড়া করে কালু। তিনজনের সঙ্গে পারবে না বুঝে মানিকও আর দাঁড়ায়নি, পিঠটান দিয়েছে।

বাড়ি রওনা হলাম আমরা। সাবধান থাকলাম, যাতে রাস্তায় আর কোন আচমকা আক্রমণের শিকার না হতে হয়।

বড় রাস্তায় উঠে কিশোর বলল, 'জিনিসগুলো বাড়ি নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় রাখবে?'

'থানায় চলো।'

ওই অবস্থায় আমাদের দেখে অবাক হয়ে গেলেন ফাঁড়ির ডিউটি অফিসার। আমাদের পরিচয় দিয়ে সব কথা তাঁকে বললাম। জিজ্ঞেস করলাম, ফারুক সাহেব কোথায়। তিনি জানালেন, বাইরে একটা জরুরী তদন্তের কাজে গেছেন, চলে আসবেন শীঘ্রি।

আমরা বসলাম।

আধঘণ্টা পরেই চলে এলেন ফারুক হোসেন। আমাদের অত রাতে ওই অবস্থায় দেখে তিনিও অবাক। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার?'

সব শুনে তিনি বললেন, 'সাংঘাতিক কাণ্ড করে এসেছ! পুলিশ যা পারেনি সেটাই করে বসে আছ! তোমরা যে এতবড় গোয়েন্দা, কল্পনাই করতে পারিনি!'

ডিউটি অফিসারও আমাদের অনেক প্রশংসা করলেন। দু-জন পুলিশ অফিসারের এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় লজ্জাই লাগতে লাগল আমার।

কিশোর বলল ফারুক সাহেবকে, 'স্যার, জিনিসগুলো বাড়ি নিয়ে যেতে ভরসা পাচ্ছি না। এত রাতে তো ব্যাংক খোলা পাব না, নিরাপদ আর কোন জায়গার কথাও জানা নেই। থানায় রেখে যেতে চাই।'

একমুহূর্ত চিন্তা করে নিলেন সাব ইন্সপেক্টর। তারপর মাথা ঝাঁকালেন, 'বেশ, রেখে যাও। রিসিট দিয়ে দিচ্ছি। যখন ইচ্ছে নিয়ে যেয়ো।'

তেরো

রাতটা নিরাপদে কাটল। পরদিন সকালে আক্কেল আলীর সঙ্গে হাসপাতালে রওনা হলাম।

গিয়েই শুনলাম, দাদাকে রিলিজ করে দেয়া হবে সেদিনই।

আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের কথা জানালাম দাদা-দাদীকে। আমরা ছুরি-মারামারি করেছি, এ কথা শুনে দাদী তো বাকহারাই হয়ে গেলেন। দাদা দিলেন বকা। আমাদের ওভাবে মন্দিরে যেতে দিয়েছে বলে আক্কেল আলীকেও বকতে লাগলেন।

চুপ করে রইলাম। বকে বকুক, আমাদের কাজ তো সারা।

দাদা-দাদীকে হাসপাতাল থেকে নিয়েই সেদিন বাড়ি ফিরলাম আমরা।

গুপ্তধনগুলো ফাঁড়িতেই রইল। কিশোরের ধারণা, এখনও বাড়িতে আনা নিরাপদ নয়। তবে চানাচুরের বাক্সটা নিয়ে এসেছে। অকারণে কিছু করে না সে। জিজ্ঞেস করলাম কেন এনেছে।

সে বলল, 'এটা এমন জায়গায় রেখে দেব যাতে বাড়িতে ঢুকলে সহজেই চোখে পড়ে। কেউ খুঁজতে এলে দেখে ফেলে। আমার বিশ্বাস, ওই দুই চোর আবার আসবে জিনিসগুলোর খোঁজে। ওদের বস্ ওদেরকে ছাড়বে না, পাঠাবেই।'

মুসা জানতে চাইল, 'তাহলে এরপর আমাদের কাজ কি?'

'বাক্সের টোপটা রেখে দিলাম,' কিশোর বলল, 'দেখা যাক ফাঁদে ধরা দেয় কিনা। দিলে বদু আর মানিককেও পাকড়াও করব। তারপর পুলিশে ধরে ভালমত ধোলাই দিলেই সুড়সুড় করে বলে দেবে বসের নাম। পালের গোদাটাকেও ধরতে পারবে তখন পুলিশ। এখন থেকে আমাদের কাজ হবে, নজর রাখা। বাড়ির কাছাকাছি অচেনা কাউকে দেখলেই চোখ রাখব।'

একটা কথা কয়েক দিন ধরেই মনে হচ্ছে আমার, জিজ্ঞেস করার কথা ভুলে

যাই, এখন করলাম, 'কিশোর, দাদার অ্যাক্সিডেন্টের পর ওই ভদ্রলোককে কিন্তু আর একবারও দেখিনি।'

'আমিও ভেবেছি কথাটা। চলো দাদাকে জিজ্ঞেস করে দেখি, হাসপাতালে দেখা করেছে কিনা।'

দাদা জানালেন, একদিন দেখা করতে গেছে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। বাড়ি কেনার ব্যাপারে আর তেমন আগ্রহ দেখায়নি। বরং বার বার গুপ্তধনের কথা জানতে চেয়েছে।

তার নাম কি জানতে চাইল কিশোর।

দাদা জানালেন, শফিকুর রহমান।

সন্দেহটা পাকাপোক্ত হলো আমাদের, ওই লোকই চোরেদের বস্। কারণ, সেদিন মানিক আর বদু আলোচনা করার সময়ও শফিক সাহেব নামটা বলেছিল।

আম-জাম-লিচু-কাঁঠাল খাই আমরা, রাতে আর দুপুরে খাই দাদীর চমৎকার রান্না, সকালে নানা রকম পিঠা। বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াই, রাতে কখনও বসি দীঘির ঘাটে, অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করি, কখনও গিয়ে বসি মজা পুকুরের পাড়ের সেই ঘরটার বারান্দায়।

উড়ে যাচ্ছে যেন আমাদের দিনগুলো। কিন্তু যাদের জন্যে উৎসুক হয়ে থাকি রোজই বিকেলের পর থেকে, তাদের আর সাড়াশব্দ নেই। তিন দিন গিয়ে যখন চারদিন পড়ল, সন্দেহ হতে লাগল আমার, আর আসবে না।

তবে সেদিনই এল ওরা। কিংবা বলা যায় সেই রাতে। জানানটা দিল কালু। দীঘির ঘাটলায় বসে আছি আমরা তিনজন। দাদা-দাদী বেডরুমে চলে গেছেন। আক্কেল আলী গেছে তার ঘরে। গল্প করছি, এই সময় একটা আমগাছের নিচ থেকে চাপা গরগর করে উঠল কুকুরটা।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। চাপা কণ্ঠে বলল, 'এসে গেছে!'

আগেই প্ল্যান করে রেখেছি আমরা, ওরা এলে কি করব। গাছপালার আড়ালে গা ঢেকে মুসা আর কিশোর এগিয়ে গেল কালুর দিকে। আমি গেলাম মালীর ঘরের দিকে, আক্কেল আলীকে ডাকতে।

ঘুমায়নি সে। আগে থেকেই জানা ছিল তারও, এ রকম জরুরী অবস্থা হতে পারে। একবার ডাকতেই দরজা খুলে উঁকি দিল, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কি?'

'মনে হয় এসে গেছে। বেরোও।'

নিঃশব্দে বেরিয়ে এল সে। পা টিপে টিপে আমরাও এগোলাম কিশোররা যেদিকে গেছে সেদিকে।

একটা আম গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে কিশোর আর মুসা। কালুর গলার বেল্ট ধরে রেখেছে মুসা, শান্ত থাকতে বলছে কুকুরটাকে। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছে কালু, চুপ করেই আছে। গাছের গায়ে গা মিশিয়ে দাঁড়ালাম আমরা।

চাঁদের আলোয় দু-টো ছায়ামূর্তিকে বেরোতে দেখলাম গাছের ছায়া থেকে। চেহারা বোঝা না গেলেও আকৃতিতেই চিনলাম বদু আর মানিককে।

বাড়ির সদর দরজার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল

ওরা।

আমরাও চুপ। কালুকে নিয়েই ভয়, কখন চিৎকার করে ওঠে।

কেউ জেগে নেই বাড়ির ভেতর, বোধহয় এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই অবশেষে বদুকে রেখে পা বাড়াল মানিক। সদর দরজার দিকে এগোল।

নড়ে উঠল মুসাও। আগেই আন্দাজ করে রেখেছে কিশোর, ওরা এলে কোনপথে কোথায় ঢুকবে। চানাচুরের বাক্সটা কয়লার ঘরে রেখে দিয়েছে সে। তার ধারণা, চোরগুলো ওই জায়গাটাতেই খুঁজবে আগে।

কালুর বেল্টটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গাছের আড়ালে আড়ালে দ্রুত এগোল মুসা, অদৃশ্য হয়ে গেল। বাড়ির পেছন দিকের একটা জানালা খোলা রেখে দিয়েছি আমরা এ রকম জরুরী মুহূর্তের কথা ভেবেই। সেদিক দিয়ে ঘরে ঢুকে যাবে সে।

সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মানিক। পাকা চোর সে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভেতর থেকে বন্ধ করে রাখা দরজাটা খুলে ফেলল। ফিরে তাকাল একবার। লুকিয়ে থাকা বদুর উদ্দেশে হাত নাড়ল, তারপর ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে।

অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। মুসার কাজটা সহজ। জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকবে, রান্নাঘরে লুকিয়ে থাকবে মানিকের অপেক্ষায়। সে কয়লার ঘরে নেমে গেলেই ওপরের ঢাকনাটা নামিয়ে তালা লাগিয়ে দেবে।

অস্থির হয়ে উঠেছে কালু। আর চুপ থাকতে চাইছে না। রাফি কিংবা চিতার মত ট্রেনিং পাওয়া শিক্ষিত কুকুর নয় সে, অতি সাধারণ নেড়ি কুত্তা। এতক্ষণ যে কথা শুনেছে এইই বেশি। হয়তো আরও শুনত, কিন্তু ভজকট করে দিল একটা শেয়াল। ঝোপের ভেতর থেকে মাথা বের করল হঠাৎ। আমরা না দেখলেও কালু দেখে ফেলল। আর যায় কোথায়। চুপ থাকার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

মশায় কামড়াচ্ছে। চুলকাতে গিয়ে সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম, ঢিল পড়ল কুকুরটার গলার কলারে, এক ঝটকায় আমার হাত থেকে সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে শেয়ালকে তাড়া করার জন্যে লাফ মারল সে।

কিন্তু শেয়াল কি আর দাঁড়ায়। কুকুরের ডাক শুনেই পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল আবার ঝোপের মধ্যে।

বদু ভাবল, তাকে দেখেই খেপে গেছে কুকুরটা। 'বাবাগো, খেয়ে ফেলল গো!' বলেই ঘুরে মারল দৌড়। কালুর নজর সরে গেল শেয়ালের দিক থেকে। বদুকেও দু-চোখে দেখতে পারে না সে। শেয়ালের চেয়ে তাকে তাড়া করাটাই ভাল মনে করল বোধহয়, বদুর পায়ের গোছায় কামড়ে দেয়ার লোভেই যেন ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে গেল তার পেছনে।

ক্ষণিকের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম আমরা। আমাদের প্ল্যান মত ঘটল না সব কিছু। সবার আগে সামলে নিল কিশোর। চিৎকার করে বলল, 'তুমি আর আক্কেল আলী বদুকে ধরো, আমি মুসার কাছে যাচ্ছি!'

কালুর পেছনে দৌড় দিলাম আমি।

একটা শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিয়ে আমার পেছন পেছন এল আক্কেল আলী।

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটছে বদু। কিন্তু যত জোরেই ছুটুক, কুকুরের সঙ্গে পাল্লায় পারার কথা নয়। বুঝতে পারল, ধরা পড়ে যাবে সে। থামল না তবু। কিন্তু কপাল খারাপ তার। একটা শেকড়ে পা বেধে উড়ে গিয়ে পড়ল ধুড়ুস করে।

তার গায়ের ওপর উঠে পড়ল কালু। কামড়ানোর জন্যে জায়গা বাছাই করছে যেন।

'বাবাগো, আমি শেষ!' বলে চিৎকার করে এলোপাতাড়ি ঘুসি মারতে লাগল বদু। একটা লাগল কালুর নাকেমুখে। ওটাও আরেক ভীতু। ব্যথা লাগতেই কেঁউ করে লাফিয়ে নেমে গেল বদুর ওপর থেকে। ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগল। আবার কামড়াতে যাওয়ার সাহস সঞ্চয় করছে।

সুযোগটা কাজে লাগাল বদু। আমরা তার কাছে পৌঁছার আগেই লাফিয়ে উঠে আবার দিল দৌড়।

ঘেউ ঘেউ করে আবার তার পিছু নিল কালু।

কোন দিকে যাচ্ছে হুঁশ নেই বদুর। সামনে যে জলাভূমি সে খেয়াল করল না। বরং আরেকটু এগিয়ে সামনে পানি চিকচিক করতে দেখে কুকুরের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সোজা নেমে গেল সেটাতে। ছোপ ছোপ করে কাদা-পানি ভেঙে এগোতে লাগল।

কিন্তু কয়েক কদমের বেশি যেতে পারল না। হঠাৎ দেখলাম হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ডুবে গেছে। পা যতই তোলার চেষ্টা করছে, আরও দেবে যাচ্ছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। মরে যাওয়ার ভয়ে বিকট চিৎকার করে উঠল।

জলাভূমির কিনারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল কালু। আমরাও এসে দাঁড়ালাম। তাকে বাঁচানোর জন্যে আমাদেরকে অনুরোধ করতে লাগল বদু।

কয়েক মিনিট পর সেখানে এসে হাজির হলো মুসা আর কিশোর। বদুর দুরবস্থা দেখে হেসেই অস্থির মুসা। ওরা কি করেছে জিজ্ঞেস করলাম আমি। কিশোর জানাল, মানিককে নিয়ে গণ্ডগোল হয়নি। কয়লার ঘরে তালা দিয়ে রেখে এসেছে।

ডালটা নিয়ে কাদায় নেমে গেল মুসা। তার একটা হাত শক্ত করে ধরে রাখলাম আমি আর কিশোর। ডালটা বদুর দিকে বাড়িয়ে দিল মুসা। চেপে ধরতে বলল।

ধরল বদু।

মুসা বলল, 'এইবার আস্তে আস্তে উঠে এসো। তাড়াহুড়ো করলে কিন্তু ডাল ছেড়ে দেব।'

সামান্যতম গোলমাল করল না বদু। যা নির্দেশ দেয়া হলো, নীরবে পালন করল।

তাকে তুলে আনলাম কাদা থেকে।

মুসার হাত থেকে ডালটা নিয়ে লাঠির মত বাগিয়ে ধরল আক্কেল আলী। বদুকে হুমকি দিল, তেড়িবেড়ি করলেই দেবে মাথায় বসিয়ে।

তবে আর কিছু করল না বদু। এক কালুর ভয়েই সে কাবু হয়ে আছে। বাকি চারজনের সঙ্গে মারপিটের ঝুঁকি নিতে চাইল না।

বদুকেও এনে কয়লার ঘরে ভরলাম আমরা।

চেঁচামেচিতে দাদা-দাদীও জেগে গেছেন। দাদী দেখতে এলেন কি হয়েছে।

সেই রাতেই আক্কেল আলীকে পুলিশের কাছে পাঠানো হলো, দুই চোরকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

পরদিন সকালে নাস্তা খেতে বসেছি। দাদাও বসেছেন আমাদের সঙ্গে। দাদী গরম গরম ভাপা পিঠে এনে দিচ্ছেন রান্নাঘর থেকে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই উঠে পড়ল গুপ্তধন উদ্ধারের আলোচনা।

মুসা বলল, 'একটা কথা বুঝতে পারছি না, এতদিন বসে রইল কেন রবিউল। চানাচুরওলার ছদ্মবেশে সহজেই তো পালিয়ে যেতে পারত।'

জবাব দিল কিশোর, 'আমার ধারণা, প্রথমে এই বুদ্ধি মাথায় আসেনি তার। কিংবা পালানোর সাহসই হয়নি। জিনিসগুলো নিয়ে গিয়ে মূর্তির মধ্যে ভরে রাখল। দুই শত্রু তখন তার। একদিকে পুলিশ, আরেক দিকে তার দলের লোক—তাদের সঙ্গেও বেঈমানী করেছে। ফলে লুকিয়ে থাকতে হলো তাকে মন্দিরের মধ্যে। কিন্তু নিরাপদ বোধ করল না ওখানে। যে কোন সময় ধরা পড়ে যেতে পারে। শেষে চানাচুরওলা সেজে বুঝতে চাইল, ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে কিনা। বাজারে গেল সেটা বোঝার জন্যে। আরও একটা কারণে গিয়েছিল সে, পুলিশ আর তার দলের লোকের ব্যাপারে খোঁজখবর করার জন্যে...'

'কিন্তু বাদ সাধলে তোমরা,' হেসে কথাটা শেষ করে দিলেন দাদা। 'একেবারে সময়মত গিয়ে হাজির হলে বাজারে। চিনে ফেললে তাকে। পালাতে যে পারবে না সে, প্রমাণ পেয়ে গেল হাতেনাতে।'

'হ্যাঁ, ব্যাটার কপালটাই খারাপ,' হেসে মন্তব্য করল মুসা।

চুপচাপ খাওয়া চলল কিছুক্ষণ। একটা প্রশ্ন নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি, জবাব খুঁজে পাচ্ছিলাম না—শফিকুর রহমান গুপ্তধনগুলোর লোভেই বাড়িটা কিনতে চায়নি তো? আর তাই যদি হয়ে থাকে, সে শিওর হলো কি ভাবে যে এই বাড়িতেই রয়েছে জিনিসগুলো, বের করে নিয়ে যেতে পারেনি আমিন উদ্দিন সরকারের মুন্সী?

প্রশ্নটা তুললাম।

দাদা বললেন, 'এর একটাই জবাব হতে পারে, কথাটা কোনভাবে মুন্সীদের কারও মুখেই জেনেছে শফিকুর রহমান। আমার কি সন্দেহ হচ্ছে জানো? এই শফিকুর রহমান মধু মুন্সীর ছেলে।'

'ছেলে!' প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম আমরা তিনজন।

'হ্যাঁ। তার একটা ছেলে ছিল বলে শুনেছি। বাবার কাছে নিশ্চয় গুপ্তধনের কথা শুনেছে সে। বিদেশে চলে গিয়েছিল বলে এতদিন আসতে পারেনি। দেশে ফিরেই বাড়িটা কিনতে এসেছে।'

'বিদেশে গিয়েছিল কি করে জানলেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'শফিকুর রহমান নাকি অনেক দিন দেশের বাইরে ছিল, আমাকে বলেছে। তোমাদের বয়েসে জাহাজে চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিল, ফিরেছে এই কিছুদিন আগে। সে যে মধু মুন্সীর ছেলে, এটা আমার অনুমান। আগে কিছু সন্দেহ করিনি,

এখন করছি।'

খাওয়ার পর থানায় রওনা হলাম আমরা। ফারুক হোসেনকে পাওয়া গেল। তাঁকে বললাম শফিকুর রহমানের ব্যাপারটা। তিনি জানালেন, বদু মুখ খুলেছে। বলেছে, শফিক সাহেব নামে এক লোকই ওদের বস্, গুপ্তধনগুলো চুরি করার জন্যে টাকা দিয়েছিল ওদের।

আমাদের মুখ থেকে সব কথা শুনে আরও শিওর হলেন তিনি। শফিকুর রহমানের কাছে যাবেন বললেন।

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে গুপ্তধনগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম আমরা।

মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন দাদা-দাদী।

গর্বের সঙ্গে দাদা বললেন দাদীকে, 'দেখেছ, কি জিনিস! পানপাত্রটা দেখো, কি সুন্দর কারুকাজ করা। আর পাথর কি! আজকাল এসব জিনিস কল্পনাই করা যায় না।'

'সুন্দর,' স্বীকার করলেন দাদী, 'তবে কল্পনা করা যায় না কথাটা ঠিক না। টাকা খরচ করলে এখনও এমন বানানো যাবে।'

'দূর, কি যে বলো তুমি, সেই কারিগরই নেই।' চমৎকার একটা হার তুলে নিয়ে দাদীকে দিয়ে বললেন দাদা, 'নাও, এটা তোমাকে দিয়ে দিলাম। পরো।'

সলজ্জ হাসি হেসে দাদী বললেন, 'তোমার মাথায় দোষ পড়েছে! এই বুড়ো বয়েসে এ হার পরে আমি কি করব!' বললেন বটে, কিন্তু হারটা নিয়ে পরে ফেললেন।

হাসলেন দাদা। বললেন, 'দারুণ মানিয়েছে।' আমাদেরকে সাক্ষি মানলেন, 'কি বলিস, মানিয়েছে না?'

'সাংঘাতিক!' আমার আগেই বলে উঠল মুসা।

কিশোর বলল, 'এক কাজ করব, দাঁড়াও, তোমার পা-টা ভাল হয়ে গেলে তোমাদের বিবাহ বার্ষিকী পালন করব আমরা...'

'কিন্তু তার তো অনেক দেরি আছে,' দাদা বললেন।

'তাতে কি? আমাদের খাতিরে আগামই নাহয় করে ফেললে। বাসর ঘর সাজিয়ে দেব তোমাদের।'

কৃত্রিম মুখ ঝামটা দিয়ে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন দাদী, এই সময় হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল আক্কেল আলী। ভীষণ উত্তেজিত। বলল, 'হুজুর, একটা সাংঘাতিক খবর আছে! নন্দী পাড়ার সাহেব মিয়া এসেছে। আমাদের যে জমিগুলো নদীতে ডুবে গিয়েছিল বহুকাল আগে, আবার নাকি ভাসছে। চর জেগেছে, হুজুর, চর জেগেছে!'

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন দাদা। তারপর বিড়বিড় করলেন, 'সরকারদের সৌভাগ্য! শুরু হয়ে গেল আবার!' আক্কেল আলীর দিকে মুখ তুলে বললেন, 'জাগবেই, জাগতেই হবে! আবার আমাদের সব হবে! আসল জিনিসই ফিরে এসেছে যে!' জিনিসগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

আনন্দে দাদীর চোখে পানি এসে গেছে। প্রচণ্ড আবেগ সইতে না পেরে উঠে এসে আমার কপালে চুমু খেয়ে মাথাটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরলেন নীরবে।

একে একে মুসা আর কিশোরকেও চুমু খেলেন। তারপর বললেন, 'সরকার বাড়ির সৌভাগ্য ওই সোনার জিনিস নয়, আমার এই তিনটি রত্ন। ওরা ঘরে এসেছে বলেই না ভাগ্য ফিরতে শুরু করেছে আমার, বুঝতে পারছি সোনাদানায় আবার ভরে উঠবে এই বাড়ি!'

জমিদার-দাদার বাড়িতে এরপর মহাআনন্দে কাটতে লাগল আমাদের দিন।

নতুন কিছু আর বলার নেই।

ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা জানার জন্যে নিশ্চয় কৌতূহল হচ্ছে তোমাদের; শফিকুর রহমান মধু মুন্সীর ছেলে—দাদার এই অনুমানটা সত্যি কিনা প্রমাণ করা গেল না, কারণ ধরা গেল না তাকে। পুলিশ তার ঠিকানায় খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে, ঘরের তালা বন্ধ। বাড়িওয়ালা জানাল, আগের রাতে নাকি তড়িঘড়ি করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেছে লোকটা। বলে গেছে, আর আসবে না। দামী গাড়িটাও নাকি তার নিজের ছিল না, ভাড়া, রেন্ট-অ্যা-কার কোম্পানি থেকে নিয়েছিল।

তবে যাই হোক, শফিকুর রহমান ধরা পড়ুক আর না পড়ুক, বিপদ কেটে গেছে। দাদা-দাদীর মুখে হাসি ফুটাতে পেরে আমরা খুব খুশি। নিশ্চয়ই তোমরাও খুশি?

*****

স্বর্গদ্বীপ

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

উজ্জ্বল নিওন আলোয় লেখা 'ওয়েলকাম টু নর্থ ক্যারোলিনা' সাইনটা যখন চোখে পড়ল ওদের, মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে তখন।

'খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে আমার,' ঘোষণা করল মুসা। দুই হাত স্টিয়ারিঙে। চোখ সামনের রাস্তায় নিবদ্ধ। 'না খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়লে জিনার কোন উপকার করতে পারব না।'

ম্যাপ দেখে রবিন জানাল, 'সামনে আর মাইল দশেক গেলেই খাবার পাওয়া যাবে।'

'দারুণ!' বলল উচ্ছ্বসিত মুসা। 'সারাদিনের মধ্যে সবচেয়ে ভাল খবরটা দিলে। গাড়িটারও পেট্রল দরকার। আমাদেরও পেট্রল দরকার।'

'ক'টা বাজে?' হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল কিশোর। দু'হাত টান টান করে ছড়িয়ে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল।

'নাস্তার সময় হয়ে গেছে,' মুসা জানাল। 'ঘুমিয়ে গেছিলে তো, তাই জানো না। তোমাদের দু'জনকেই একটা সংবাদ দিই। ভার্জিনিয়া থেকেই আমাদের অনুসরণ করে আসছে একটা ট্রাক।'

'নাম্বার দেখেছ?' সতর্ক হয়ে উঠল কিশোর। মুহূর্তে ঘুম উধাও হয়ে গেল চোখ থেকে।

'না,' রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল মুসা। 'বেশি দূরে। দেখা যাচ্ছে না।'

মাথাটা সামান্য উঁচু করে সাবধানে তাকাল পেছনে বসা রবিন। 'আমিও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হতে পারে আমাদের মতই সে-ও ফ্লোরিডা থেকেই আসছে। কাকতালীয় ব্যাপার।'

'উঁহু,' মুসা মানতে চাইল না। 'আমি গতি বাড়ালেই সে-ও বাড়ায়, কমালে কমায়। অনুসরণ যদি না করে থাকে, তাহলে কি খেলছে আমাদের সঙ্গে?'

এক্সিট র‍্যাম্পের শেষ মাথায় এসে একটা গ্যাস স্টেশনে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল মুসা। পাম্পের লাগোয়া একটা বড় রেস্টুরেন্ট। খামারবাড়ির মত চেহারা। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে তেল ভরতে লাগল কিশোর। মুসা আর রবিন নজর রাখল রাস্তার দিকে।

'ওই যে,' মুসা বলল।

গ্যাস স্টেশনের পাশ দিয়ে দ্রুত সরে গেল ট্রাকটা। উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল ওটাকে।

'লোক তো মনে হলো দু'জন, তাই না?' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'কিন্তু গতি তো কমাল না একবিন্দু। তারমানে

আমারই ভুল ছিল। আমাদের অনুসরণ করেনি ওরা।'

তেল ভরা শেষ করে রেস্টুরেন্টের সামনে এনে গাড়িটা রাখল ওরা। তারপর রেস্টুরেন্টে ঢুকল। একটা টেবিল বেছে নিয়ে বসে পড়ল। রাত দুটো বাজে। কিন্তু এখনও টিন-এজ ওয়েইট্রেসের মুখের হাসি মলিন হয়নি। হাসিমুখে স্বাগত জানাল ওদের। কথায় দক্ষিণাঞ্চলীয় টান। একটা করে মেন্যু তুলে দিল প্রত্যেকের হাতে।

'ডিনার পাওয়া যাবে এত রাতে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'যাবে,' হাসিটা উজ্জ্বল হলো আরও। 'দিনে-রাতে যখন খুশি যে কোন খাবার চাও, দিতে পারব আমরা।'

'তাই নাকি!' খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার।

খাবারের অর্ডার দেয়া হলো। এনে দিল ওয়েইট্রেস। নীরবে খেয়ে চলল ওরা। রাত জেগে, একটানা গাড়িতে বসে থেকে ক্লান্ত। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। খাওয়া শেষ করে বিল দিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল।

'ভাবছি,' গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বলল কিশোর, 'আমাদের ট্রাকের বন্ধুরা না এসে হাজির হয় আবার এখন।'

'চলেই তো গেল,' জবাব দিল রবিন। 'আর আসবে কি?'

সে আর মুসা আগে আগে হাঁটছে।

'খাইছে!' বলে হঠাৎ গুঙিয়ে উঠল মুসা।

দু'জনে তাকিয়ে আছে ভ্যানটার দিকে।

কি দেখে থমকাল ওরা, পেছনে থাকায় বুঝতে পারল না প্রথমে কিশোর। তারপর লক্ষ করল, স্বাভাবিকের তুলনায় নিচু হয়ে আছে গাড়িটার ছাত। এর কারণ, চার চাকার রিমের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এখন ওটা। চারটে টায়ারই কেটে ফালা ফালা করে দেয়া হয়েছে।

কাটা রবারগুলোর দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল মুসা। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'এরজন্যে পস্তাতে হবে ওদের!'

'পস্তানো তো পরে,' কিশোর বলল। 'আগে ওদের নাগাল তো পেতে হবে। তার জন্যে গাড়িটা সচল করা দরকার। রাস্তার ধারে চব্বিশ ঘণ্টা খোলা চাকা মেরামতের দোকান দেখেছি। দেখি, চারটে টায়ারের জন্যে কি পরিমাণ খসায় পকেট থেকে।'

'চার নয়, পাঁচটা,' শুধরে দিল মুসা। 'বাড়তি চাকাটাও খতম করে দিয়ে গেছে। ওই দেখো।' ভ্যানের পেছনে দরজার ফ্রেমে আটকে রাখা চাকাটা দেখাল সে। 'কিন্তু কে করল শয়তানিটা?'

'রাত দুপুরে রসিকতা করতে আসেনি কেউ,' কিশোর বলল। 'ইচ্ছে করে করেছে। ভয় দেখিয়ে আমাদের রকি বীচে ফেরত পাঠানোর জন্যে।'

'সামান্য কয়খান চাকা কেটে আমাদের ফেরত পাঠাবে?' ভুরু নাচাল রবিন। 'জিনাকে না নিয়ে ফেরত যাচ্ছি না আমরা, এটা ওদের বুঝিয়ে দেয়া দরকার।'

'সময় হলে আপনি বুঝবে,' কিশোর বলল।

শ'তিনেক ডলার আর পঁয়তাল্লিশটা মিনিট গচ্চা দিয়ে আবার এসে রাস্তায় নামল ওরা। ভোর রাতের নীরবতা। ঘুমন্ত পরিবেশ। কিন্তু ওদের চোখে ঘুম

নেই।

'কখন যে গিয়ে পৌঁছাতে পারব,' নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করল মুসা।

ম্যাপ দেখে বলল রবিন, 'আরও তিনশো মাইল গেলে পাওয়া যাবে ফ্লোরিডার সীমান্ত।'

'তারপর? ফ্লোরিডা থেকে গাল আইল্যান্ড?'

'আজ রাত ন'টা-দশটা নাগাদ পৌঁছে যাব,' রবিন বলল। 'বর্ণনা পড়ে মনে হচ্ছে দারুণ হবে জায়গাটা। গাল আইল্যান্ড, লোকসংখ্যা পাঁচশো সাঁইত্রিশ,' গাড়িটা যেখান থেকে ভাড়া নিয়েছে, তারা একটা ছোট বই দিয়েছে। তথ্যগুলো লেখা আছে তাতে। 'ফ্লোরিডার দক্ষিণ পশ্চিম উপকূল থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ, সারাসোটা আর নেপল্‌সের মাঝামাঝি। বোটে করে যাওয়া যায়, আবার গাড়ি নিয়েও যাওয়া যায়। গাড়িতে করে যেতে হলে সীভিউ থেকে ফ্ল্যামিঙ্গো পাসের ভেতর দিয়ে আইল্যান্ড কজওয়ে পেরিয়ে যেতে হবে। দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে চমৎকার একটা সাদা বালির সৈকত আছে...'

বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'দেখো তো, ওয়াইল্ড পাম মোটেলটার কথা লেখা আছে নাকি?'

'আছে,' ট্র্যাভেল বুকের পাতা উল্টে দেখে বলল রবিন। 'দ্বীপের উত্তর প্রান্তে। বলছে প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর ওখানকার। থাকার জন্যে বিশটা আধুনিক কটেজ আছে, এয়ারকন্ডিশনার আর টিভি সহ। সৈকতের কাছে। মার্কেটিং সুবিধা আর নাইটলাইফ সহ।'

'এই নাইটলাইফটা কি জিনিস?' মুসার প্রশ্ন।

'বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল রবিন। 'গেলেই বোঝা যাবে। তবে রাতের বিনোদনের কথাই বলেছে হয়তো, সেটারই নাম দিয়েছে নাইটলাইফ।'

পাক্কা তিরিশটা ঘণ্টা রাস্তায় কাটিয়ে অবশেষে সরু আইল্যান্ড কজওয়েতে গাড়ি ঢোকাল মুসা।

'নাইটলাইফের তো কিছুই দেখছি না,' চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলল কিশোর।

'ওই যে নাইটলাইফ,' হাত তুলে সামনের বাড়িটা দেখাল মুসা। 'কুপার'স ডিনার। এখনও খোলা।'

কিশোর আর রবিন দু'জনেই হাসল। তাকিয়ে আছে বাড়িটার দিকে। পুরানো ঢঙে তৈরি বাড়ি, সাদা রঙ করা। দ্বীপের মেইন স্ট্রীটের নাম কারলু রোড। এই রোডের পাশে কজওয়ের এককোণে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা।

'নাইটলাইফ বটে,' বিড়বিড় করল কিশোর।

'ওই যে, আমরা যেটা খুঁজছি,' গাল আইল্যান্ড মেরিনার দিকে হাত তুলল রবিন। সাইনবোর্ডে লেখা: ওয়াইল্ড পাম মোটেল। চার মাইল।

'মুসা, ডানে ঘোরো,' বলল সে।

'সাংঘাতিক ঝড় হয়ে গেছে এখানে,' বিধ্বস্ত গাছপালাগুলো দেখে বলল মুসা। ভেঙে এসে রাস্তায় পড়ে আছে কিছু নারকেল আর পাম গাছ। সে-সব

এড়িয়ে সাবধানে চালাতে হচ্ছে তাকে।

'দিনের আলোয় নিশ্চয় অন্য রকম লাগবে,' হতাশ মনে হলো রবিনকে। 'এখন তো একেবারে বিবর্ণ!'

শুধু বিবর্ণই নয়, রুক্ষও লাগছে। রাস্তায় মানুষজন নেই। বাড়িঘরও তেমন দেখা যাচ্ছে না এদিকটাতে।

'সত্যি কথা বলব?' মুসা বলল। 'সৌন্দর্যের ছিটেফোঁটাও দেখছি না আমি। বরং ভূতুড়ে মনে হচ্ছে। দেখলে মনে হয় কাজ করতে করতে কিসের আশঙ্কায় যেন হঠাৎ করে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে উন্নয়ন। দেখছ না কেমন আধখাপচা তৈরি হয়ে পড়ে আছে বাড়িগুলো?'

'যা-ই বলো,' কিশোর বলল, 'এতটা খারাপ কিন্তু না। আমি তো কার্ড তৈরি করার উপযোগী প্রচুর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি।'

কথাটা ভুল বলেনি সে। গাছপালার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে ঝড়ে, কিন্তু এখনও প্রচুর গাছপালা দাঁড়িয়ে আছে–ছবির মত করে সাজানো, তার ওপাশে চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছে গালফ অভ মেক্সিকো।

'যাক, এলাম শেষ পর্যন্ত,' শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। পুরো আধপাক গাড়ি ঘুরিয়ে মোড় নিল। পাশ দিয়ে চলে গেল গোলাপী নিওন আলোয় লেখা 'ভ্যাকেন্সি' সাইন। গাড়ি থামাল এনে ওয়াইল্ড পাম মোটেলের অফিসের সামনে।

'ওয়াইল্ড পাম কেন নাম রাখা হয়েছে বোঝা যাচ্ছে,' হোটেলের সীমানার মধ্যে জন্মানো উঁচু উঁচু পামের জটলাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল রবিন। প্রচুর গাছ।

'জেগেই আছে মনে হয়,' আলোকিত অফিসের দিকে তাকিয়ে থেকে ইমার্জেন্সি ব্রেকটা লাগিয়ে দিল মুসা।

ঘড়ি দেখল কিশোর। হাত-পা টান টান করে দিয়ে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার আড়ষ্টতা কাটাতে চাইল। নামার সময় হয়েছে।

হঠাৎ এক ধাক্কায় তার পাশের দরজাটা খুলে ফেলে লাফ দিয়ে নেমে দিল দৌড় মুসা।

দুই

কিশোরও দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে মুসার পেছনে ছুটল। অফিসের পেছনের ঘন ঝোপঝাড়গুলোর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে মুসা।

'মুসা!' দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। ঝোপের অন্ধকারে মুসাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাল তার চোখ।

জবাব দিল না মুসা।

'মুসা!' আবার ডাকল সে।

আচমকা হুড়মুড় করে অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় বেরিয়ে এল

মুসা।

'অফিসের পেছনে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারছিল একটা লোক,' কোনখানটায় দাঁড়িয়ে ছিল হাত তুলে দেখাল সে। 'আমাদের দেখে দৌড় মারল।'

চেঁচামেচি শুনে অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন লম্বা এক ভদ্রলোক। বয়েস প্রায় ষাট। ছোট করে ছাঁটা ধূসর রঙের দাড়ি। অফিসের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। পেছনে বেরোল কিশোরদের বয়েসী এক কিশোরী।

'হালো,' ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক, 'এসেছ তাহলে। তোমাদের অপেক্ষাতেই ছিলাম।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিয়ে দ্রুত সেদিকে এগোল কিশোর। পেছনে এল মুসা।

'আমি জেরাল্ড গ্রেজব্রুক,' হাত বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক। 'ইভা তো তোমাদের দেরি দেখে অস্থির হয়ে যাচ্ছিল।'

'কতদিন পর দেখা! কেমন আছ তোমরা, কিশোর?' এগিয়ে এল মেয়েটা। লম্বা, ছিপছিপে দেহ। সুন্দরী। লাল চুলগুলো মাথার পেছনে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘোড়ার লেজের মত করে বেঁধেছে।

'চাচা, ও কিশোর পাশা,' পরিচয় করিয়ে দিল ইভা। 'আর ও মুসা, মুসা আমান।...আর এই যে, রবিন।'

গাড়ি থেকে নেমে চলে এসেছে রবিনও। কিশোরের কাছ থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

'খুব খুশি হলাম তোমাদের দেখে,' আন্তরিক কণ্ঠে বললেন মিস্টার ব্রুক। 'এই খানিক আগেও তোমার বাবা ফোন করে জিজ্ঞেস করেছেন তোমরা এসেছ নাকি,' রবিনের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি। 'ইভা তো তোমাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তোমাদের মত গোয়েন্দা নাকি আর সারা দুনিয়ায় নেই।'

'বাড়িয়ে বলেছে,' হাসল কিশোর। 'বন্ধু তো।' প্রশংসা করা কথাবার্তা বিব্রত করে ওকে, তাই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্যে বলল, 'যাই হোক, আপনাদের চমকে দিতে চাই না। তবু বলতেই হচ্ছে, আপনাদের পেছনের জানালায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছিল একটা লোক। আপনারা কোন শব্দটব্দ শুনেছেন? অস্বাভাবিক কিছু?'

ইভার সবুজ চোখের তারায় শংকা দেখতে পেল কিশোর।

'না! দেখিনি!' হঠাৎ রেগে গেলেন মিস্টার ব্রুক। 'তাই তো বলি! আমি আরও ভেবে অবাক হচ্ছিলাম, অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে না কেন আজ? এসো, ভেতরে এসো। সব বলছি তোমাদের।'

উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত একটা ঘরে ঢুকল ওরা। ফরমিকার কাউন্টার থেকে শুরু করে লাল প্লাস্টিকের চেয়ার আর অন্যান্য আসবাবপত্র সব কিছুতে ধুলো পড়ে আছে। মলিন হয়ে গেছে চেহারা, লক্ষ করল কিশোর। যত্ন নেয়া হয় না বোঝা যায়। যেন কোন কারণে ওগুলোর প্রতি একটা অনীহা জন্মে গেছে মালিকের।

'পেছনে আমার বেডরুম,' পর্দা ঝোলানো একটা দরজা দেখালেন মিস্টার ব্রুক। 'ইভারটা তার পাশে।'

কাউন্টারের পেছনে সারি সারি নম্বর। প্রতিটি নম্বরের ওপরে হুক। চাবি

ঝুলছে ওগুলো থেকে।

'সুন্দর একটা রিসর্ট ছিল এটা,' দুঃখের সঙ্গে জানালেন মিস্টার ব্রুক। ফলের হালুয়া কাটতে চাচাকে সাহায্য করল ইভা। এটা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। কিশোরদের আসার শব্দ শুনে কাজ রেখে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গিয়েছিল দু'জনে। 'প্রচুর ট্যুরিস্ট আসত। ভালই ছিলাম আমরা। কিন্তু দুর্ঘটনাটাও ঘটল, আমরাও গেলাম।'

চাচার সঙ্গে সুর মেলাল ইভা, 'চাচার ডকটার সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে হলুদ রেসিং বোটটা।'

'দু'জন ট্যুরিস্ট রোদ পোয়াচ্ছিল, এই সময় এসে গুঁতো মারল বোটটা।' ফুঁসে উঠলেন মিস্টার ব্রুক। 'দু'জনকেই হাসপাতালে নিতে হয়েছে।'

'বোট চালকের কি খবর?' জানতে চাইল কিশোর।

'ওর আর কি হবে?' বিরক্তিতে মুখ বাঁকালেন মিস্টার ব্রুক। 'প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছে অ্যাক্সিডেন্টের পর পরই ফুল স্পীডে পালিয়ে গেছে সে। তার মানে ইচ্ছে করে ভেঙে দিয়ে গেছে ডকটা। পুলিশ পরে জানতে পেরেছে বোটটা নাকি চোরাই বোট ছিল। চোরটাকে ধরতে পারেনি। বোটটাও নাকি আর খুঁজে পায়নি। পুলিশের ধারণা, ডকে বাড়ি লেগে বোটটারও ক্ষতি হয়েছিল। ফেটে-টেটে গিয়েছিল নিচের দিকে। পানি ঢুকে ডুবে গেছে চ্যানেলে। চোরটাও মরেছে পানিতে ডুবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।'

'ঘটনাটা কি জিনার নিখোঁজ হওয়ার আগের?' জানতে চাইল কিশোর।

'আগের দিনের,' ইভা জানাল।

'জিনা কি করে নিখোঁজ হলো, খুলে বলবে?' অনুরোধ করল কিশোর।

'বলব না কেন? বলার জন্যেই তো তোমাদের ডেকে আনলাম,' ইভা বলল।

গাল আইল্যান্ডে বেড়াতে গিয়ে জিনার রহস্যময় ভাবে নিখোঁজ হওয়ার খবরটা মুসাদের বাড়িতে ফোন করে ইভাই জানিয়েছিল। মুসা গিয়ে খবর দিয়েছে কিশোর আর রবিনকে। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে সেদিনই রকি বীচ থেকে গাল আইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে তিনজনে।

খুক করে কাশল ইভা। জিজ্ঞেস করল, 'খাবে কিছু?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, আমরা খেয়ে এসেছি। তুমি বলো।'

'জিনা এখানে বেড়াতে আসার পর থেকে রোজই আমরা একসঙ্গে সৈকতে বেড়াতে যেতাম। সেদিন আমার কিছু জরুরী কাজ ছিল অফিসে। চাচাকে সাহায্য করতে হয়েছিল। জিনাকে বললাম সৈকতে চলে যেতে। আমি পরে যাব।

'লাঞ্চের পর খাবার নিয়ে গেলাম সৈকতে। আমাদের বসার প্রিয় জায়গাগুলোতে খুঁজলাম। কোথাও পেলাম না তাকে। ভাবলাম, শহরে-টহরে গেছে। চলে আসবে।

'আমি অপেক্ষা করতেই থাকলাম। কিন্তু সে আর আসে না। চাচার গাড়িটা নিয়ে বেরিয়েছিল সে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মোটেলে ফিরে এলাম। চাচাকে বললাম সব। তখনও খারাপ কিছু সন্দেহ করিনি আমরা।

'সন্ধ্যার পরেও যখন ফিরল না, ভীষণ দুশ্চিন্তা হতে লাগল। বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে খোঁজ নিল চাচা। আমিও কয়েক জায়গায় ফোন করলাম। কোথাও

যায়নি জিনা।'

একটানা কথা বলে দম নেয়ার জন্যে থামল ইভা।

'গেকো গাড়িটা পরে খুঁজে পেয়েছে পেলিক্যান লেন-এ,' মিস্টার ব্রুক জানালেন, 'পরিত্যক্ত অবস্থায়।'

'গেকো!' চোখের পাতা সরু করে ফেলল মুসা। 'গেকো তো জানি এক ধরনের গিরগিটি?'

'আরে না না, এ গেকো সে গেকো নয়,' না হেসে পারলেন না মিস্টার ব্রুক। 'এর পুরো নাম হেরিং গেকো। ডেপুটি শেরিফ। আমাদের এখানকার পুলিশ ফোর্স। ওই একজনের ওপরই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে পুরো দ্বীপ দেখাশোনার। যাই হোক, আঙুলের ছাপটাপ খোঁজাখুঁজি করেছে সে। পেয়েছে তিনজনের। আমার, জিনার আর গাড়ির গ্যারেজের মিস্ত্রির।'

'মাত্র একজন পুলিশ?' বিশ্বাস হচ্ছে না রবিনের। 'আস্ত একটা দ্বীপের দেখাশোনার জন্যে মাত্র একজন?'

'হ্যাঁ,' বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিলেন মিস্টার ব্রুক। 'অথচ দেখো, সীভিউর কাউন্টি কর্তৃপক্ষ পাশের দ্বীপ ক্যাসটেলো কী-কে দিয়েছে পাঁচজন পুলিশ। আর আমাদের মাত্র একজন। বড় বেশি পক্ষপাতিত্ব!'

'তা, আপনাদের গেকো সাহেব কোন সূত্রটুত্র পেয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'কিচ্ছু না,' জবাব দিলেন মিস্টার ব্রুক। 'গাড়িটা রেখেছি অফিসের পেছনে। তোমরা ইচ্ছে করলে ওটাতে সূত্র পড়ে আছে কিনা খুঁজে দেখতে পারো। তার জন্যে গাড়িটাকে টুকরো টুকরোও যদি করে ফেলতে হয়, তাতেও আমার আপত্তি নেই।'

'জিনাকে জিম্মি হিসেবে আটকে রেখে টাকার জন্যে নোট পাঠিয়েছে? কিংবা ফোন-টোন কোন কিছু?'

'কিছুই পাঠায়নি। পাঠিয়ে লাভ হবে না, জানে। আমার তো টাকা-পয়সা নেই যে দিতে পারব। শুধু কি কিডন্যাপিং; চুরি-দারি আরও কত কিছুই করছে। এই তো, জিনা নিখোঁজ হওয়ার তিন রাত আগে আমার দুটো পাম গাছ চুরি করে নিয়ে গেছে।'

'খাইছে!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। 'পাম গাছ! গাছ চুরি করে কার কি লাভ?'

'ফ্লোরিডায় কিছুদিন ধরে পামের এক ধরনের রোগ হচ্ছে, পাম-ফাঙ্গাস বলে এক জাতের ফাঙ্গাস ধ্বংস করে দিচ্ছে গাছগুলোকে,' মিস্টার ব্রুক জানালেন। 'কাজেই এ সব গাছের এখন খুব কদর এ অঞ্চলে। সুস্থ গাছ পেলে ভাল দাম দিতে রাজি আছে অনেকে।'

'মজার ব্যাপার হলো,' ইভা বলল, 'এত নিঃশব্দে কাজটা করেছে ওরা, রাতের বেলা কোন শব্দই শুনিনি আমরা । এমনকি গাছগুলো যে গায়েব হয়ে গেছে পরদিন সকালেও খেয়াল করিনি আমি। মাটিতে গর্ত দুটো প্রথমে চাচার চোখেই পড়েছে।'

'প্রায় সারাটা জীবনই এখানে কাটিয়ে দিলাম,' মিস্টার ব্রুক বললেন, 'চোরের ছায়াও দেখিনি কখনও। ঘরের দরজা-জানালায় তালা তো দূরের কথা, ছিটকানিও লাগাইনি কোনদিন। কিন্তু হঠাৎ করেই বড় বড় শহরের মত চুরি-ডাকাতি আর নানা রকম অপরাধের কাজ শুরু হয়ে গেছে গাল আইল্যান্ডেও।' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। বাস্তবে ফিরে এলেন যেন। 'এই দেখো, খালি নিজের দুঃখের বয়ানই করে চলেছি। এতটা পথ গাড়ি চালিয়ে এসেছ, নিশ্চয় খুব ক্লান্ত। চলো, ঘুমানোর জায়গা দেখিয়ে দিই। আমারও ঘুম পেয়েছে।'

'ভাববেন না, মিস্টার ব্রুক,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর, 'জিনাকে তো খুঁজে বার করবই আমরা, আপনার গাছগুলোও খুঁজে বের করে দেব।'

'অত মিস্টার-ফিস্টার বলা লাগবে না, স্রেফ আঙ্কেল বলবে আমাকে,' বলে দিলেন মিস্টার ব্রুক। 'নিজের বাড়ি মনে করবে। সামান্যতম অসুবিধে হলেও জানাবে আমাকে।'

একটা হুক থেকে চাবি খুলে নিয়ে কিশোরের হাতে ফেলে দিলেন তিনি। দশ নম্বর কটেজটার চাবি। ওখানেই থাকার ব্যবস্থা করেছেন ওদের।

'সারি ধরে হেঁটে গিয়ে শেষ মাথার কটেজটা,' বলে দিলেন তিনি। 'জিনাকে দিয়েছিলাম তিন নম্বরটা। ও আসার পর ইভাও তার সঙ্গেই ঘুমাত।'

'থ্যাংকস, অ্যান্ড গুডনাইট, জেরি আঙ্কেল,' দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে হাত নাড়ল মুসা।

ইভাও চলল ওদের সঙ্গে। কিশোর বলল, 'আসা লাগবে না। তুমি যাও। আমরা চিনে নিতে পারব।'

'তোমরা আসায় একটা পাষাণ নেমে গেল আমার মন থেকে,' ইভা বলল। 'উফ্, কি দুশ্চিন্তাই যে হচ্ছিল।'

'আর দুশ্চিন্তার দরকার নেই,' রবিন বলল। 'জিনাকে খুঁজে বের করবই আমরা।'

ইভাকে 'গুডনাইট' জানাল তিন গোয়েন্দা। ঘরে ঢুকে ওর দরজায় ছিটকানি এবং শিকল লাগানোর শব্দ না শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর রওনা হলো গাড়ির দিকে। ব্যাগ-সুটকেসগুলো আনতে হবে।

ওগুলো নিয়ে এল নিজেদের ঘরে।

খুব সুন্দর, বড় একটা ঘর। বড় বড় খাট। ধপ করে বিছানায় বসে পড়ে মুসা বলল, 'উফ্, বাপরে বাপ! এত কাহিল জীবনে হইনি!'

'হবেই। এত পথ গাড়ি চালানো কি সোজা কথা,' রবিন বলল।

'কথা না বলে আর, শুয়ে পড়ো,' কিশোর বলল। 'তাড়াতাড়ি উঠতে হবে আবার ঘুম থেকে। সাতটার মধ্যে তদন্ত শুরু করে দেব। প্রথমেই খুঁজে দেখতে হবে গাড়িটা। যেটা থেকে নিখোঁজ হয়েছে জিনা।'

মুসা বলল, 'একবার ঘুমালে এখন আমার কানের কাছে কামান দাগলেও উঠতে পারব কিনা সন্দেহ। তবু, সকাল বেলা ঠেলাঠেলি করে দেখো।'

হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে বাতি নিভিয়ে দিল কিশোর।

সবে শুয়েছে, হঠাৎ ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো।

ঝট করে উঠে বসল আবার কিশোর। মুসা আর রবিনও ঘুমায়নি এখনও। শব্দটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে তাকিয়ে আছে।

'ঘটনাটা কি...' বলতে গেল মুসা।

কিন্তু কথা শেষ হলো না তার। ভেসে এল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

তিন

'আই, কিশোর! কিশোর!' চিৎকার করছে ইভা। 'তোমাদের গাড়ি! জানালার কাঁচ ভেঙে কে জানি ঢোকার চেষ্টা করছে!'

এক লাফে বিছানা থেকে নেমে ছুটে বেরিয়ে এল ওরা। রবিন গেল ইভার কাছে। মুসা আর কিশোর ছুটল গাড়ির দিকে।

'ওই যে যাচ্ছে! ওই যে ব্যাটা!' চিৎকার করে উঠল মুসা। ছুটন্ত মূর্তিটার দিকে দৌড় দিল সে। তাকে অনুসরণ করল কিশোর।

কিন্তু ধরা গেল না লোকটাকে।

'পালাল ব্যাটা!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা।

'সামনের বাঁ পাশের জানালাটা ভেঙেছে,' কিশোর বলল।

গাড়ির দিকে এগোল দু'জনে। ততক্ষণে পৌঁছে গেছে রবিন আর ইভা।

গাড়ির জানালা দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল রবিন।

'কার-ফোনটা নিয়ে গেছে,' তারের ছেঁড়া মাথাটা তুলে দেখাল সে। 'আর কিছু মনে হয় নিতে পারেনি। ইভার চেঁচামেচি শুনে দৌড় দিয়েছে।'

নেয়ার মত আর তেমন কিছু ছিলও না ভেতরে। আগেই নিয়ে গেছে ওরা।

তবু, কিশোরও আরেকবার ভালমত দেখল, আর কিছু খোয়া গেছে কিনা।

সীটের ওপর পড়ে থাকা কাঁচের টুকরো পরিষ্কার করল। জানালায় আটকে থাকা টুকরোগুলোও টেনে টেনে তুলে ফেলে দিল। ফোকরটা বন্ধ করে দিল প্লাস্টিকের কাপড় দিয়ে। আরও একবার ইভাকে 'গুডনাইট' জানিয়ে শুতে গেল আবার নিজেদের ঘরে।

'কিছু একটা ঘটছে এখানে,' কিশোর বলল, 'তাতে কোন সন্দেহ নেই। জিনাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল। আমরা যাতে ওকে খোঁজাখুঁজি না করি, সে-জন্যে নানা রকম শয়তানি শুরু করেছে এখন। ফোনটা নিয়েছে বটে, কিন্তু চুরি করার উদ্দেশ্যে আসেনি চোর। চুরি করতে এলে অত শব্দ করে জানালার কাঁচ ভাঙত না। নিঃশব্দে সারার চেষ্টা করত।'

'হুঁ,' হাই তুলতে তুলতে বলল মুসা। 'সকাল বেলা দেখব, শয়তানিটা কার। এখন ঘুমানো যাক।'

দ্বিতীয়বারের মত বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা।

রাতে আর কিছু ঘটল না।

পরদিন খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। এক ডাক দিতেই উঠে গেল

রবিন। তাকে নিয়ে গাড়িটা দেখতে চলল কিশোর।

ময়লা হয়ে আছে গাড়িটা। প্রচুর ধুলো। ব্যবহার করা হয় না বোধহয়, পরিষ্কারও করেন না সে-জন্যে। অফিসের পেছনে ফেলে রেখেছেন। অফিসের অপরিষ্কার আসবাবপত্রগুলোর কথা মনে পড়ল কিশোরের। কোন কারণে সব কিছুর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন যেন মিস্টার ব্রুক।

'এই কিশোর, দেখো,' নাইলনের সুতোয় বোনা একটা ফিতে তুলে দেখাল রবিন। একদিকের গ্লোভ কম্পার্টমেন্টের কজায় আটকে ছিল।

সামনের সীটের নিচে খুঁজছিল কিশোর। ঘাড় ফিরিয়ে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিসের ফিতে?'

'যে কোন জিনিসের হতে পারে এটা,' রবিন বলল। 'টেপ প্লেয়ার, ক্যামেরা।'

'এটা না তো?' উজ্জ্বল হলুদ রঙের একটা স্পোর্ট-স্টাইল ক্যামেরা বের করে দেখাল কিশোর। ধাতব আংটার সঙ্গে ছেঁড়া ফিতের মাথাটা লেগে রয়েছে এখনও।

'পেলে নাকি কিছু?' দরজার কাছ থেকে শোনা গেল মুসার কণ্ঠ।

'অ, ঘুম ভাঙল।' ক্যামেরাটা মুসাকে দেখাল কিশোর।

'আরি, জিনার এ রকম একটা ক্যামেরা ছিল না!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ। কজায় আটকে গিয়েছিল ফিতেটা। তাড়াহুড়ো ছিল, তাই খোলার চেষ্টা না করে হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে এসেছিল। ছবিটা তুলে নিয়েই লুকিয়ে ফেলেছিল সীটের নিচে।'

রবিনের দিকে তাকাল সে, 'রবিন, ছবিটা ডেভেলপ করা দরকার। মেইনল্যান্ডে চলে যাও। এক ঘণ্টায় ছবি দিয়ে দেয় যে সব দোকানে, ওদের কাছ থেকে করিয়ে আনো।'

'জানালাটা মেরামত করিয়ে আনব?'

'নাহ্, আপাতত দরকার নেই। পরে সময় করে করা যাবে। বৃষ্টি এলে প্লাস্টিক দিয়ে আটকেই ঠেকাব আপাতত।'

গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেল রবিন।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে মুসা বলল, 'আমরা চলো যাই পেলিক্যান লেনে। গাড়িটা যেখানে পাওয়া গেছে। দেখে আসা দরকার।'

'চলো। ডেপুটি গেকো আসলেই সূত্র খুঁজেছে বলে আমার মনে হয় না। তাহলে এই ফিতে আর ক্যামেরাটা আমাদের হাতে পড়ত না।'

মিস্টার ব্রুকের গাড়িটা নিয়ে রওনা হলো দু'জনে।

কয়েক মিনিট পর জায়গাটাতে পৌঁছে গেল ওরা। ম্যাপ দেখে মুসাকে গাড়ি থামাতে বলল কিশোর। বালির ওপরে ইঁট বিছিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। বালিতে টায়ারের দাগগুলো ভালমত লক্ষ করল সে। কিডন্যাপারের গাড়ির চাকার দাগ দেখলে যাতে পরে চিনতে পারে।

'বাড়িঘর তো নেই বললেই চলে,' চারপাশে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বলল মুসা। 'জিনার কিডন্যাপিঙের পর বিশেষ কেউ আর আসেনি বোধহয় এদিকে। এখনও সূত্র পাওয়ার আশা আছে।'

নোটবুক বের করে পেন্সিল দিয়ে তাতে নানা রকম টায়ারের দাগের নমুনা এঁকে নিচ্ছে কিশোর, এই সময় সেখানে এসে থামল একটা পুলিশের গাড়ি। স্টিয়ারিঙের নিচ থেকে ধীরে-সুস্থে বেরিয়ে এল পেশীবহুল একজন লোক। কোমরের বেল্টে দুই হাতের বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে, হাঁটার তালে তালে রিভলভারের খাপ দোলাতে দোলাতে পুরানো ওয়েস্টার্ন সিনেমার নায়কদের মত কিশোরের সামনে এসে দাঁড়াল। 'আমি গেকো,' ভারিক্কি চালে পরিচয়টা জানিয়ে যেন কৃতার্থ করে দিতে চাইল গোয়েন্দাদের। 'ডেপুটি শেরিফ হেরিং গেকো।'

'মানে মৎস্য-গিরগিটি,' মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল মুসার। 'হেরিং' হলো মাছ আর 'গেকো' গিরগিটি।

'কি বললে?'

'না, কিছু না।'

'কিছু হারিয়েছ?' মৎস্য-গিরগিটি কথাটা বোধহয় শোনেনি গেকো, কিংবা শুনলেও ঠিক বুঝতে পারেনি। নইলে রেগে যেত, জানা কথা।

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমি কিশোর পাশা।' হাত বাড়িয়ে দিল সে।

কিন্তু ধরল না গেকো। আঙুল দুটো যে ভাবে ঢুকিয়ে রেখেছিল, সে-ভাবেই রাখল। গিরগিটির মতই মাথাটা একপাশে কাত করে এক চোখ উঁচু করে তাকাল। 'কিশোর পাশা?'

'হ্যাঁ। ও আমার বন্ধু, মুসা আমান।'

'ও, তোমাদের কথাই বলেছে তাহলে গ্লেজব্রুক। নিখোঁজ মেয়েটাকে খুঁজতে এসেছ তোমরা।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'ওকে কিডন্যাপ করা হয়নি,' রায় দিয়ে দিল ডেপুটি। 'সুতরাং যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফিরে যেতে পারো।'

'কিডন্যাপ হয়নি, আপনি কি করে জানলেন?' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখতে কষ্ট হলো কিশোরের।

'তাহলে টাকা দাবি করে নোট পাঠাত, এ তো সহজ কথা।'

'সব সময় টাকার জন্যে কিডন্যাপ করে না। আরও নানা কারণ থাকে।'

'থাকে, অস্বীকার করছি না,' কথাটার কোন সদুত্তর না দিয়েই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল গেকো। 'তোমরা এখন অন্যের জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছ। সেটা যে অপরাধ জানা আছে কি?'

'কিন্তু আমরা তো কোন ক্ষতি করছি না।'

'ওসব বুঝি না। এ জায়গাটা অন্য মানুষের। এবং আমি জানি, যার জায়গা, সে তোমাদের এখানে আসা পছন্দ করবে না।'

চারপাশে তাকিয়ে সাইনবোর্ড খুঁজল কিশোর। 'কই, কোথাও তো লেখা নেই।'

'সব সময় যে লিখে দিতে হবে এমন কোন কথা নেই,' জবাব দিল শেরিফ। 'আমাকে রেখেছে তাহলে কিসের জন্যে? আমার কাজ, এ রকম অপরাধ যাতে না করে কেউ সেদিকে লক্ষ রাখা।'

'তাহলে মালিকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসা যেতে পারে।'

'ওই কথাটি চিন্তাও কোরো না,' কঠিন কণ্ঠে বলল ডেপুটি। 'বাইরে থেকে নাক গলাতে আসা দুটো বালকের সঙ্গে প্যাঁচাল পাড়ার চেয়ে অনেক বেশি জরুরী কাজ আছে নীরা লেভিনের। এটা ট্যুরিস্ট স্পট, শান্তিতে সময় কাটাতে আসে লোকে। এখানে কোন রকম গোলমাল চাই না আমি, বলে দিলাম।'

'সে তো বুঝতেই পারছি,' মুসার দিকে ঘুরল কিশোর। 'চলো হে, মুসা, ডেপুটি সাহেব এখানে শান্তি বজায় রাখতে থাকুন। আমরা অন্য কাজে যাই।'

গাড়িতে চড়ে রাস্তায় ওঠার পরও ওদের পিছু ছাড়ল না শেরিফ। শহরে ঢোকার পর তারপরে গেল।

শেরিফ চলে গেল সৈকতের দিকে, কুপার'স ডিনারটা সামনে দেখে তার পাশে এনে গাড়ি থামাল মুসা।

ছোট হল ঘরটায় ঢুকল দু'জনে। মাত্র একজন কাস্টোমার। সুবেশী একজন অল্প বয়েসী মহিলা। সোনালি চুল। কাউন্টারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কফি খাচ্ছে।

কাউন্টারের উল্টো দিকে একটা টেবিলে লাল চামড়ায় মোড়া চেয়ারে বসল দুই গোয়েন্দা।

ওরা বসতেই এগিয়ে এল ওয়েইট্রেস মহিলা। বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। ধূসর রঙ লেগেছে চুলে।

'মেন্যু লাগবে না আমাদের, ম্যাগি,' মহিলার হালকা নীল পোশাকের বুকে সুতো দিয়ে লেখা নাম দেখে বলল কিশোর। 'আমাদের জন্যে ডিম, হোম ফ্রাই, আর টোস্ট।'

'হোম ফ্রাই হবে না,' ম্যাগি জানাল। 'হ্যাশ ব্রাউন।'

'আনুন। ওতেই চলবে।'

খিদে পেয়েছে খুব। গোগ্রাসে গিলছে দু'জনে, এমন সময় পেছনের ঘর থকে সরু একটা দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকল একজন লোক। ওর দাগ লাগা দোমড়ানো অ্যাপ্রনের বুকে লেখা রয়েছে 'কুপার'।

'ম্যাগি,' ওয়েইট্রেসকে বলল সে, 'গ্রিলে মাংস গেঁথে দিয়ে এসেছি। রান্নাটা শেষ করে ফেলগে।' অ্যাপ্রনে মুছল তেল মাখা হাত। 'ওই ডেপুটিটা যদি দ্বীপের এ সব শয়তানি বন্ধ করতে না পারে, পরের বার শেরিফের ইলেকশনে প্রার্থী হয়ে অবশ্যই তার বিরোধিতা করব আমি।'

মুখ তুলে তাকাল কাউন্টারে দাঁড়ানো সোনালি চুল মহিলা। 'কি আজেবাজে বকছ, কুপার!'

'না, সত্যি বলছি।'

'ষোলো বছর ধরে এক নাগাড়ে ডেপুটিগিরি করছে এখানে গেকো,' মহিলা বলল। 'তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলে হেরে ভূত হবে, জানা কথা।'

'না, হব না। কেন এতদিন টিকে ছিল ওই হাঁদাটা, জানো? দ্বীপে কোন অপরাধ হত না বলে। এখন যখন ঘটতে শুরু করেছে, বেশিদিন আর টিকতে পারবে না। আমার কথা ডায়েরীতে লিখে নিতে পারো তুমি, নীরা।'

নীরা!

মাঝপথে থেমে গেল কিশোরের চামচ।

মুসারও কান খাড়া হয়ে গেছে।

'লেখালেখির আর দরকার নেই। যার যার নিজের পথ দেখা ভাল,' নীরা বলল। 'তোমার ভালটা তো কখনোই বুঝতে চাওনি। কতবার বলেছি, আখেরটা গুছিয়ে নাও, কিন্তু কানেই যায় না তোমার। ডেভলেপমেন্ট কোম্পানি এখনও তোমার জায়গাটা কিনে নিতে আগ্রহী।'

'এবং আমি এখনও বলছি,' জবাব দিল কুপার, 'জায়গা আমি বেচব না। "বেচো বেচো" করে বিরক্ত করতে এসো না তো আর দয়া করে।'

'শোনো, কুপার, ভেবে দেখো,' নীরা বলল, 'কি পাচ্ছ তুমি এই রেস্টুরেন্ট ব্যবসা থেকে? এক কাপ কফি বেচতে গিয়ে দু'তিন কাপ বাড়তি দেয়া, দুটো ডিম ভাজা দিলে একটা ডিম ফ্রি দেয়া–এ সব করে কেউ ব্যবসা চালাতে পারে? লাভ হয় কিছু? বরং লস। অনেক বেশি লস। লোকসান দিতে দিতে শেষ হচ্ছ। আমি ব্যবসায়ী, আমি জানি। তারচেয়ে বেচে দিয়ে টাকা নিয়ে চলে যাও। কাজে লাগবে। কত চাও, নিজের মুখেই বলো বরং।'

মহিলাটাকে ভাল লাগল না কিশোরের। বুঝতে পারছে, কুপারও তাকে দেখতে পারে না।

'বেশ,' নরম হওয়ার ভান করল কুপার। 'জায়গাটা যখন এতই তোমার পছন্দ, যাও, দিয়ে দিলাম।'

রান্নাঘর থেকে সব কথাই বোধহয় কানে গেছে ম্যাগির। তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে মুখ বের করে চিৎকার করে বলল স্বামীকে, 'না না, কুপার, এ কি করছ!'

কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠল কুপার, 'তুমি আবার এ সবে নাক গলাতে এলে কেন? যাও, নিজের কাজ করোগে!'

খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে দুই গোয়েন্দার। প্রবল আগ্রহ নিয়ে কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে আছে।

'এই নাহলে পুরুষ মানুষের মত কথা,' হাসি ফুটেছে নীরার মুখে। চামড়ার পার্স থেকে চেক বই বের করল। 'বলো, কত চাও?'

দুই হাতের তালুর দিকে তাকাল কুপার। বিড়বিড় করল, 'দশ লাখ।'

দশ লাখ! দম আটকে ফেলল কিশোর।

'দশ লাখ, কি?' ভুল শুনেছে কিনা বুঝতে চাইল যেন নীরা।

'কি আবার, ডলার। দশ লাখ ডলার,' কুপার বলল। 'তুমি জানতে চেয়েছ, কত চাই। আমার দাম আমি বললাম। পছন্দ হলে নাও, নাহলে বিদেয় হও।'

'না না, বিদেয় হব কেন!'

চেক লিখতে শুরু করল নীরা।

চার

'খাইছে! এ জায়গার দাম দশ লাখ ডলার!' ফিসফিস করে বলল মুসা।

'হুঁ, বিশ্বাস তো আমারও হচ্ছে না,' কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে থেকে নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটছে কিশোর।

চেকটা কুপারের হাতে তুলে দিল নীরা।

হাতে নিয়ে দেখল কুপার। দেখল, সত্যি দশ লাখ লিখেছে কিনা। তারপর ধীরে ধীরে ছিঁড়তে শুরু করল। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বাতাসে উড়িয়ে দিল। নীরার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'রসিকতা করলাম। কিছু মনে কোরো না।'

কুপারের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল নীরা। দুপদাপ পা ফেলে চলে গেল দরজার দিকে।

'উফ্, বাঁচলাম!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ম্যাগি। 'আমি তো ভেবেছিলাম সত্যি সত্যি বুঝি তুমি...'

'দশ লাখ কেন, দশ কোটি টাকা দিলেও এ জায়গা বেচব না আমি,' কুপার বলল।

'এক্সকিউজ মী,' কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল কিশোর, তার পেছনে এগোল মুসা। 'আপনাদের কথাবার্তা সব শুনে ফেলেছি। গাল আইল্যান্ডে প্রচুর জায়গা আছে নাকি নীরা লেভিনের?'

'প্রচুর কি বলছ?' খড়খড় করে উঠল ম্যাগি। 'গাল আইল্যান্ডের অর্ধেকটাই তো তার।'

'আসলে,' শুধরে দিল কুপার, 'জমি বেচাকেনার যে কোম্পানিতে সে কাজ করে, জায়গাগুলো তাদের। কোম্পানির মালিক ডগলাস কেইন। কারলুর শেষ ধারে, সৈকতের কিনারে তার বাড়ি। এত ধনী, যা ইচ্ছে তাই কিনতে পারে।'

'হ্যাঁ,' ঘৃণায় নাক কুঁচকাল ম্যাগি। 'আর তার কেনা সম্পত্তির মধ্যে একটা হলো ওই নীরা লেভিন।'

'কিন্তু জায়গা বেচার জন্যে এত চাপাচাপি করছে কেন ওরা?' জানতে চাইল কিশোর।

'টাকা কামাইয়ের নতুন ধান্দা!' রুক্ষ শোনাল ম্যাগির কণ্ঠ।

'গুজব শোনা যাচ্ছে,' কুপার জানাল, 'চিরকালই ক্যাসটিলো কী'র দরিদ্র প্রতিবেশী এই গাল আইল্যান্ড। ক্যাসটিলোর পুরো পশ্চিম উপকূলটাই উপসাগরের মধ্যে ঢুকে রয়েছে। সবখানে রয়েছে সাদা সৈকত। সংস্কার করা হয়েছে ওগুলোর। নীরার মত উন্নয়নকারীরা আমাদের এই ছোট্ট দ্বীপটাকেও আরেকটা ক্যাসটিলো কী বানিয়ে ফেলতে চাইছে। আরেকটা গুজব আমি শুনেছি, ডগি, মানে ডগলাস নাকি গাল আইল্যান্ডটাকে একটা প্রাইভেট রিসর্ট বানানোর স্বপ্ন দেখছে। এখানে আসতে হলে তখন তোমাকে এটার মেম্বার হতে হবে। সরাসরি আর এ

ভাবে চলে আসতে পারবে না।'

'কিন্তু তারপরেও,' মুসা বলল, 'আপনার এই জায়গাটুকুর জন্যে দশ লাখ ডলার অনেক বেশি না?'

'তা তো বেশিই,' কুপার বলল। 'রেস্টুরেন্টটা দিয়ে দিতে আপত্তি ছিল না আমার। কিন্তু বাড়িটা তো ছাড়তে পারব না। বহু বছর ধরে আছি। আমার মত আরও অনেকেই আছে। ভালবেসে ফেলেছি দ্বীপটাকে। হোক না সাধারণ, কিন্তু এ তো এখন বাড়ি। আর আমরা চাই, এখন যেমন আছে ঠিক তেমনই থাকুক দ্বীপটা। অন্য কিছু হলে আমাদের বিদেয় হতে হবে।'

'তারমানে আপনার ধারণা,' কিশোর বলল, 'ডগলাস আপনাকে তাড়াতে চাইছে?'

'তোমার কি মনে হয়?' ভুরু নাচাল কুপার। 'হঠাৎ করেই যদি কোন জায়গায় অকারণে অ্যাক্সিডেন্ট, চুরি-ডাকাতি এ সব শুরু হয়ে যায়...'

'এবং কিডন্যাপিং,' যুক্ত করল মুসা।

'হ্যাঁ, ওই মেয়েটার কথা শুনেছি,' কুপার বলল। 'আর আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ওকে উদ্ধারের কোন চেষ্টাই করেনি ওই গেকোটা। মেয়েটার জন্যেই এলে নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমি কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু মুসা আমান। গত রাতে এসেছি আমরা। আমাদের আরও এক বন্ধু এসেছে, রবিন মিলফোর্ড। জিনার কি হয়েছে, খোঁজ-খবর নিচ্ছি আমরা...'

বাইরে খোয়ার মধ্যে টায়ার ঘষার কর্কশ শব্দে ছেদ পড়ল কথায়। গাড়ির দরজা লাগানোর শব্দ হলো। ছুটে ঘরে ঢুকল রবিন।

সদ্য প্রিন্ট করে আনা ছবিগুলো তুলে দিল কিশোরের হাতে।

'বাহ্, বড় তাড়াতাড়ি দিল তো,' কিশোর বলল।

'চলো, টেবিলে গিয়ে বসে দেখা যাক,' মুসা বলল।

'এক্সকিউজ আস, কুপার,' বলে টেবিলের দিকে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। তিনজনে এসে বসল আবার আগের টেবিলটায়। রবিনের জন্যেও খাবারের অর্ডার দেয়া হলো।

ছবিগুলো টেবিলে ছড়িয়ে দেখতে শুরু করল ওরা।

'এটা দেখো, বেশ স্পষ্ট,' একটা ছবি দেখাল রবিন।

মিস্টার ব্রুকের কাঠের তৈরি কেবিন ক্রুজারের সামনে দাঁড়ানো জিনা আর ইভা। কিশোরের কাছে এটা সাধারণ ছবি মনে হলো।

ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা ছবিতে আটকে গেল তার চোখ। টেনে নিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'এটাই আমাদের দরকার!'

হাতে নিয়ে তিনজনেই ভালমত ছবিটা উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। বোঝার চেষ্টা করল। ছবিতে আরেকটা গাড়ির পেছনের অংশ দেখা যাচ্ছে। মিস্টার ব্রুকের গাড়িতে বসে তোলা। তাড়াহুড়া করে তোলার কারণে অস্পষ্ট রয়ে গেছে ছবির অনেক কিছু। বোঝা কঠিন।

ছবির এক জায়গায় আঙুল রাখল কিশোর। 'দেখো, এটা জেরি আঙ্কেলের

গাড়ির জানালার ফ্রেম। এটা গাড়ির হুড।'

'আর এটা,' রবিন বলল, 'সামনের গাড়িটার পেছনের বাম্পার।'

'ঠিক,' একমত হলো কিশোর। 'আর এটা দেখো। সাদা-কালো স্টিকার। বাম্পারের বাঁ সাইডে, নিচের দিকে লাগানো। কোন ধরনের আইডেন্টিফিকেশন নম্বর।'

'ভাড়া করা গাড়ির এ সব থাকে,' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। 'কোম্পানির নিজস্ব একটা সিরিয়াল নম্বর দিয়ে রাখে গাড়িতে।'

'এ ছবিটা বড় করা দরকার,' কিশোর বলল। 'আমি শিওর, এ গাড়িটা দিয়েই জিনাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। এই কোড নম্বরটা যতক্ষণ না বুঝতে পারছি...'

খাওয়া শেষ করে আর দেরি করল না রবিন। উঠে দাঁড়াল। 'এনলার্জ ছবিটা নিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসছি আমি।'

বেরিয়ে গেল সে।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'আমরা আর বসে থেকে কি করব? চলো, একটু সৈকতের দিক থেকে ঘুরে আসি।'

'ওদিকে কেন?' বলতে গেল মুসা।

'তদন্ত করতে। ভুলে যাচ্ছ কেন, সৈকতে যাবার পথেই নিখোঁজ হয়েছে জিনা। বলা যায় না, জরুরী সূত্র পেয়ে যেতে পারি ওদিকে।'

কুপারের বিল মিটিয়ে দিল কিশোর। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চাপল দু'জনে। স্টার্ট দিয়ে দক্ষিণে গাড়ি ঘোরাল মুসা। মেইন রোড ধরে সৈকতের দিকে চলল।

'কি বলেছিলাম? দিনের বেলা দারুণ লাগবে!' চতুর্দিকের চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে শিস দিতে শুরু করল কিশোর।

একটা মোড় ঘুরতেই সাদা সৈকত চোখে পড়ল। নারকেল আর উঁচু উঁচু রয়্যাল পামের সারি তিনদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সৈকতটাকে। সারা দ্বীপে এখানেই কিছু মানুষের ভিড় দেখা গেল।

'দিনটা কিন্তু পানিতে নামার মতই,' লোভাতুর দৃষ্টিতে সাগরের নীল পানির দিকে তাকাল মুসা।

হাসল কিশোর। 'পরে। সাঁতার কাটার অনেক সুযোগ পাবে।'

বালির প্রান্তে সারি দিয়ে থাকা গাছের ছায়ায় গাড়ি রাখল মুসা। গাড়ি থেকে নামল দু'জনে।

শক্তিশালী ইঞ্জিনের গর্জন শুনে ফিরে তাকাল মুসা। পেছনের একটা সরু গলি থেকে বেরিয়ে এল একটা সাদা-কালো ট্রাক। তীব্র গতিতে ছুটে এল ওদের দিকে।

এক ধাক্কায় কিশোরকে রাস্তার কিনারে ফেলে দিয়ে নিজেও ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মুসা। পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া ট্রাকটার গরম বাতাসের ধাক্কা লাগল গায়ে। দেখতে দেখতে ট্রাকটা মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল রাস্তার অন্য পাশে।

'বড় বেশি তাড়াহুড়া মনে হচ্ছে,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল কিশোর।

গা থেকে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'ড্রাইভারের চেহারা

দেখেছ?'

'না। দেখার সুযোগ পেলাম কোথায়? কাল রাতে যে গাড়িটা পিছু নিয়েছিল আমাদের, ওইটা, তাই না?'

'তাই তো মনে হলো,' মুসা বলল। 'তবে এবারও লাইসেন্স প্লেটটা দেখতে পারিনি। এমন করে ধুলোর ঝড় তুলে ছুটে গেল।'

গাড়িটার ভাবনা আপাতত মাথা থেকে দূর করে দিল কিশোর। ইভা জানিয়েছে, সে আর জিনা এদিকের সৈকতে এলে পানির কিনারে একটা পামের জটলার কাছে বসে গায়ে রোদ লাগাত। কোথায় আছে সে-রকম জায়গা, খুঁজতে শুরু করল তার চোখ।

কিছুটা দূরে সৈকত ঘেঁষে একটা লাল রঙের বাড়ি দেখতে পেল। সামনে সবুজ লন। 'ওটাই সম্ভবত ডগলাস কেইনের বাড়ি।'

শিস দিয়ে ফেলল মুসা। 'খাইছে! বাড়ি একখান!'

দোতলা মূল বাড়িটা ছাড়াও একটা গেস্ট হাউস, পাঁচটা গাড়ি রাখার গ্যারেজ, আর অনেকগুলো কুকুরের ঘর আছে। গ্যারেজের পাশে দাঁড়ানো একটা কালো সিডান গাড়ি। খানিক দূরে কংক্রীটের প্যাডের ওপর রাখা একটা ছোট হেলিকপ্টার।

'সাংঘাতিক ধনী তো লোকটা,' কিশোর বলল।

'সে তো বটেই,' মুসা বলল। 'কুপাররা বলল না, যা কিনতে ইচ্ছে হয়, কেনার ক্ষমতা আছে ডগলাস কেইনের।'

নিচু একটা দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। সর্বসাধারণের জায়গা থেকে বাড়ির সীমানা ভাগ করা হয়েছে ওই দেয়াল দিয়ে। দেয়ালের দুই প্রান্ত থেকে ছোট ছোট খুঁটির সারি চলে গেছে সৈকতের ওপর দিয়ে পানির কাছে। খুঁটিগুলোতে শিকল লাগিয়ে বেড়া বানিয়ে আলাদা করে দেয়া হয়েছে সৈকতটা। শিকলের ভেতরটা 'ব্যক্তিগত' বুঝিয়ে দিয়েছে।

'কি ভাবছ?' ভুরু নাচাল মুসা। 'চলে যাব নাকি ওপাশে?'

'আমি তো জানতাম, সৈকতের কোন মালিক থাকে না। তা ছাড়া ভেতরে ঢোকা বেআইনী কথাটা যখন কোথাও লেখা নেই,' মুচকি হাসল কিশোর, 'ঢুকে পড়লামই বা।'

সহজেই বেড়াটা ডিঙিয়ে চলে গেল মুসা। তার পেছনে রইল কিশোর। লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে যেতে লাগল 'ডগলাসের সৈকত' ধরে। দেয়ালের গায়ে গেট দেখে ভেতরে ঢোকার জন্যে মোড় নিল।

'যদি দেখে?' মুসার প্রশ্ন।

'কি আর করবে?' কিশোর বলল আবার। 'বড়জোর তার সীমানা থেকে বেরিয়ে যেতে বলবে...'

কথা শেষ না করেই থমকে দাঁড়াল সে। কুকুরের ডাক কানে এসেছে। কোন্ দিক থেকে এল?

জানার জন্যে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। বাড়ির সীমানায় পা দিতে না দিতেই দেখে মূল বিল্ডিংটার পাশ ঘুরে ছুটে বেরিয়ে আসছে তিনটা কুকুর।

ভয়ঙ্কর ডোবারম্যান পিনশার। বিকট ভঙ্গিতে দাঁত বের করে গর্জন করছে চাপা স্বরে।
'কিশোর!' চিৎকার করে উঠল মুসা।
লন মাড়িয়ে ছুটে আসছে কুকুরগুলো। সামনের কুকুরটা, বিরাট একটা কালচে-বাদামী জানোয়ার সোজা ধেয়ে আসছে কিশোরের দিকে।

পাঁচ

'কিশোর, জলদি!' বলে এক চিৎকার দিয়েই ঘুরে ছুটতে শুরু করল মুসা। লাফ দিয়ে গিয়ে উঠে পড়ল নিচু দেয়ালটায়। কিশোর কি করছে দেখার জন্যে ফিরে তাকাল।
প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে কিশোর। কুকুরগুলোকে পেছনে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। পায়ের কাছে খটাস খটাস চোয়াল বন্ধ করছে সামনের কুকুরটা। যে কোন মুহূর্তে কামড় লেগে যাবে।
কিশোরও দেয়ালটার কাছে পৌঁছে গেল। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল দেয়ালে। উঠতে সাহায্য করল তাকে মুসা। এক মুহূর্ত দেরি না করে লাফ দিয়ে উল্টো দিকের সৈকতে নেমে পড়ল দু'জনে। বালি মাড়িয়ে ছুটতে লাগল।
কয়েক সেকেন্ড পরেই সৈকতে বেরোনোর গেট দিয়ে বেরিয়ে এল কুকুরগুলো। পেছন পেছন আসতে লাগল।
উপায় না দেখে আবার দেয়াল ডিঙিয়ে বাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়ল ওরা। দেয়ালে বসে থাকা নিরাপদ নয়। নিচু। লাফ দিয়ে ধরে ফেলতে পারবে কুকুরগুলো। বাঁচতে হলে কোন ঘরেটরে ঢুকে পড়তে হবে।
লন ধরে ছুটতে ছুটতে চোখের কোণ দিয়ে বাদামী একটা ছায়া দেখতে পেল কিশোর। কাছে এসে গেছে সামনের কুকুরটা।
ঘুরে দাঁড়াল মুসা। বুঝে গেছে দৌড়ে পরাজিত করতে পারবে না ওই ভয়ানক জানোয়ারগুলোকে। অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি একটা লন চেয়ার তুলে নিয়ে বাড়ি মারার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।
'অ্যাই, থাম!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশ শোনা গেল।
চোখের পলকে দাঁড়িয়ে গেল কুকুরগুলো। একেবারে কাঁচুমাচু হয়ে তাকাল মনিবের দিকে। স্লাইডিং ডোর সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে লম্বা একজন লোক।
রোদে বেরিয়ে এল লোকটা। ভুরু কুঁচকে রেখেছে। গোয়েন্দারা তার দিকে চোখ তুলে তাকাতেই হাসল। কিন্তু চোখের শীতলতা কাটল না তাতে।
'দারুণ জিনিস পুষছেন,' শুকনো কণ্ঠে বলল কিশোর।
'ঠিকই বলেছ,' লোকটা জবাব দিল। 'তোমাদের আগে যে লোকটা কাউকে কিছু না বলে বাড়িতে ঢুকেছিল, কামড়ে তাকে মেরেই ফেলেছিল আরেকটু হলে।'
'আমাকে কিছু করার আগে আমি ওর ঘাড়টা ভেঙে দিতাম,' হাতের চেয়ারটা

মাটিতে ফেলে দিল মুসা।
'ডগলাস কেইন,' মুসার কথা যেন শুনতেই পায়নি, এমন ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা।
'কিশোর পাশা,' কেইনের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল কিশোর। 'ও আমার বন্ধু, মুসা আমান।'
'জানি,' কেইন বলল।
'সত্যি?' কিশোর অবাক। 'কি করে জানলেন?'
'জানানোর লোক আছে আমার,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল কেইন। 'তা গাল আইল্যান্ডে কি উদ্দেশ্যে?'
'আমাদের এক বন্ধু নিখোঁজ হয়ে গেছে এখান থেকে,' জবাব দিল কিশোর। 'জরজিনা পারকার। আমাদের বিশ্বাস, কিডন্যাপ করা হয়েছে তাকে।'
'গুরুতর অভিযোগ,' হাসি মুছল না লোকটার মুখ থেকে। 'কিন্তু রোদের মধ্যে গরমে দাঁড়িয়ে কেন? এসো, ভেতরে এসো। ঠাণ্ডা কিছু খাবে?'
ঠাণ্ডা খাওয়ার তেমন কোন ইচ্ছে নেই কিশোরের, কিন্তু ঘরের ভেতরটা দেখার সুযোগটাও ছাড়তে চাইল না। রাজি হয়ে গেল।
'জিনিসপত্র সব এলোমেলো হয়ে আছে, কিছু আবার ভেবে বোসো না। গোছানোর সময় পাই না,' দামী দামী জিনিসপত্রে সাজানো একটা সান-রুম পেরিয়ে দু'জনকে বিরাট রান্নাঘরে নিয়ে এল কেইন। সাদা বিশাল কাউন্টারটাতে অসংখ্য বাক্স আর বাদামী ব্যাগ পড়ে আছে। কিশোরকে সেগুলোর দিকে তাকাতে দেখে বলল, 'কাল সন্ধ্যায় একটা ছোটখাট পার্টি আছে।'
ইনটারকমে কথা বলল কেইন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল একজন লোক। উচ্চতা পাঁচ ফুট দশের কম হবে না। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। উষ্কখুষ্ক চুল। পেশী যেন ফুটে বেরোচ্ছে। নড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কিলবিল করে উঠছে হাতের পেশী।
'এনডি টাওয়ার,' গোয়েন্দাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল কেইন। 'এনডি, ও কিশোর পাশা। আর ও মুসা আমান।'
'আরেকটু হলেই ওদের চাপা দিয়ে ফেলেছিলাম আজ,' এনডি বলল, যেন মস্ত বড় একটা রসিকতা। 'রাস্তায় হাঁটার সময় আরও সাবধান হওয়া উচিত তোমাদের।'
'যাই বলেন, দারুণ একখান ট্রাক কিন্তু আপনার,' খোঁচাটা না দিয়ে ছাড়ল না কিশোর। 'রাস্তায় বেরোলেই দেখা হয়ে যায়...'
'বাদ দাও ওর কথা,' কিশোরকে থামিয়ে দিল কেইন। 'এনডি, ওদের সোডা দাও।'
বিশাল রেফ্রিজারেটর থেকে চার ক্যান সোডা বের করল এনডি।
'বাপরে বাপ, কতবড় ফ্রিজ! প্রচুর খাবার ধরে নিশ্চয়,' রেফ্রিজারেটরটার কাছে এগিয়ে গেল মুসা। রসে ভেজানো কালো আঙুরের একটা ক্যান বের করল মুসা। 'খাবই যখন, ভাল করে খাই।' ক্যানটা খুলতে গিয়ে ফ্রিজের দরজার দিকে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল তার হাত। বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন শরীরে।
কিশোর তখন সৈকতে তোলা ইভা আর জিনার যুগল ফটোগ্রাফটা দেখাচ্ছে

কেইনকে। 'মাত্র গত সপ্তাহে তোলা।'

ছবিটার দিকে ঠিকমত তাকালও না কেইন। 'সরি। কখনও দেখিনি একে।'

এনডিকে দেখাল কিশোর। 'আপনি দেখেছেন?'

'উঁহু,' না দেখেই বলে দিল এনডি। পরে তাকাল ছবির দিকে।

'আপনি শিওর?'

'মেয়েটা সুন্দরী, কোন সন্দেহ নেই। চোখে পড়ার মত। দেখলে ঠিকই মনে থাকত।'

রেফ্রিজারেটররের কাছ থেকে ফিরে এল মুসা। উত্তেজনা চাপা দিতে কষ্ট হচ্ছে তার। কিশোরের দিকে তাকিয়ে ইশারা করতে যাবে, ফোন বাজল দোতলায়।

'কোরি, ধরো তো!' দরজার দিকে ফিরে চিৎকার করে বলল এনডি।

ছুটন্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল। দৌড়ে যাচ্ছে কোরি।

কয়েক সেকেন্ড পর রান্নাঘরে উঁকি দিল আরেকটা লোক, 'বস্, আপনার ফোন! মিয়ামি থেকে।' এনডি যেমন লম্বা, কোরি তেমনি খাটো। হালকা-পাতলা। মাথার কালো লম্বা চুল ব্যাকব্রাশ করা। এনডির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি কুকুরগুলোকে ঘরে আটকে রাখতে যাচ্ছি।'

'যাও,' বলে ডাকল আবার কেইন, 'কোরি, শোনো। এদের নাম জানো? ও কিশোর পাশা। আর ও মুসা আমান।'

অস্বস্তিভরা চোখে ওদের দিকে তাকাল কোরি, কিছু বলল না।

'আপনারা মনে হচ্ছে সবাই খুব ব্যস্ত,' কিশোর বলল কেইনের দিকে তাকিয়ে। 'আমরা বরং চলে যাই।'

কিন্তু যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই কিশোরের। তার ধারণা, যত বেশি সময় থাকা যাবে, তত বেশি সূত্র পাওয়া যাবে। একটা ব্যাপারে ইতিমধ্যেই শিওর হয়ে গেছে—ওদেরকে ফলো করে আসা ট্রাকটার মালিক ডগলাস কেইন।

কেউ কিছু বলছে না দেখে থাকার আশা ত্যাগ করল কিশোর। 'সোডা খাওয়ানোর জন্যে ধন্যবাদ। আর কুকুরগুলোকে ডেকে ফেরানোর জন্যেও।'

'তোমাদেরকেও ধন্যবাদ,' কেন ধন্যবাদ দিল, সে-কথাটা আর খোলসা করল না কেইন। 'কোরি, তুমি আর এনডি ওদেরকে এগিয়ে দিয়ে এসো। দেখো, কুকুরগুলো যেন আর বিরক্ত করতে না পারে।'

বাইরের ঘরে কিশোররা ঢুকেছে, এই সময় দরজার বাইরে নীরা লেভিনকে দেখা গেল।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল এনডি, কাঁচের স্লাইডিং ডোরের ছিটকানিটা খুলে দেয়ার জন্যে।

ভেতরে ঢুকে কিশোরদের দেখে থমকে দাঁড়াল নীরা। 'কোথায় যেন দেখেছি তোমাদের?...ও, কুপারের রেস্টুরেন্টে। আমার পিছু নিয়েছ কেন?'

'আপনার পিছু নেব কেন?' হাসিমুখে জবাব দিল কিশোর। 'আপনার অনেক আগেই আমরা এসেছি।'

মনে মনে রেগে গেলেও রসিকতার ঢঙে মুসা বলল, 'মনে তো হচ্ছে আপনিই আমাদের অনুসরণ করে এসেছেন।'

'হয়েছে, হয়েছে! আমার কথা তুলে নিলাম!' নীরস স্বরে জবাব দিল নীরা।

'একটা মেয়েকে খুঁজতে এসেছে ওরা এখানে,' বিশ্রী একটা পরিস্থিতি তৈরি হতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠল এনডি। 'আমরা বলে দিয়েছি সে এখানে নেই। তাই ওরা এখন চলে যাচ্ছে।'

ওদের দরজার বাইরে বের করে দিয়ে দরজা লাগিয়ে দিতে গেল এনডি, কিন্তু কি ভেবে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। ছবিটা বের করে জিনার ছবিতে আঙুল রেখে দেখাল নীরাকে। 'দেখুন তো, আপনি দেখেছেন নাকি?'

ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে নীরা, কিশোর তার মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ করছে কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কিনা।

'তিন দিন হলো নিখোঁজ হয়েছে,' কিশোর বলল। 'ভাবলাম, মিস্টার কেইন কিংবা তাঁর কর্মচারীদের কেউ দেখে থাকতে পারে, সৈকতের এত কাছে বাড়ি যখন।'

'মেয়েটা সুন্দরী,' নীরা বলল। 'হ্যাঁ, দেখেছি ওকে। সৈকতে ঘোরাফেরা করতে। দ্বিতীয় মেয়েটার সঙ্গে।'

'ওদের সঙ্গে আর কাউকে দেখেছেন?'

'উঁহু। ওদেরকেও দেখতাম না যদি লোক বেশি থাকত। এ সীজনে ট্যুরিস্ট খুব কম এসেছে। সৈকতে লোক প্রায় ছিলই না।'

'শুনলাম, ট্যুরিস্ট আসা কমে যাওয়ার পেছনে নানা রকম কারণ রয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট, চুরি-ডাকাতি এ সব খুব বেড়ে গেছে দ্বীপে। ট্যুরিস্ট নেই, ব্যবসা নেই—ব্যবসায়ীরা বিপাকে পড়েছে। মিস্টার কুপারের মত।'

'ওই গাধাটার কথা আর বোলো না!' রেগে উঠল নীরা। 'ও রকম একটা জায়গার জন্যে দশ লাখ ডলার হাতে পেয়ে যে ফিরিয়ে দেয় সে আস্ত বোকা!'

'কিংবা যে অত টাকা দেয়,' খোঁচা মারতে ছাড়ল না কিশোর।

বরফের মত শীতল হয়ে গেল নীরার দৃষ্টি। এনডির দিকে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বলল, 'বের করে দিয়ে এসো ওদের!'

কিশোরকে বলার জন্যে তর সইছে না মুসার। ওদের বাইরে বের করে দিয়ে এনডি চলে যেতেই বলল, 'জানো, কি দেখে এলাম?'

'কি?'

'নানা রকমের ছবি চুম্বক দিয়ে আটকে রেফ্রিজারেটরের দরজা সাজিয়েছে।'

'ফ্রিজের দরজা ওরকম অনেকেই সাজায়,' কিশোর বলল। 'তাতে অবাক হওয়ার কি আছে?'

'আছে। পারকার আঙ্কেলের ছবি যদি লাগানো থাকে ডগলাস কেইনের ফ্রিজের দরজায়, অবাক হবে না?'

ছয়

'তারমানে জিনাই ছবিটা লাগিয়েছে ফ্রিজের দরজায়,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ। আর কে লাগাবে?' মুসা বলল।

'অথচ কেইন আর তার কর্মচারীগুলো স্রেফ অস্বীকার করল, জিনাকে দেখেনি। ছবির দিকে না তাকিয়েই। কিন্তু সে ছাড়া ওই ফ্রিজে আর কেউ লাগায়নি তার বাবার ছবি। কোন এক সুযোগে লাগিয়ে দিয়েছে। আমাদের জন্যে সূত্র। সে জানে, ওর নিখোঁজ হওয়ার কথা শুনলে আসবই আমরা। ছবিটা ছাড়া আর কিছু আছে?'

'না। থাকলেও দেখিনি।'

'আবার ঢুকতে হবে ওই বাড়িতে,' কিশোর বলল। 'জিনার নিরুদ্দেশের ব্যাপারে কেইনের হাত থেকে থাকলে ওই বাড়িতেই তাকে আটকে রেখেছে।'

'পার্টির সময় ঢুকে পড়লে কেমন হয়? সবাই ব্যস্ত থাকবে পার্টি নিয়ে, আমাদের কেউ লক্ষ করবে না।'

'ঠিক বলেছ,' পরামর্শটা পছন্দ হলো কিশোরের। 'এখন চলো, মোটেলে ফিরে যাই। রবিনের ফেরার অপেক্ষা করি।'

গাড়িতে উঠে ফিরে চলল ওরা।

ওয়াইল্ড পাম হোটেলের সামনে এনে গাড়ি থামাল মুসা। ভ্যানটার কাছে। ফিরে এসেছে রবিন। ওদের অপেক্ষাতেই ছিল।

ব্রেক করেও সারতে পারল না মুসা, ভেতর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল রবিন। ১২ বাই ১৪ ইঞ্চি একটা ছবি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দেখো তো, কেমন হলো?'

গাড়ি থেকে নেমে এসে ছবিটা হাতে নিল কিশোর। একবার দেখেই বলে উঠল, 'ঠিকই বলেছিলাম। আইডেন্টিফিকেশন নম্বরই এটা।'

'বেশির ভাগ নম্বরই অস্পষ্ট, বোঝা যায় না,' রবিন বলল। 'দোকানের লোকটা বলল, এরচেয়ে ভাল করার আর সাধ্য নেই তার।'

'ঠিকই বলেছে,' একমত হলো কিশোর, 'এর চেয়ে ভাল আর কেউই করতে পারবে না। শেষ তিনটে সংখ্যা পড়া যাচ্ছে এখন—তিন, দুই, ছয়।'

মুখ তুলে তাকাল সে। 'এখন আমাদের পরবর্তী কাজ রেনটাল কার এজেন্সিকে ফোন করা। শেষ তিনটা সংখ্যা মেলে এ রকম ক'টা গাড়ি আছে তাদের, খোঁজ নেয়া।'

মোটেলের অফিস ঘরে ঢুকল ওরা।

ওদের দেখেই বলে উঠলেন মিস্টার ব্রুক, 'আর বোধহয় টিকতে পারলাম না!' কাউন্টারের ওপর একটা কাগজ রেখে ওদের দিকে ঠেলে দিলেন তিনি। 'পড়ো এটা।'

'কি?' তুলে নিল কিশোর। 'রেডস্টার বুকিংস। কিসের কোম্পানি?'

'পড়ো না, তাহলেই বুঝতে পারবে। ওরা আমার কাস্টোমার জোগাড় করে দেয়। কাস্টোমারের সঙ্গে মধ্যস্থতা করে মোটেলে বুকিঙের ব্যবস্থা করে। বিনিময়ে কমিশন পায়।'

কাগজটা জোরে জোরে পড়ল কিশোর: 'আমরা আর ওয়াইল্ড পাম মোটেলের সঙ্গে চুক্তিতে থাকতে পারছি না।'

'কি কারণ?' জানতে চাইল রবিন।

'সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি না,' ক্ষোভের সঙ্গে বললেন মিস্টার ব্রুক। 'ফোন করেছিলাম। জবাব দিল না। আমার কাছে একটা টাকাও পাবে না ওরা। সব পাওনা সময় মত দিয়ে দিয়েছি। কোন অভিযোগ নেই আমার বিরুদ্ধে। মোট কথা, কাজ না করার কোন কারণই নেই।'

'তারমানে কেউ ওদের কাজ করতে মানা করেছে,' কিশোর বলল।

'মনে হয়। প্রচুর টাকা খাইয়েছে, কিংবা অন্য কোন ভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে। আমার ডক ভেঙে দিয়েছে, গাছ চুরি করেছে, এখন আমার ব্যবসার ওপর হাত দিয়েছে। জায়গাটা বিক্রির জন্যে মোটা টাকা দেয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিল। আমি শুনিনি। এটাই সম্ভবত আমার অপরাধ। মনে হচ্ছে এরপর আমার বোটটার ওপর নজর দেবে। তাড়াতাড়ি ওটা মেরিনায় সরিয়ে না ফেললে–যেখানে পাহারার ব্যবস্থা আছে, ওটাও খোয়াতে হবে আমাকে।'

'আপনার বন্ধু কুপার কিন্তু রুখে দাঁড়িয়েছেন,' কিশোর বলল। 'আমার মনে হয় আপনারও এত সহজে হাল ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না।'

'বলার চেয়ে করা কঠিন,' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিলেন মিস্টার ব্রুক।

'আজকের দিনটা অন্তত চুপ করে থাকুন। কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। শান্ত মাথায় চিন্তা করার মত অবস্থা নেই।'

মিস্টার ব্রুককে চুপ করে থাকতে দেখে কিশোর বলল, 'আমরা আপনাকে সাহায্য করব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জিনার কিডন্যাপের সঙ্গেও এ সবের কোন সম্পর্ক আছে। একটা রহস্যের সমাধান হলে আরেকটারও হয়ে যাবে।'

'কিছু কিছু যুদ্ধ আছে, যেগুলো করে কোন লাভ হয় না,' মিস্টার ব্রুক বললেন। 'যাকগে, আমি কোন কথা দিতে পারছি না তোমাদেরকে।'

অফিস থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে এল ইভা।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি করব?'

'চলো, গাড়িটার খোঁজ-খবর করা যাক,' জবাব দিল কিশোর। 'তারপর খেতে যাব কুপার'স ডিনারে।'

'চলো, আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে,' ইভা বলল।

খোঁজাখুঁজি করতে অনেক সময় গেল। লাঞ্চ করতে কুপার'স ডিনারে যখন গেল ওরা, লাঞ্চের সময় পেরিয়ে গিয়ে প্রায় ডিনারের সময় হয়ে গেছে।

মজার ব্যাপার, কাকতালীয় ভাবে ওখানেই সবুজ গাড়িটার খোঁজ পেয়ে গেল ওরা। তবে ওটাই আসল গাড়িটা কিনা, নিশ্চিত হতে পারল না। যদিও শেষ তিনটে নম্বর মিলে যায়। গাড়িটার রঙও সবুজ।

গাড়িটা যে নিয়ে এসেছে, সে-ও কুপার'স ডিনারে কফি খেতে ঢুকেছে।

লোকটার কালো চুল। চামড়ার রঙ মোমের মত ফ্যাকাসে।

লোকটা বেরিয়ে গেলে ম্যাগিকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল ওর নাম হারম্যান কেগ।

'মাসখানেক হলো এসেছে,' ম্যাগি জানাল। 'বিচিত্র স্বভাব। কারও সঙ্গে কথা বলে না। ঢোকে, চুপচাপ খেয়েদেয়ে বিল দিয়ে চলে যায়।'

'কোথায় থাকে, বলতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'শুনেছি পেলিক্যান লেন-এ,' ম্যাগি বলল।

'আমিও তাই শুনেছি,' পেছনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল কুপার। 'লোকটা চোর-ডাকাত হতে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে।'

'শুধু কি চোর,' ম্যাগি বলল। 'শুনলাম, শিকাগো থেকে এসেছে সে। ওখানে মানুষ খুন করে পালিয়েছে।'

'হ্যাঁ, এ গল্প আমিও শুনেছি,' কুপার বলল। 'কেউ কেউ বলে, আসলে লোকটা একটা বিদেশী স্পাই। বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে নিজের দেশের লোকেরা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে-জন্যে গাল আইল্যান্ডে এসে লুকিয়ে আছে।'

'চোর-ডাকাত-খুনী-স্পাই, যা-ই হোক,' ইভা বলল, 'লোকটা যে খারাপ, দেখলেই বলে দেবে যে কেউ। আরও কিসের কিসের সঙ্গে জড়িত, কে জানে!'

'সেটা জানতে যাওয়ার জন্যে এখনও দিনের কিছু আলো অবশিষ্ট আছে,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'চলো তাহলে,' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা, 'ফরেন স্পাই মিস্টার হারম্যান কেগ জিরো জিরো সেভেনের সঙ্গে দেখাটা সেরেই আসি।'

সাত

পেলিক্যান লেনে মোড় নেয়ার সময় গতি কমিয়ে ফেলল মুসা। অনেক জমিতে মলিন হয়ে আসা 'বিক্রয় হইবে' সাইন দেখা গেল। একটা বাড়ি দেখা গেল, শূন্য, নির্জন, পরিত্যক্ত। গভীর মনোযোগে সব লক্ষ করছে কিশোর।

'রাস্তার শেষ মাথা পর্যন্ত চলে যাও,' মুসাকে বলল সে। 'হারম্যান কেগ কোন বাড়িতে আছে দেখে নেয়া যাক। তারপর খানিকটা সরে এসে রাস্তার দিকে মুখ করে গাড়ি পার্ক করো।'

'তাতে লাভটা কি?' জিজ্ঞেস করল ইভা। অস্বস্তিতে ভরা কণ্ঠ।

মুচকি হাসল কিশোর। 'তাতে লাভটা হলো বিপদ দেখলে এক মুহূর্ত দেরি না করে পালাতে পারব।'

একটা কটেজ টাইপের বাড়িতে থাকে কেগ। ছোট একটা রঙচটা ডেকের মত বারান্দা বেরিয়ে আছে সামনের দরজার গোড়া থেকে। তার ওপরে চালা। একপাশে বড় বড় জানালা বাড়িটার, একেবারে মেঝে থেকে ছাতে গিয়ে ঠেকেছে। ফ্ল্যামিঙ্গো পাসের দিকে মুখ করা। ক্যাসটিলো কী'র চমৎকার দৃশ্যাবলীর অনেক

কিছুই দেখা যাবে ওখানে দাঁড়ালে। দেখার জন্যেই বানানো হয়েছে ওভাবে জানালাগুলো। দেয়ালের রঙ নষ্ট হয়ে গেছে। চলটা উঠে উঠে বিশ্রী ক্ষতের মত দেখাচ্ছে। চড়া রোদে খুব সহসাই রঙের ছিটেফোঁটাও আর থাকবে না বোঝা যায়। কেবল চারপাশ ঘিরে থাকা পামের সারির কোন পরিবর্তন নেই, বাড়িটার রুক্ষতার মাঝে মোলায়েম প্রলেপ যেন ওগুলো।

প্রবালে তৈরি, অযত্নে নোংরা হয়ে থাকা গাড়ি বারান্দায় গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুসাকে বলল কিশোর, 'তোমার জিরো জিরো সেভেন মনে হয় ঘরেই আছে।'

গাড়ি ঘুরিয়ে রেখে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল মুসা। দরজা খুলে লাফিয়ে নামল মাটিতে।

'রবিন,' কিশোর বলল, 'তুমি আর ইভা গাড়িতেই থাকো। পাহারা দাও। আমরা আসছি।'

মুসাকে নিয়ে বাড়িটার দিকে রওনা হয়ে গেল সে। গাড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ দেখল কিশোর। তারপর দরজার দিকে এগোল।

টোকা দেয়ার আগেই খুলে গেল দরজা । দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কেগ। তারমানে নজর রাখছিল সে।

'কি চাও?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল কেগ।

'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল,' কিশোর বলল। 'যদি কিছু মনে না করেন।'

'আর যদি করি?'

কেগের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কিশোর বলল, 'ভেতরে আসব?'

'আমার গাড়ির কাছে কি করছিলে তোমরা? কেন বিরক্ত করছ শুধু শুধু?' কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে গেল কেগ। ওদের মুখের ওপর দরজাটা যাতে বন্ধ করে দিতে পারে।

'বেশি সময় নেব না,' অনুরোধ করল কিশোর।

'তোমাদের সঙ্গে কথা বলার কোন দরকার আছে বলে মনে হয় না,' গোঁয়ারের মত বলল কেগ। 'তোমাদেরকে আমি চিনিও না।'

'আমি কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু মুসা আমান।'

কেগকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল কিশোর, 'আমাদের এক বন্ধু নিখোঁজ হয়ে গেছে এ দ্বীপ থেকে।'

প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে জিনা আর ইভার যুগল ফটোটা বের করে দেখাল সে।

গভীর মনোযোগে ছবিটা দেখল কেগ। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে, কোন রকম প্রতিক্রিয়া হয় কিনা।

অবশেষে মুখ তুলে তাকাল কেগ। 'এদের কাউকেই দেখিনি আমি। চেনা তো দূরের কথা। দয়া করে এখন যাও তোমরা।'

'দেখুন, ব্যাপারটা সত্যি আমাদের জন্যে জরুরী,' ছবিটা আবার পকেটে রেখে দিল কিশোর। তারপর আচমকা ঢিল ছুঁড়ে বসল অন্ধকারে। 'মুখ বন্ধ না

রাখলে ক্ষতি করার হুমকি দিয়েছে আপনাকে ডগলাস কেইন, তাই না?'

'বেরোও! বেরোও আমার বাড়ি থেকে!' চিৎকার করে উঠল কেগ।

কিন্তু নড়ল না কিশোর আর মুসা।

'আমরা জানি,' কেগের চিৎকারের পরোয়াই করল না কিশোর, 'জিনাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। কি বলো, মুসা?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'আপনার গাড়িটার মত একটা গাড়ি দিয়ে।'

'আমার বিরুদ্ধে কিসের অভিযোগ আনতে চাইছ তোমরা, বুঝতে পারছি না,' গলার জোর হারিয়ে ফেলেছে কেগ। 'সত্যি বলছি, ডগলাস কেইনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমার। আমি প্রমাণ করে দিতে পারি, এখানে এ বাড়িতে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা বসে বসে আমি ছবি আঁকি, কেবল খাবার সময়টুকু বাদে। আমি একজন আর্টিস্ট।' তারপর কিশোরদেরকে আর কিছু বলার কিংবা ভেতরে ঢোকার কোন সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ পিছিয়ে গিয়ে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা ।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। ভুরু নাচাল, 'কি বুঝলে?' জবাবের অপেক্ষা না করে বলল, 'চলো, গাড়ির নম্বরটা লিখে নিই। চাকার খাঁজের ডিজাইনগুলোও দেখব।'

গাড়ির কাছে এসে নোটবুকে নম্বরটা লিখে রাখল সে। তারপর পেলিক্যান লেন থেকে এঁকে আনা ডিজাইনগুলো বের করে মিলিয়ে দেখতে লাগল।

'এই দেখো,' মুসাকে দেখাল কিশোর। 'জিনার ফেলে যাওয়া গাড়ির কাছে যে সব দাগ পেয়েছি, তার সঙ্গে একটা দাগ মিলে যাচ্ছে।'

ভ্যানের কাছে ফিরে এল দু'জনে। কি কি জেনে এল, জানাল রবিন আর ইভাকে।

'কেগকে কি মনে হলো?' জিজ্ঞেস করল ইভা।

'বুঝলাম না, ডাকাত দলের সর্দার, নাকি স্পাই,' জবাব দিল মুসা। 'তবে ডগলাসের কথা শুনে চমকে গেছে, এটা ঠিক।'

'তার গাড়িটার দিকে এখন নজর রাখা দরকার,' কিশোর বলল। 'এটাই আসল গাড়িটা কিনা, যেটাকে আমরা খুঁজছি, এ ব্যাপারে এখনও শিওর হওয়া যাচ্ছে না। খুঁজলে ওরকম তিনটে নম্বর মিলে যাবে বহু গাড়ির সঙ্গে। পুরো নম্বরটা ছাড়া নিশ্চিত হওয়া কঠিন। আর চাকার ডিজাইনও মিলে যাবে লক্ষ গাড়ির সঙ্গে, কারণ কোম্পানি তো আর প্রতিটি চাকারই ডিজাইন বদল করে না। কেগের গাড়ির সঙ্গে এ সব মিলে যাওয়াটা কাকতালীয়ও হতে পারে।'

'খাইছে!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'খুঁজে বের করব কি করে তাহলে?'

'ফোনে কাজটা সারা যেতে পারে,' কিশোর বলল।

'তাহলে দায়িত্বটা আমাকে দিতে পারো,' ইভা বলল। 'বসে বসে যত খুশি ফোন করতে পারব আমি।'

'কোন্ কাজ?' বুঝতে পারল না মুসা।

'গাড়ির সবুজ রঙ আর শেষ তিনটে নম্বর মিলে যায়, এমন ক'টা গাড়ি আছে, রেন্টাল কোম্পানিতে ফোন করে জানার কাজ,' বুঝিয়ে দিল কিশোর।

ইভাকেই দায়িত্বটা দিল সে।

মোটেলের কাছে আসতে কিশোর বলল, 'মনে হচ্ছে আঙ্কেল ব্রুকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কেউ।'

সবাই দেখল, পার্কিং লটে একটা দামী বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

মুসা গাড়িটা পুরোপুরি থামানোর আগেই হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে গেল ইভা। দৌড় দিল অফিসের দিকে।

তার পেছনে ছুটল কিশোর আর রবিন। গাড়িটা রেখে আসতে সামান্য দেরি হলো মুসার।

অফিসের কাছাকাছি আসতে কানে এল মিস্টার ব্রুকের কণ্ঠ, 'এ জায়গা বিক্রির কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না। কিন্তু আর তো কোন উপায়ও দেখতে পাচ্ছি না।'

ঘরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। ইভা আগেই ঢুকে পড়েছে। ফিরে তাকাল নীরা লেভিন। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার মিস্টার ব্রুকের দিকে ঘুরল।

'ঠিক আছে, নয় লাখ ডলারই দিলাম, যান।' দ্রুত চেক লিখে টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল মিস্টার ব্রুকের দিকে।

কিশোরের দিকে তাকালেন মিস্টার ব্রুক। 'খবর শুনেছ? আমার বোটটাও শেষ। মেরিনাতে সরানোর আর সুযোগ হয়নি। স্টার্ট দিতেই ইঞ্জিনে বিস্ফোরণ। তলা খসে গিয়ে তলিয়ে গেছে পানিতে। কোনমতে প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছি।'

অস্ফুট শব্দ করে উঠল ইভা।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল কিশোর। কি বলবে ভেবে পেল না।

মাথা নামালেন মিস্টার ব্রুক। ভগ্ন, বিধ্বস্ত একজন বুড়ো মানুষ। মুখ তুলে তাকালেন আবার নীরার দিকে। 'খুব যে বেশি দিচ্ছ না, সেটা তুমিও জানো। রিসর্ট বানিয়ে এর দশগুণ পয়সা তুলে নেবে খুব সহজেই।' চেকটার দিকে তাকালেন না তিনি।

'দশ কি বলছেন?' না বলে আর পারল না কিশোর। 'বিশ-তিরিশ গুণ এসে যাবে পয়লা দু'এক বছরেই। তার পরেরগুলো তো ফাউ। অনন্তকাল ধরে পেতেই থাকবে।'

তাড়াতাড়ি একটা দলিল বের করে বাড়িয়ে দিল নীরা। 'নিন, সই করে দিন।'

'চাচা, খবরদার!' চিৎকার করে উঠল ইভা। 'সই দেবে না বলে দিলাম!'

'না দিয়ে কি করব, বল?' ক্লান্ত, শুকনো কণ্ঠস্বর। 'তোরা চলে গেলি। বোটটা খুইয়ে এলাম। এসে দেখি স্টেট রিসর্ট ইন্সপেক্টর বসে আছে। হুমকি দিয়ে গেছে, আগামী কয়েক সপ্তার মধ্যে যদি প্রয়োজনীয় সংস্কার করাতে না পারি, মোটেলে তালা লাগিয়ে দেবে। বলে গেছে, নতুন আইন নাকি হয়েছে এ ব্যাপারে। কত আর লড়াই করব?'

'দিন, সইটা দিয়ে ফেলুন,' নীরা বলল। 'স্টেট ইন্সপেক্টর অন্যের ঘাড়ে চাপুক।'

'আঙ্কেল ব্রুক,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'সই করার আগে দলিলটা ভালমত পড়ে নিন। প্রয়োজন মনে করলে উকিলকে ডেকে আনুন।'

'এই ছেলে, তুমি থামো!' ধমকে উঠল নীরা। 'বেশি ফড়ফড় কোরো না! আগে আমাদের বেচাকেনা শেষ হয়ে যাক, তারপর যত খুশি পরামর্শ দিয়ো। নইলে খারাপ হবে বলে দিচ্ছি।'

পাত্তাই দিল না কিশোর। 'আঙ্কেল ক্রুক, একটা ফোন করব।'

হাত নেড়ে পাশের ঘরটা দেখিয়ে দিলেন মিস্টার ক্রুক।

চলে গেল কিশোর।

ইভা বলল, 'চাচা, দোহাই তোমার, জায়গাটা বিক্রি কোরো না!'

'দেখি তো দলিলটা?' কেউ বাধা দেয়ার আগেই টান মেরে মিস্টার ক্রুকের হাতের নিচ থেকে তুলে নিল রবিন।

'অ্যাই, দেখো!' চিৎকার করে উঠল নীরা। 'ভাল হবে না...'

দলিল সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা নেই রবিনের, তবে ওদের ব্ল্যাক ফরেস্টের বাড়িটা কেনার সময় কিছু কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। পড়তে শুরু করল সে।

কলমটা টেবিলে নামিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলেন আঙ্কেল ক্রুক। নীরার দিকে তাকাল, 'পড়তে আর আপত্তি কি? পড়ুক না। ভেতরে যদি কোন রকম গণ্ডগোল করে না রাখো, অত ভয় পাচ্ছ কেন?'

ঠাস করে ব্রীফকেসের ডালা বন্ধ করল নীরা। মুচকি হাসল রবিন। এতটাই প্রতিক্রিয়া হলো নীরার, এমন ভঙ্গি করল, চমকে গিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল ইভা।

'বহুত নাক গলাচ্ছ সব কিছুতে!' রবিনের দিকে তাকিয়ে গজগজ করতে লাগল নীরা।

'হুমকি দিচ্ছেন?' রাগ দমাতে পারছে না মুসা।

পাশের ঘরের দিকে তাকাল রবিন। দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে কিশোরকে। ফোনে কথা বলছে। নোটবুকে কি যেন লিখে নিয়ে ফোন রেখে দিল। ফিরে এল অফিসে।

'ব্যুরো অভ কমার্শিয়াল ইন্সপেকশনে ফোন করেছিলাম,' জানাল সে। 'স্টেট রিসর্ট ইন্সপেক্টর সেজে যে এসেছিল, সে ভুয়া লোক। নভেম্বরের আগে এ মোটেল ইন্সপেকশনে আসার কোন ইচ্ছেই নেই কর্তৃপক্ষের।'

'কিন্তু আইডেনটিটি দেখিয়েছে লোকটা,' বিশ্বাস করতে পারছেন না মিস্টার ক্রুক।

'ওটাও নকল, দেখুনগে।'

'মিথ্যে কথা!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল নীরা। রাগ দমন করতে পারল না আর। 'এত অল্প সময়ে এত খোঁজ নিতে পারার কথা নয় তোমার। আমি এখন ফোন করলে ঠিক ওরা বলবে, তুমি কোন ফোনই করোনি। তোমাকে চিনতেই পারবে না ওরা।'

'যান, গিয়ে করে দেখুন তাহলে,' সরে জায়গা করে দিল কিশোর।

'নাক গলানো বিচ্ছুর দল!' গালি দিয়ে উঠল নীরা। রবিনের হাত থেকে দলিলটা কেড়ে নিয়ে, টেবিল থেকে চেকটা তুলে ব্রীফকেসে ভরল। তারপর গট্

গট্ করে রওনা হলো দরজার দিকে।

বেরোনোর আগে ফিরে তাকাল, 'ভেবো না পার পেয়ে যাবে। বাঘের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছ তোমরা। এর চেয়ে অনেক বড় বড় ঘাগু লোককে...' কথাটা শেষ করল না নীরা। সমস্ত রাগ যেন গিয়ে পড়ল মিস্টার ক্রুকের ওপর। পিস্তলের মত তাঁর দিকে আঙুল তাক করে চেঁচিয়ে চলল, 'বুড়ো হাঁদা কোথাকার, সুযোগ দিয়েছিলাম, সদ্ব্যবহার করোনি। এখনও সময় আছে, মনস্থির করে বেচে দাও জায়গাটা। পরে এমন অবস্থা হবে, বেচার মত কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে না।'

আট

নীরা চলে যাওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ কথা বলল ওরা। আলোচনা করল ব্যাপারটা নিয়ে। তারপর কিশোর বলল, 'আজ আর কিছু করার সময় নেই। রেন্টাল কোম্পানির অফিসও নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গেছে। কাল সকালে যা করার করব।'

আগের রাতে ভালমত ঘুমাতে পারেনি, সেদিন তাই সকাল সকাল শুয়ে পড়ল ওরা।

পরদিন সকালে ঝরঝরে শরীর নিয়ে ঘুম ভাঙল কিশোরের। মোটেলের অফিসে এসে দেখে কাজে লেগে গেছে ইভা। তাকে সাহায্য করছে রবিন।

'অঘটনের যেন শেষ নেই,' কিশোরকে বলল ইভা। 'কাল রাতে চাচার এক বন্ধু ফোন করেছিল। হিবিসকাস ড্রাইভে থাকে। তার সান-রূমের জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকে কে নাকি এয়ারকুলারটা নষ্ট করে দিয়ে গেছে। গেকোর কাছে রিপোর্ট করা হয়েছে। সে বলেছে কোন দুষ্টু ছেলের কাজ।'

'আহা, পুলিশ অফিসার বটে!' দরজার কাছ থেকে বলে উঠল মুসা। ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল।

'তারমানে ওই ভদ্রলোকের জায়গাটার ওপরও নজর পড়েছে ওদের! আর কি খবর?' জানতে চাইল কিশোর।

'এয়ারপোর্টে কার রেন্টাল এজেন্সিতে ফোন করেছিলাম,' ইভা জানাল।

'কোন খোঁজ পেলে?'

'গাড়িটার বর্ণনা দিয়ে জানতে চাইলাম, কার কাছে ভাড়া দিয়েছে।'

'কি বলল?' আগ্রহে সামনে গলা বাড়িয়ে দিল কিশোর।

রবিনের দিকে তাকাল ইভা। আবার ফিরল কিশোরের দিকে। হাসল। 'বলেছে, হারম্যান কেগ নামে শিকাগোর এক বীমার দালাল গাড়িটা ভাড়া নিয়ে গাল আইল্যান্ডে গেছে। স্টিকারে লেখা যে সিরিয়াল নম্বরটা দিল, সেটার শেষ তিনটে নম্বরও মিলে গেছে।'

নিচের ঠোঁটে জোরে একবার টান দিয়ে ছেড়ে দিল কিশোর। চিন্তিত ভঙ্গিতে

আনমনে বিড়বিড় করল, 'শিকাগোর একজন বীমার দালাল গাল আইল্যান্ডে এসে ছবি আঁকা শুরু করল কেন?'

'ছবি যে আঁকছে তার কি প্রমাণ?' প্রশ্ন তুলল মুসা। 'ওটা ওর মুখের কথা। নিজের চোখে তো আর তাকে আঁকতে দেখিনি আমরা।'

'আমার মনে হচ্ছে, আরেকবার তার বাড়িতে যাওয়া উচিত আমাদের,' কিশোর বলল। 'আমাদের জানতে হবে জিনা কেন কেগের গাড়ির ছবি তুলেছে।'

'ও হ্যাঁ, তোমাদের বলতে ভুলে গেছি–বীমার কথায় মনে পড়ল,' ইভা বলল, 'চাচা গেছে মেইনল্যান্ডে। ওখান থেকে ফোন করেছিল। তোমাদের বলতে বলেছে তোমাদের ভ্যানের কাঁচটা সারিয়ে নেবে চাচা। যখন পারো টাকাটা দিয়ো। আর এখানে তার গাড়িটা ব্যবহার করতে বলেছে তোমাদেরকে। ওটার কিছু মেরামতি আছে। তাই নিতে ভরসা পায়নি। রাস্তাঘাটে যদি খারাপ হয়ে যায়। তোমাদেরটাই নিয়েছে।'

'মেইনল্যান্ডে গেছেন কেন? কোন জরুরী কাজ?'

'হ্যাঁ। বোটটার বীমা করানো ছিল। বীমা কোম্পানির সঙ্গে কথা বলতে গেছে।'

'আচ্ছা। ঠিক আছে,' কিশোর বলল, 'আমাদের আগেই যদি আঙ্কেল ব্রুক ফিরে আসেন, তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ জানিও, কাঁচটা ঠিক করে আনার জন্যে।'

অফিস থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। মিস্টার ব্রুকের গাড়িটাতে চড়ল। ড্রাইভিং সীটে বসল মুসা।

পেলিক্যান লেনে পৌঁছে একটা নির্জন বাড়ির পেছনে গাড়ি রেখে বেরিয়ে এল ওরা। মুসাকে গাড়ির পাহারায় রেখে রবিনকে নিয়ে এগোল কিশোর।

খালি একটা জায়গা পেরিয়ে কেগের বাড়ির দিকে এগোনোর সময় আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল সে। ধূসর মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে সকালের সূর্য। সাগরের দিক থেকে আসছে দমকা বাতাস। নুয়ে নুয়ে পড়ছে পাম আর পাইনের মাথা।

'ঝড় আসবে,' কিশোর বলল।

'সুবিধেই হবে তাতে,' রবিন বলল। 'চুরি করে আমরা বাড়িতে ঢুকতে গেলে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে লোকের চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম।'

কেগের বাড়ির পাশের জায়গাটাতে পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। বড় একটা ঝোপের আড়ালে থেকে বাড়িটাতে চোখ বোলাল।

'গাড়িটা নেই,' রবিনকে জানাল সে।

'কি করব?'

'তুমি এখানেই থাকো। আমি আরও কাছে গিয়ে দেখে আসি।'

'বেশি ঝুঁকি নিতে যেয়ো না,' সাবধান করে দিল রবিন।

মাথা নুইয়ে এক দৌড়ে বাড়ি আর ঝোপের মাঝের খালি জায়গাটুকু পার হয়ে এল কিশোর। কটেজের একটা বড় জানালার পাশে এসে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে, কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে জানালা দিয়ে লিভিং রুমের ভেতরে উঁকি দিল সে। মেঘে ঢাকা আকাশের প্রতিবিম্ব পড়েছে

কাঁচের ভেতর। পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেছে এখন সূর্য। বেরোচ্ছে না আর। দেখতে দেখতে এতটাই ঘন মেঘ জমে গেছে, সকালটাকে লাগছে সূর্য ডোবা সন্ধ্যার মত।

সাবধানে সরে এসে ডেকে ওঠার দুই ধাপ সিঁড়ির প্রথমটাতে পা রাখল কিশোর। মচ্‌মচ্‌ করে উঠল কাঠের তক্তা। কিন্তু সেটা চাপা পড়ে গেল মেঘ ডাকার শব্দে।

দ্বিধা করল এক মুহূর্ত। মাথার ওপর বাতাসে কাত হয়ে যেন ঝুলে রয়েছে একটা নারকেল গাছের মাথা। দরজার দিকে এগোল সে। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে পাল্লা। আস্তে করে ঠেলে সেটা আরও ফাঁক করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

পা টিপে টিপে চলে এল ডাইনিং রুমে। ওখানে দাঁড়িয়ে কান পাতল ভেতর থেকে শব্দ আসে কিনা শোনার জন্যে। ঘরের এক প্রান্তে সিংকের কল খোলা, ক্রমাগত পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। কিন্তু মানুষের সাড়া পাওয়া গেল না।

কি খুঁজতে এসেছে জানে না সে। কিন্তু খুঁজতে আরম্ভ করল।

কেগ ছবি আঁকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে হাত মোটেও ভাল নয়। কতগুলো বাজে ছবি এঁকেছে।

খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে বেরোতে যাবে, এই সময় ডাইনিং রুমের টেবিলে একটা পরিচিত জিনিস চোখে পড়ল। একটা হাতঘড়ি। তুলে নিয়ে উল্টে দেখল। কাজে এতটাই মনোযোগ, বাইরে যে গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ হচ্ছে, শুনতে পেল না।

কিন্তু রবিন ঠিকই শুনেছে। গাড়িটা পেলিক্যান লেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের শব্দ কানে এসেছে তার। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল কিশোরের জন্যে। ঝোপটার কাছ থেকে সরে এল একটা আঙুরের ঝাড়ের কাছে। চিৎকার করে ডেকে সাবধান করে দেবে কিনা কিশোরকে বুঝতে পারছে না। কাছে চলে এসেছে গাড়িটা। গাড়ির চালকও তার ডাক শুনতে পাবে।

রবিন কিছু করার আগেই ড্রাইভওয়েতে ঢুকে পড়ল গাড়ি।

কড়াৎ করে বাজ পড়ল সাগরের পানিতে। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়তে আরম্ভ করল। সবুজ গাড়িটার দিকে দৌড় দিল সে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল কেগ। মুহূর্তে বৃষ্টি বেড়ে গিয়ে মুষলধারে পড়া শুরু হলো।

কেগের হাতে লম্বা কালো একটা জিনিস।

ধড়াস করে উঠল রবিনের বুক। রাইফেল নাকি?

'কেগ!' চিৎকার করে ডাকল রবিন।

গাড়ির কাছে স্থির হয়ে গেল কেগ। রবিনের দিকে ঘুরতে গিয়েও ঘুরল না সে। অর্ধেক ঘুরেছিল, ঝটকা দিয়ে পুরো ঘুরে গেল আবার দরজার দিকে। কারণ কটেজের দরজা দিয়ে ডেকে বেরোতে দেখে ফেলেছে কিশোরকে।

'তুমি!' রাগে চিৎকার করে উঠল কেগ। 'তুমি এখানে কি করছ?'

'কিশোর, সাবধান!' রবিনও চিৎকার করে উঠল। 'ওর হাতে রাইফেল!'

বাজ পড়ল আবার। তার চিৎকার ঢাকা পড়ে গেল বাজের শব্দে।

বাজটা পড়ল ডেকের কাছের নারকেল গাছটার মাথায়। মাথাটা চিরে দিল এমন করে, যেন মাখনে ছুরি চালাল। একটা অংশ ভেঙে গেল কাণ্ড থেকে।

ডিগবাজি খেতে খেতে পড়তে লাগল ডেকের ওপর। কিশোর যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক সেইখানে।

নয়

'কিশোর!' বলে চিৎকার দিয়ে উঠল রবিন। আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে গাছের নিচে কুঁকড়ে পড়ে থাকা কিশোরের দেহটার দিকে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না। কেগকে ঠেকাতে হবে। মুসা অনেক দূরে। ডাকলেও শুনবে না। শুনলেও লাভ হবে না। ও আসতে আসতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। যা করার তার নিজেকেই করতে হবে। কেগের পা সই করে ঝাঁপ দিল রবিন। তাকে নিয়ে পড়ল মাটিতে।

'আরে কি করছ! কি করছ! ছাড়ো না!' চেঁচাতে লাগল কেগ। 'আমার পর্দা টানানোর রডগুলোর সর্বনাশ করে দেবে তো। বাঁকা হয়ে যাবে!'

কেগের পাশে মাটিতে পড়ে থাকা আঁটি বাঁধা জিনিসগুলোর দিকে ভালমত নজর দিল এতক্ষণে রবিন। 'পর্দা টানানোর রড?' বোকা হয়ে গেছে।

'এক মাস আগে অর্ডার দিয়ে এসেছিলাম বানিয়ে রাখার জন্যে,' গোঁ-গোঁ করে বলল কেগ।

কেগের ঘ্যানর ঘ্যানরে কান দিল না রবিন। রাইফেল নয় জানার সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় দুশ্চিন্তা মগজ থেকে নেমে গেল। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। কিশোরকে গাছের নিচ থেকে বের করতে হবে।

মুখে যা-ই বলুক, ওকে বের করতে রবিনকে ঠিকই সাহায্য করল কেগ। ধরাধরি করে গাছের মাথাটা সরাল কিশোরের ওপর থেকে। প্রথমে ডেকের ওপরের চালায় পড়েছিল বলে রক্ষা। চালায় পড়ে তারপর কিশোরের ওপর পড়েছে। সরাসরি পড়লে কোমর ভাঙত, কিংবা অন্য কিছু হত। মোট কথা আঘাতটা হত মারাত্মক।

ঘাড়ে সামান্য ব্যথা পেয়ে বেহুঁশ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু হয়নি। জ্ঞান ফিরতেও সময় লাগল না।

'ভালই আছি আমি,' ঘাড় ডলতে ডলতে বলল কিশোর। 'ভিজে গোসল করা ছাড়া খারাপ আর কিছুই হয়নি। কাঁধে কিছু আঁচড় আর ছেঁচা লেগেছে, নারকেলের ডগা ধারাল তো...'

ঝাপটা দিয়ে গেল প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস। বেড়ে গেল বৃষ্টির বেগ। ক্রমেই খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে ঝড়। ঘন ঘন বাজ পড়ছে। ক্রমাগত কালো মেঘের বুক চিরে ছুটে যাচ্ছে বিদ্যুতের লকলকে শিখা।

'এখানে থাকা বিপজ্জনক,' কিশোর বলল। 'বাজটা তখন গাছের মাথায় না পড়ে আমার মাথায় পড়লেই গেছিলাম।'

'ভেতরে তো যাবই,' এতক্ষণে ভাষা খুঁজে পেল যেন কেগ। 'তবে তার আগে

তোমাকে অ্যারেস্ট করানো দরকার।'

মাটি থেকে রডগুলো তুলে আনল সে। একসাথে বাঁধা ছিল বলে বৃষ্টির মধ্যে দূর থেকে রাইফেলের মত মনে হয়েছে রবিনের কাছে। রাইফেলের মতই উঁচু করে ধরল এখন কেগ। 'বেআইনী ভাবে আমার সীমানায় ঢুকেছ তোমরা। দরজা ভেঙে আমার ঘরে ঢুকেছ।'

'না, দরজা ভাঙিনি,' প্রতিবাদ জানাল কিশোর। 'দরজাটা খোলাই ছিল।'

'বুঝলাম, হুড়কোটা ভাঙা ছিল। তাই বলে অন্যের ঘরে ঢুকে পড়বে নাকি? চুরি করতে ঢুকেছিলে?'

'নাহ্,' হাসিমুখে মাথা নাড়ল কিশোর। 'চুরি করার মত কিছু নেই ঘরে। কতগুলো পচা ছবি। ওগুলো কে নেয়।'

কিন্তু কিশোরের রসিকতায় নরম হলো না কেগ। রেগে উঠল, 'তোমাকে আমি পুলিশে দেব!'

ডেকের ওপর উঠে পড়ল আবার কিশোর। বৃষ্টি কম লাগে। 'মিস্টার কেগ, আপনাকে একটা কথা বলি। আপনি যে গাড়িটা চালাচ্ছেন, আমাদের বন্ধুকে কিডন্যাপ করতে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা।'

'ফালতু কথা বোলো না!' ধমকে উঠল কেগ।

'প্রমাণ আছে আমাদের কাছে।'

'কি প্রমাণ?'

'ঘটনার সময়কার একটা ছবি। তাতে সহজেই প্রমাণ করা যাবে আপনার গাড়িটাই ব্যবহার করা হয়েছিল।' এক মুহূর্ত থেমে কেগকে খবরটা হজম করার সময় দিল কিশোর। তারপর বলল, 'সুতরাং আমাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে পুলিশ ডাকলে আমরাও ছেড়ে দেব না আপনাকে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কেগকে লক্ষ করছে কিশোর।

ডেকে উঠে পড়ল কেগ। সরে গিয়ে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে।

'আমি কাউকে কিডন্যাপ করিনি।'

'তাহলে কে করেছে?'

'আমি জানি না।'

'আপনার গাড়িটা যে ব্যবহার করা হয়েছে এটা তো ঠিক?'

একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে ভাবল কেগ, বলবে কিনা দ্বিধা করছে। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'গাড়িটা চুরি হয়ে গিয়েছিল।'

'চুরি!' সমস্বরে বলে উঠল রবিন আর কিশোর।

'হ্যাঁ, পাঁচদিন আগে। সৈকতের ধারে আমি তখন ছবি আঁকছিলাম।'

চুপ করে তাকিয়ে রইল কিশোর।

'ছবি আঁকা শেষ করে বাড়ি ফেরার জন্যে গাড়ির কাছে গেলাম,' কেগ বলল। 'গাড়িটা যেখানে রেখেছিলাম সেখানে পেলাম না। চাবি আমার পকেটেই ছিল। তারমানে তার ছিঁড়ে বিকল্প উপায়ে স্টার্ট দিয়েছে।'

'পুলিশকে জানিয়েছেন?'

'না।'

'আপনি যে সত্যি কথা বলছেন, বিশ্বাস করব কি করে?'

'আমার মুখের কথাই বিশ্বাস করতে হবে তোমাদের।'

'হুঁ। গাড়িটা আবার ফেরত পেলেন কি করে?'

'প্রথমে ভেবেছিলাম কোন ছেলে-ছোকরার কাজ। গাড়ি চুরি করে নিয়ে গেছে খানিকক্ষণ চালিয়ে মজা করার জন্যে। কিন্তু থানার সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় দেখি সামনের চত্বরে দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে আমার গাড়িটা। নো-পার্কিং জোনে গাড়ি পার্ক করার অপরাধে তাতে একটা টিকেট লাগিয়ে দিয়েছে হেরিং গেকো।'

'তারমানে এমন কোথাও ফেলে গিয়েছিল চোর, যেখানে গাড়ি পার্ক করা বেআইনী,' কিশোর বলল। 'টিকেটটা আছে আপনার কাছে?'

'না,' তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিল কেগ। 'ফাইনের টাকাটা সহ টিকেটটা গেকোর ডাকবাক্সে ফেলে দিয়েছি। মেজাজ তখন কি পরিমাণ তিরিক্ষি হয়ে গিয়েছিল কল্পনা করতে পারবে না। গাড়ি চুরি গেল আমার। হেঁটে শহরে ফিরতে হলো। ফিরে দেখি থানায়, এবং টিকেট লাগানো। কড়কড়ে বিশটা ডলার গচ্চা দিতে হলো। এখানে কি কোন আইন-কানুন আছে!'

'থাকবে। খুব শীঘ্রি।'

'দেখো,' কেগ বলল, 'আমি কোন উৎপাত চাই না। বিশ্বাস করো, কাউকে কিডন্যাপ করিনি আমি। কে করেছে তা-ও জানি না। বিশ্বাস করো আর না-ই করো, গাড়িটা যে চুরি হয়েছিল আমার, এ কথা ঠিক।'

'ঠিক আছে, করলাম,' কিশোর বলল। 'এখন ডাকুন পুলিশকে। আমাকে অ্যারেস্ট করানোর জন্যে। আপনার কথা আপনি বলবেন। আমাদের কথা আমরা বলব। দেখি পুলিশ কারটা বিশ্বাস করে।'

'বাদ দাও পুলিশ! বিরক্তির চূড়ান্ত হয়ে গেছি আমি। ওই গেকো গিরগিটিটার কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায়, ততই ভাল।'

'তা বটে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ওর ছায়া মাড়ালেও ঝামেলা!'

প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল আবার কাছাকাছি কোথাও। বিদ্যুৎ-শিখার আকাশ জুড়ে ছুটে বেড়ানোর বিরাম নেই। বজ্রপাতের ভয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল কেগ।

'কি বুঝলে?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কিডন্যাপিঙের সঙ্গে জড়িত থাক বা না থাক, লোকটা কোন কিছু লুকাচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার।'

কিশোরের জবাব শুনে চোখ বড় বড় করে তাকাল রবিন।

পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে দেখাল কিশোর। 'চিনতে পারো?'

কয়েকটা সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে জবাব দিল রবিন, 'জিনারটা না? জন্মদিনে পারকার আঙ্কেল যেটা দিয়েছিলেন তাকে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'কোথায় পেলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কেগের ঘরে। টেবিলের ওপর। নিশ্চয় জিনাই রেখে গেছে। এত বেশি

জিনিসপত্র ছড়ানো রয়েছে, ওসবের মধ্যে এটা আলাদা করে চোখে পড়েনি কেগের। এখন আমাদের জানতে হবে কেগের সঙ্গে কেইনের সম্পর্কটা কোথায়?'

বৃষ্টির বিরাম নেই।

আকাশের দিকে তাকাল একবার কিশোর। 'চলো, আর এখানে কোন কাজ নেই। মুসা নিশ্চয় অবাক হয়ে যাচ্ছে, এতক্ষণ কি করছি আমরা ভেবে।'

দশ

প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে শহরে ফিরে চলেছে ওরা।

গাড়ি চালাচ্ছে মুসা। ফুল স্পীডে চলছে উইন্ডশীল্ড ওয়াইপার। বৃষ্টি মেশানো ঝড়ো বাতাসের ঝাপটা বার বার এসে আঘাত হানছে গাড়ির গায়ে। সঙ্গে করে নিয়ে আসছে বালির কণা, কুটো-পাতা।

পেলিক্যান আর কারলুর কোণে এনে গাড়ি রাখল মুসা। কুপারের রেস্টুরেন্টের কাছে। খাওয়া দরকার।

বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে মাথা নুইয়ে একদৌড়ে ঘরে ঢুকল তিনজনে। খাবারের অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করছে এই সময় দরজায় দেখা দিল ডেপুটি গেকো। ভারিক্কি চালে এগিয়ে এসে দাঁড়াল ওদের টেবিলের কাছে।

'তোমাদেরকেই খুঁজছি। তোমাদের সঙ্গে কথা আছে আমার···' কিশোর আর রবিনের কাদায় মাখামাখি হয়ে থাকা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল গেকো। 'কাদার মধ্যে কুস্তি করে এসেছ নাকি?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'বৃষ্টির সময় সাগরকে কেমন লাগে, দেখতে গিয়েছিলাম।'

গোটা দুই হাঁচি দিল গেকো। হাত ঢোকাল প্যান্টের পকেটে। 'দেখাদেখির কাজ আমিও খানিকটা করে এসেছি। ওয়াইল্ড পাম মোটেলে গিয়েছিলাম। আরেকটা নৌ-দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে ওরা।'

'দুর্ঘটনা?' কুঁচকে গেল কিশোরের ভুরু। 'ওরা ঘটাবে কেন? ইঞ্জিনের মধ্যে বোমা পেতে রেখে এসেছিল কেউ, স্টার্ট দিলেই যাতে ফাটে।'

'খুব বেশি জেমস বন্ডের ছবি দেখো,' একটা টুল টেনে নিয়ে ওদের কাছে বসে পড়ল গেকো।

'কেন, আপনার কি ধারণা? পেট্রোলের গ্যাস জমে ইঞ্জিনটা উড়ে গেছে?'

'বাস্তব কথা ভাবলে সেটাই স্বাভাবিক,' মহাবিজ্ঞের ভঙ্গিতে জবাব দিল গেকো। 'পুরানো বোট। পুরানো ইঞ্জিন। এ ধরনের ঘটনা তো ঘটতেই পারে।'

'হুঁ, তা তো পারেই,' ফোড়ন কাটল কুপার। 'কিছুদিন ধরে যে হারে "স্বাভাবিক" সব দুর্ঘটনা ঘটছে দ্বীপটাতে, আর কিছুদিন এ ভাবে চললে এর নাম বুক অভ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে উঠে যাবে।'

'ওগুলো যে দুর্ঘটনা নয়, এমন কোন প্রমাণ আছে তোমার কাছে?' খেঁকিয়ে

উঠল গেকো।

'সে-রাতে আমার প্রোপেন ট্যাংকটা যে ফুটো হয়ে গেল, ওটার সঙ্গে যুক্ত টিউবগুলোকে টেনে খুলে বাঁকাচোরা করে ফেলে রাখা হলো, সেটাও নিশ্চয় দুর্ঘটনা?'

'র‍্যাকুনে করেছে,' খোঁচা মারল কিশোর।

'কিংবা অ্যালিগেটরে,' গেকো বলল। 'সারা বছরই জ্বালায় ওগুলো, জানোই তো।'

'তারমানে আপনি বলতে চান, জিনাকেও র‍্যাকুনে কিংবা অ্যালিগেটরে ধরে নিয়ে গেছে?' শীতল কণ্ঠে বলল কিশোর।

'মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ,' টুলের ওপর ঘুরে বসে ওদের মুখোমুখি হলো গেকো। 'ওয়াইল্ড পামে ক্রুকের ভাতিজির কাছে শুনলাম খবরটা।'

'ইভা?' শঙ্কিত হয়ে উঠল কিশোর। আবার কোন্ খারাপ খবর শোনাবে!

'হ্যাঁ,' হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল গেকো। 'কিডন্যাপিং-ফিডন্যাপিং কিছু না। তোমাদের বান্ধবী এখন মহানন্দে আরেক জায়গার সমুদ্র সৈকতে রোদ পোয়াচ্ছে।'

'কি করে জানলেন?'

'চিঠি পাঠিয়েছে। ওয়াইল্ড পামের ঠিকানায়। বিশ্বাস না হলে নিজেরাই গিয়ে দেখে এসো।'

খাবার তৈরি হয়ে গেছে। নইলে তক্ষুণি উঠে চলে যেত ওরা। কোনমতে নাকে-মুখে খাবারগুলো গুঁজে, কুপারের বিল মিটিয়ে দিয়ে গাড়ির দিকে ছুটল তিনজনে।

ওয়াইল্ড পামের সামনে মুসা গাড়িটা রেখেও সারতে পারল না, ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে পড়ল কিশোর। দৌড় দিল অফিসের দিকে।

কিশোরকে দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল ইভা। ড্রয়ার থেকে নীরবে বের করে দিল চিঠিটা। পোস্টকার্ডে লিখে পাঠিয়েছে জিনা।

'জিনার হাতের লেখা, তাতে কোন সন্দেহ নেই,' দেখতে দেখতে বলল কিশোর। দুই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা আর রবিন। সিল-ছাপ্পর দেখে বলল, 'দু'দিন আগে মিয়ামি থেকে পোস্ট করা হয়েছে।'

'আমাকে না জানিয়ে মিয়ামিতে চলে গেছে জিনা, বিশ্বাসই হচ্ছে না আমার!' ইভা বলল। 'অথচ আমরা এদিকে…'

'যদি গিয়েই থাকে, ইচ্ছে করে যায়নি, আমি শিওর,' কিশোর বলল। 'তা ছাড়া এটা কিডন্যাপারদের চালবাজিও হতে পারে। ওকে দিয়ে লিখিয়ে আমাদের বোঝাতে চেয়েছে লং আইল্যান্ড থেকে নিজে নিজেই মিয়ামিতে চলে গেছে সে। আর যদি জিনাই পাঠিয়ে থাকে, তাহলে কার্ডটা পাঠানোর পেছনে কোন উদ্দেশ্য আছে তার। কিছু একটা বোঝাতে চেয়েছে। খোলা কার্ডে খোলাখুলি লিখলে শত্রুদের চোখে পড়ে যেতে পারে। সে-জন্যে ইঙ্গিত দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে। ও লিখেছে: জায়গাটা দারুণ। গতবারের চেয়ে ভাল লাগছে। ইস্, তোমরা থাকলে খুব মজা হত। জিনা।' মুখ তুলে তাকাল সে। 'বুঝতে পারছ কিছু?'

বিমূঢ়ের মত মাথা নাড়ল মুসা, 'কিচ্ছু না। অতি সাধারণ একটা চিঠির মতই লাগছে।'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'তুমি বুঝেছ?'

ভাবছে রবিন। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখচোখ। 'গতবার মিয়ামিতে যায়ইনি সে! লং আইল্যান্ডে গিয়েছিল!'

'ঠিক,' হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। 'এটা দিয়েই বোঝাতে চেয়েছে যে যা লিখেছে, তার অন্য অর্থ আছে। কার্ডের ছবিটার ক্যাপশন লিখেছে দেখো: মিয়ামির সমুদ্রতীর কখনও ঘুমায় না।' চোখের পাতা সরু করে তাকাল কিশোর। 'এর মধ্যেও সূত্র আছে নিশ্চয়। ছবিটার কোন মানে না-ও হতে পারে অবশ্য। হাতের কাছে যা পেয়েছে তাতেই লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে। সূর্যাস্তের দৃশ্য কিংবা ডলফিনের ছবিওয়ালা কার্ড পেলেও হয়তো তাতেই লিখত।'

'কি জানি!' চিন্তিত ভঙ্গিতে কপাল চুলকাল রবিন। 'সূত্রের পর সূত্র দিয়ে যাচ্ছে জিনা। গাড়ির ছবি, কেইনের বাড়িতে ফ্রিজে তার বাবার ছবি, কেগের বাড়িতে ঘড়ি, এখন এটা! তারপরেও এগোতে পারছি না আমরা!'

'আজ রাতে কেইনের বাড়িতে ঢুকব আমরা, পার্টির সময়,' কিশোর বলল। 'পুরো বাড়িটাতে খুঁজব। যদি ওখানে জিনাকে না পাই, তাহলে শিওর হয়ে যাব, ওকে মিয়ামিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সমুদ্রতীরের কোন বাড়িতে আটকে রেখেছে। মিয়ামির সমুদ্রতীর কখনও ঘুমায় না–কথাটা লেখার এই একটাই অর্থ হতে পারে!'

এগারো

ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। সকালের মত নেই আর। তবে আকাশে ভারী মেঘ জমে আছে এখনও। যে কোন সময় আবার শুরু হবে।

কেইনের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামাল মুসা। সে আর কিশোর এসেছে। রবিনকে রেখে এসেছে মোটেলে, ইভার সঙ্গে। কেইনের বাড়িতে ঢুকলে বিপদ ঘটার একশো ভাগ সম্ভাবনা। সবাই আটকা পড়লে উদ্ধারের উপায় থাকবে না আর। রবিনকে রেখে এসেছে সে-কারণে। বলে এসেছে, রাত বারোটার মধ্যে ফিরে না গেলে প্রথমে যেন মিয়ামি পুলিশের কাছে যায় রবিন, কারণ ডেপুটি হেরিং গেকোকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। তারপর রকি বীচে ফোন করে ওমর ভাইকে।

কারলু রোডে সারি সারি নানা ধরনের চকচকে গাড়ির পেছনে ভ্যানটা রাখল মুসা। একপাশে কেইনের বাড়ির দেয়াল। ওটা ঘেঁষে রাখা হয়েছে গাড়িগুলো।

বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসছে হাসি আর বাজনার শব্দ।

সাগরের দিক থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে যেন ঘন কুয়াশা। ফ্লাডলাইট জ্বেলে দিতে হয়েছে কেইনকে। তারপরেও সুবিধে হচ্ছে না। বাড়িটার খুব সামান্য

জায়গাই স্পষ্ট হয়েছে তাতে। স্বস্তিই বোধ করছে কিশোর। কুয়াশার মধ্যে-গাছপালার ভেতরে সহজে ওদেরকে চোখে পড়বে না।

পার্টির উপযুক্ত পোশাক পরে এসেছে দু'জনে। উল্টোপাল্টা পোশাকে এসে মেহমানদের নজরে পড়ে গেলে ধরা পড়ে যাবে সহজেই। কিশোর পরেছে স্পোর্ট কোট আর স্ল্যাকস। মুসা গায়ে দিয়েছে উজ্জ্বল রঙের প্রিন্টওয়ালা শার্ট। পরনে জিনস।

ভেতরে ঢোকার আগে শেষবারের মত সাবধান করল কিশোর, 'দেখো, কারও সন্দেহ হয়, এমন আচরণ কোরো না। সবাই যাতে ভাবে আমরাও দাওয়াত পেয়েই এসেছি।'

হাসল মুসা, 'তা করব না। তবে সামনে খাবার পড়ে গেলে খানিকটা তো চেখে দেখতেই হবে, কি বলো? না খেলেই বরং গেস্টরা সন্দেহ করবে।'

'কোন রকম ঝুঁকি নেবে না। আমাদের উদ্দেশ্য হবে কাজ সেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়া।'

ড্রাইভওয়ে ধরে আগে আগে হেঁটে চলল কিশোর। পেছনে মুসা।

সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন লোক। কিন্তু তাদের কাউকেই কেইনের দুই সহকারীর মত লাগল না। মেহমানই হবে ওরা।

সামনের হলঘরে ঢুকে লোকজন দেখে ফিসফিস করে কিশোরের কানের কাছে বলল মুসা, 'দু'শো জনের কম হবে না।'

'এনডি আর কোরির ব্যাপারে সতর্ক থাকো,' কিশোর বলল।

'কোথায় ওরা? দেখছি না তো।'

'এখানে দেখা যাচ্ছে না বলে যে বাড়িতে নেই, সেটা ভাবা ঠিক হবে না।' ওখানে দাঁড়িয়েই হলঘর আর লিভিং রুমের সমস্ত জায়গায় চোখ বোলাল কিশোর। 'নীরা লেভিনের সামনেও পড়া চলবে না আমাদের।'

রান্নাঘরের দিকে এগোল দু'জনে। চারপাশে নজর রাখতে লাগল মুসা, কিশোর এগিয়ে গেল রেফ্রিজারেটরটার দিকে।

ছবিগুলো ভালমত দেখে এসে বলল, 'ছবিটা নেই।'

'সরিয়ে ফেলল নাকি?' রেফ্রিজারেটরটার দিকে তাকাল মুসা। 'সবই ঠিকঠাক আছে, কেবল ছবিটা সরিয়েছে।'

'তারমানে নজরে পড়ে গেছে ওদের,' কিশোর বলল। 'ঠিক আছে, এক কাজ করা যাক। ভাগাভাগি হয়ে গিয়ে খুঁজতে থাকি আমরা। জিনা এ বাড়িতে আছে কিনা, বোঝা দরকার। থাকলে কোথায় আছে জানতে হবে। তুমি এই তলাতেই খোঁজো, আমি দোতলায় যাচ্ছি। ফোন বেজেছিল ওখানে, মনে আছে? কেইনের অফিস-টফিস থাকতে পারে।'

সিঁড়ির দিকে এগোল সে। কে যেন ডেকে বলল তাকে, 'আই, কোথায় যাচ্ছ? কেইন এখনই চলে আসবে।'

'তাঁর একটা মেসেজ আছে, সেটাই দিতে যাচ্ছি,' ফিরে তাকাল না কিশোর। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে। দ্রুত ভাবনা চলেছে মগজে। একটা সেকেন্ডও আর দেরি না করে একেক লাফে কয়েকটা করে সিঁড়ি টপকে দোতলায় উঠে এল।

শূন্য হলঘর। ডানে ঘুরল সে। শেষ মাথায় চলে এল। তিনটে বেডরুম আর একটা বাথরুম পেরোল। ওগুলোতেও কেউ নেই।

মুসা তখন লিভিং রুমের এক মাথার দিকে এগিয়ে চলেছে। শেষ মাথার হলে এসে পৌঁছল। ওটা ধরে এগোলে মস্ত একটা বাথরুম, গোটা দুই বেডরুম আর একটা বসার ঘরে যাওয়া যায়।

একটা বেডরুমে ঢুকে বড় একটা দেয়াল আলমারি খুলে দেখল। বাথরুমে খুঁজল। নেই কেউ। ঘরটাও কেউ ব্যবহার করে বলে মনে হলো না।

দ্বিতীয় বেডরুমটাও প্রথমটার মতই। তবে আলমারিটা একেবারে খালি নয়। ছোট একটা বাক্স পাওয়া গেল। তাতে জাপানী ভাষায় কি যেন লেখা। তার ভেতরে কতগুলো ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ দেখা গেল। ডায়োড, ট্র্যানজিস্টর, কম্পিউটারের চিপস এ সব জিনিস।

শেষ ঘরটায় বড় একটা টেবিলে প্রচুর জিনিসপত্র ছড়ানো। তার মধ্যে লাল একটা সানগ্লাস দেখতে পেল সে। জিনিসটা পরিচিত মনে হলো। অবিকল এ রকম একটা সানগ্লাস আছে জিনার।

তুলে নিয়ে পকেটে ভরতে যাবে ঠিক এই সময় দরজার কাছ থেকে শোনা গেল এনডি টাওয়ারের কণ্ঠ, 'অ্যাই, কে তুমি?

সানগ্লাসটা প্রথমে পকেটে ভরল মুসা। তারপর আস্তে করে ঘুরে দাঁড়াল। 'আমি একজন গেস্ট!'

'তুমি!' চিৎকার করে উঠল এনডি। 'আবার ঢুকেছ এখানে!'

খেপা ষাঁড়ের মত মাথা নিচু করে ছুটে গেল মুসা। মাথা দিয়ে প্রচণ্ড গুঁতো মারল এনডির পেটে। ওর ভয়ানক শক্ত খুলির এ রকম আঘাতে বাঘ কাবু হয়ে যাওয়ার কথা, আর এনডি তো মানুষ হুঁক করে একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে। মেঝেতে পড়ে গেল সে।

কোন দিকে আর না তাকিয়ে হলরুম ধরে দৌড় মারল মুসা।

ওপরতলায় কিশোর তখন এক বেডরুম থেকে আরেক বেডরুমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু জিনার কোন চিহ্নই চোখে পড়ছে না তার।

হল পার হয়ে বাঁয়ে ঘুরল। বাকি আছে দুটো ঘর। ওগুলো দেখা হয়ে গেলেই শেষ হয়ে যাবে। হলের শেষ মাথার দিকে পা বাড়াল সে। কানে এল একটা শীতল কণ্ঠ, '...আরে না, এখন না! আমি আগে আসি। পার্টি শেষ হলেই রওনা দেব। কি বললাম, বুঝেছ?'

ডগলাস কেইনের গলা চিনতে পারল কিশোর।

পা টিপে টিপে দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল সে। কান পাতল দরজায়।

'তোমার কাজ হলো,' তীক্ষ্ণ হয়ে যাচ্ছে কেইনের গলা, 'আমি যা বলি অক্ষরে অক্ষরে শুনবে। কমও না, বেশিও না।'

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থাকার পর চেঁচিয়ে উঠল কেইন, 'তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?' ফোনে কথা বলছে সে, বোঝা গেল। 'আমি বলছি আমি এসে যা করার করব। দেখে যেন দুর্ঘটনা মনে হয়। সেজন্যেই তো ওদের খবর দিতে বললাম তোমাকে। দিয়েছ, না তা-ও দাওনি?'

গভীর আগ্রহে দম বন্ধ করে শুনছে কিশোর। তার মনে হচ্ছে, ওদের কেসটার সঙ্গে এ সব কথার কোন সম্পর্ক আছে।

'আরে গাধাটাকে তো কোনমতেই বোঝানো যাচ্ছে না!' আরও জোরে চিৎকার করে উঠল কেইন। 'তোমার কি ধারণা দুনিয়াসুদ্ধ লোকের মাথায় তোমার মত গোবর পোরা? তুমি গায়েব করে দেবে, আর সবাই একবাক্যে বলবে–আহা, আহা, গায়েব হয়ে গেল! কেউ কোন খোঁজ নেবে না? এখন বুঝতে পারছি ড্যাগো কেন তোমাকে আমার কাজ করতে পাঠিয়েছে। পাঠিয়ে আসলে জানে বেঁচেছে। তোমার হাঁদাপনা ও আর সহ্য করতে পারছিল না। দেখো, পিকো, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমি ড্যাগোর মত তোমাকে আর কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করব না। আমাকে খুশি করতে পারলে ভাল, না পারলে কানটা ধরে বের করে দেব। আর আমি যাদের বের করে দিই, পরে তাদের কি হয় জানো তো? হয় অ্যালিগেটরের পেটে যায়, নয়তো হাঙরের খাবার হয়। এইমাত্র তুমি যে পদ্ধতিতে গায়েব করতে চাইলে।'

দড়াম করে ফোনটা রেখে দিল কেইন। এত জোরে আছাড় দিয়ে রাখল, দরজার বাইরে দাঁড়িয়েও শুনতে পেল কিশোর।

নিচতলার চেঁচামেচি মনোযোগ ফিরিয়ে নিল তার। হট্টগোলটা হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। কেইনের কানেও যাবে নিশ্চয়। দেখতে বেরোতে পারে। তাড়াতাড়ি দরজার কাছ থেকে সরে যেতে লাগল সে। কিন্তু কোথাও লুকিয়ে পড়ার আগেই ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল কেইন। কিশোরকে দেখে ফেলল।

'অ্যাই! কে, কে!' চিৎকার করে উঠল কেইন। 'ও, তুমি! এনডি! কোরি! জলদি এসো!' দৌড়ে এসে কিশোরের কোট চেপে ধরল সে।

কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। দৌড় মারল কিশোর। হ্যাঁচকা টান লেগে কাপড় ছিঁড়ে গেল। ফিরেও তাকাল না সে। সিঁড়ির দিকে ছুটল। কানে আসছে কেইনের চিৎকার। লোকজন ডাকছে সে।

জমে উঠেছে পার্টি। কিন্তু হট্টগোল যেন চরমে পৌঁছাল হঠাৎ করেই। ব্যাপারটা ভাল লাগল না কিশোরের।

'পালাচ্ছে! পালাচ্ছে!' কানে এল চিৎকার।

প্রথমে ভাবল, তার কথাই বলা হচ্ছে। চারপাশে তাকিয়ে কাউকে না দেখে বুঝল অন্য কারও কথা বলছে। জানালার বাইরে চোখ পড়তে দেখল লন ধরে সৈকতের দিকে ছুটে যাচ্ছে একটা ছায়ামূর্তি। কুয়াশার জন্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

মুসা!

পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে এনডি। বিপদে পড়ে গেছে মুসা।

বিপদে কিশোর নিজেও পড়েছে।

'থামাও! থামাও ওকে!' সিঁড়ির মাথায় শোনা গেল কেইনের চিৎকার।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে গেস্টদের ওপর নজর বোলাল একবার কিশোর। এদিক ওদিক তাকিয়ে সবাই বোঝার চেষ্টা করছে গণ্ডগোলটা কোথায়।

কিন্তু কিশোরকে তাড়া করতে গিয়ে যখন দু'জন গেস্টকে ধাক্কা মেরে একটা

কাঁচের বাক্সের ওপর ফেলে দিল কেইন, হাসির হুল্লোড় উঠল।

হাসিটা থেমে গেল গুলির শব্দে।

ঝট করে একটা টেবিলের আড়ালে বসে পড়ল কিশোর। পরক্ষণেই বুঝল, গুলিটা তাকে লক্ষ্য করে করা হয়নি। শব্দ এসেছে বাইরে থেকে। মুসার জন্যে দুশ্চিন্তায় বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল তার।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার। কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা দরজা লক্ষ্য করে দিল দৌড়।

মুসা তখন সৈকতে পৌঁছে গেছে। আলগা বালি মাড়িয়ে ছোটা ভীষণ কঠিন। এগোনোও যায় না। তা ছাড়া অল্পেতেই পরিশ্রান্ত হয়ে যেতে হয়।

পেছনে তাড়া করে আসছে এনডি। বালিতে সে-ও দৌড়াতে পারছে না ঠিকমত। কিন্তু তার হাতে পিস্তল আছে। আরেকবার গুলি করল সে।

মুসার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলি।

চিৎকার করে উঠল এনডি, 'থামো বলছি! পরের বার কিন্তু মাথা সই করে মারব!'

মুসা বুঝল, দু'বারই ইচ্ছে করে মিস করেছে এনডি। তাকে থামানোর জন্যে।

লাফ দিয়ে চত্বরে নেমে মুসারা যেদিকে গেছে সেদিকে ছুটল কিশোর। সামনে লনের মধ্যে চেয়ার পাতা। সরানোর সময় নেই। লাফ দিয়ে একটা চেয়ার পেরোল।

কিছুদূর এগোতেই দেখল, খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি মুসা। দাঁড়িয়ে গেছে। পেছনে এগিয়ে যাচ্ছে এনডি। নিশ্চয় পিস্তলের ভয় দেখিয়ে থামিয়ে দেয়া হয়েছে মুসাকে।

পেছন থেকে এনডিকে কাবু করতে ছুটল কিশোর। কিন্তু তার পেছনেও লোক লেগে গেছে। কোরি ছুটে আসছে ধরার জন্যে। তার পেছনে চেঁচাতে চেঁচাতে আসছে কেইন।

ছুটতে ছুটতেই ফিরে তাকাল একবার কিশোর। বুঝল, আর ছুটে লাভ নেই। ধরা পড়ে গেছে। কারণ, কেইন আর কোরি–দু'জনের হাতেই উদ্যত পিস্তল।

তা ছাড়া, কুকুরগুলোকেও ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বাঘের মত গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে ওগুলো।

বারো

কজওয়ে ধরে বেরিয়ে এল গাড়িটা।

তারপর যে রাস্তাটা ধরল, দেখেই বুঝতে পারল কিশোর, ফ্লোরিডার বিখ্যাত অ্যালিগেটর অ্যালি'র দিকে যাচ্ছে।

মুসাকে জানাল সে-কথা।

বিড়বিড় করে মুসা বলল, 'এত রাতে অ্যালিগেটরগুলো এখন ঘুমিয়ে থাকলেই বাঁচি।'

'অ্যাই, চুপ! কোন কথা নয়,' সামনের প্যাসেঞ্জার সীট থেকে ধমক দিল কোরি।

গাড়ি চালাচ্ছে এনডি।

পেছনের সীটে হাতকড়া লাগিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে মুসা আর কিশোরকে। হাতকড়ার একটা মাথা হাতের কব্জিতে, অন্য মাথা গাড়ির ফ্রেমে আটকানো। কোনমতেই ছুটানো সম্ভব নয়, একমাত্র চাবি ছাড়া। কাজেই ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা না করে চুপচাপ সুযোগের অপেক্ষায় বসে রইল দু'জনে।

সৈকত থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রথমে বাগানের একটা ছাউনিতে আটকে রাখা হয়েছিল ওদের। গেস্টরা যাতে না দেখে। নিশ্চয় ওদের কাছে গিয়ে কৈফিয়ত দিয়েছে কেইন, দুটো চোর ঢুকেছিল চুরি করতে। পালিয়ে গেছে।

পার্টির পর গাড়িটাতে তুলে দেয়া হয়েছে ওদের। দ্বীপের বাইরে দূরে কোথাও সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। জিনাকেও বোধহয় এ ভাবেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কেইনের গাল আইল্যান্ডের বাড়িতে যে নেই জিনা, এ ব্যাপারে শিওর এখন ওরা। তবে নেয়া হয়েছিল ওখানে, তার প্রমাণ রেফ্রিজারেটরে লাগানো ছবিটা, আর টেবিলে রাখা চশমা। হয়তো ওঘরেই প্রথমে আটকে রাখা হয়েছিল ওকে। সে-জন্যেই চশমাটা ফেলে আসতে পেরেছে।

চলতে চলতে গাড়ির গতি কমে গেল হঠাৎ। কারণটা জানার জন্যে দু'জনেই বাইরে তাকাল ওরা। অতি সরু একটা রাস্তায় গাড়ি ঢুকিয়ে দিল এনডি। দুই পাশেই বিশাল জলাভূমি। অন্ধকারে পানি চেনা যাচ্ছে না। তবে আছে। ওগুলোতে কোন্ কোন্ প্রাণীর বাস, কল্পনা করে শিউরে উঠল কিশোর। জোঁক আছে। নানা ধরনের বিষাক্ত কীটপতঙ্গ আছে। আর আছে ঝাঁকে ঝাঁকে অ্যালিগেটর। কোন মতে যদি চাকা পিছলে ওই জলায় গিয়ে পড়ে গাড়িটা, আর উঠতে পারবে না। ভয়াবহ কাদায় আটকে যাবে। পুরোটা যদি ডুবে যায়, তাহলে জ্যান্ত কবর হবে। আর যদি না যায়, অ্যালিগেটরের খাবার হবে।

এটা কোরি কিংবা এনডির না জানার কথা নয়। তাহলে এ পথ ধরল কেন ওরা? নিশ্চয় পুলিশের ভয়ে। সামনে সম্ভবত চেক পোস্ট জাতীয় কিছু আছে। দুটো ছেলেকে গাড়ির পেছনে হাতকড়া লাগিয়ে কেন আটকে রাখা হয়েছে, অবশ্যই জানতে চাইবে ওরা। সে-সব এড়ানোর জন্যেই এই নির্জন বিপজ্জনক রাস্তা ধরেছে এনডি।

অতিরিক্ত সাবধান থেকেও চাকা সোজা রাখতে পারছে না সে। বৃষ্টিতে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে থাকার কারণে। সামনের ডান পাশের চাকাটা মূল রাস্তা থেকে সরে গেল কাঁচা মাটিতে। প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়ে কাত হয়ে গেল গাড়ির একপাশ।

'শক্ত হয়ে বসে থাকো! নড়বে না কেউ!' চিৎকার করে উঠল এনডি। স্টিয়ারিং চেপে চাকাটাকে তুলে আনার আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করল।

মুক্ত হাতটা দিয়ে সামনের সীটের পেছনটা খামচে ধরল কিশোর। টের পাচ্ছে, উঠে আসার বদলে ক্রমশ রাস্তা থেকে নেমে যাচ্ছে চাকাটা।

আর মাত্র কয়েক ইঞ্চি সরে গেলেই শেষ। কোনমতেই আর তোলা যাবে না। জলাভূমিতে পড়ে যাবে গাড়ি।

শেষ চেষ্টা করল এনডি। লো গীয়ারে দিয়ে গ্যাস পেডাল পুরো চেপে ধরল ফ্লোরবোর্ডের সঙ্গে। একই সঙ্গে গায়ের জোরে যতটা সম্ভব বাঁয়ে ঘুরিয়ে দিতে লাগল স্টিয়ারিং।

সাংঘাতিক ঝাঁকি। আরও কয়েক ইঞ্চি পিছলে গেল চাকা। তবে সামনে না গিয়ে সরে যেতে লাগল বাঁ পাশে। উঠে চলে আসতে শুরু করল। আর গোটা কয়েক ঝাঁকুনি আর চাকা পিছলানোর পর রাস্তায় উঠে এল পড়ে যাওয়া চাকাটা।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলে কপালের ঘাম মুছল এনডি।

গাড়ির আরোহীরা আবার স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নিতে শুরু করল।

আর কোন অঘটন ঘটল না। রাস্তাটা নিরাপদেই পার হয়ে এল গাড়ি। বড় রাস্তায় উঠল। যেন ক্ষতিটা পুষিয়ে নেয়ার জন্যেই দ্বিগুণ গতিতে গাড়ি ছোটাল এনডি।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক গাড়ি ছোটানোর পর গন্তব্যে পৌঁছল ওরা। মিয়ামিতে অনেক আগেই ঢুকে পড়েছে। এখন কোথায় এল, সাইনবোর্ড দেখে বুঝতে পারল কিশোর। বিসকেইনি বে। •

প্রচুর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গাছপালা দেখা যাচ্ছে।

আরও কয়েক মিনিট চলার পর বড় একটা দেয়াল ঘেরা বাড়ির গেটের কাছে এসে থামল গাড়ি। ভেতরে গাছপালা, ঝোপঝাড়ের প্রায় জঙ্গল হয়ে আছে।

কাউকে গেটের কাছে আসতে দেখা গেল না। অথচ খুলে গেল গেটটা।

'খাইছে!' বিড়বিড় করল মুসা। 'ভূতের বাড়ি নাকি?'

গাড়ি ঢোকাল এনডি। লম্বা ড্রাইভওয়ে চলে গেছে সুদৃশ্য একটা গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত। কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল চত্বরের একপাশে। বেশ খানিকটা দূরে, সীমানার উত্তর প্রান্তে সিমেন্টে বাঁধানো বেদির ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা হেলিকপ্টার। চিনতে পারল কিশোর। কেইনের হেলিকপ্টারটা। তারমানে ওদেরকে গাড়িতে করে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে হেলিকপ্টারে করে এসে বসে আছে।

কয়েক গজ এগিয়েই থেমে গেল গাড়িটা। একটা বড় গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। হাতে ছোট রিমোট কন্ট্রোলের মত একটা যন্ত্র। গেটের দিকে তুলে বোতাম টিপতেই আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল গেটের পাল্লা।

মুসার ভূত রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে খোলে, বন্ধ হয় গেটটা।

গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল লোকটা। নিচু হয়ে তাকাল। গাড়ির ভেতরটা দেখল। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে যেতে ইশারা করল এনডিকে।

গাড়ি-বারান্দার সামনে এনে গাড়ি রাখল এনডি। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে দরজা খুলে নামল। তার আগেই নেমে পড়েছে কোরি। পকেট থেকে চাবি বের করে খুলে দিল কিশোরের হাতকড়া। এনডির হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। মুসার হাতকড়াও খুলে দেয়া হলো। তারপর দু'জনকেই বেরিয়ে আসতে বলা

হলো।

মুসা আর কিশোর দু'জনের পিঠেই পিস্তল ঠেসে ধরে ঘরে ঢোকানো হলো।

বিশাল বড় হলঘর। দুই পাশের দেয়াল ঘেঁষেই দুটো মস্ত মাছের ট্যাংক রাখা। পাঁচশো গ্যালন পানি ধরে একেকটাতে।

'আপনার বস্ মনে হয় পুঁটি মাছ খুব পছন্দ করে?' একটা ট্যাংক দেখিয়ে এনডির সঙ্গে রসিকতা করল কিশোর।

'তা তো করেই,' মুখ গোমড়া করে জবাব দিল এনডি। 'বাঁয়েরটাতে আছে একটা স্টিং রে। আর ডানেরটাতে কয়েক ডজন পিরানহা।'

'বাপরে, সাংঘাতিক হবি তো। খুনে মাছ পোষে।'

'খুনে জিনিসই আমার পছন্দ,' কথা বলে উঠল একটা কণ্ঠ। ছায়ার মধ্যে থেকে লম্বা লম্বা পায়ে বেরিয়ে এল ডগলাস কেইন। 'পিতপিতে মাছ পুষে মজা নেই। ঠিকমতই তাহলে আনতে পেরেছ, এনডি। দেরি দেখে আমি তো চিন্তায়ই পড়ে গিয়েছিলাম। যা পিছলা না এগুলো। ভয় পাচ্ছিলাম পালিয়ে না যায়।'

'নাহ্, যাবে কোত্থেকে,' জবাব দিল কোরি। 'হাতকড়া খোলা কি আর অত সহজ।'

কথাবার্তা শুনে পাশের লিভিং রুম থেকে বেরিয়ে এল গাট্টাগোট্টা এক লোক। মাথায় কোঁকড়া চুল। মুখটা কেমন চারকোনা। বড় বড় দাঁত। কাছে এসে দাঁড়াল। মুসা আর কিশোরের আপাদমস্তক দেখে বলল, 'এই দুটো ছেলেই এত নাকানিচুবানি খাওয়াচ্ছিল তোমাদের?'

হাসল কেইন। 'অত সহজ মনে কোরো না ওদের। খোঁজ-খবর নিয়েছি আমি। কি জেনেছি জানো? শুনলে ভাল লাগবে না তোমার। ওরা কারও পেছনে লাগলে তার সর্বনাশ না করে ছাড়ে না। কেউ রেহাই পায়নি ওদের হাত থেকে।'

'এতটাই…!' কথাটা শেষ করল না লোকটা। এক ভুরু উঁচু করল।

'কিশোর, এর নাম রাগবি ড্যাগো,' পরিচয় করিয়ে দিল কেইন।

শুরু থেকেই লোকটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল কিশোর। কিছু মনে করার চেষ্টা করছিল। মনে হচ্ছিল কোথাও দেখেছে একে। নাম শোনার পর বুঝল কোথায় দেখেছে। পত্রিকায়। ছবি।

'আপনিই ফ্লোরিডার সেই কুখ্যাত গ্যাং লীডার নন তো?' কিশোর বলল। 'বহুবার পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছেন। সারা আমেরিকার পুলিশ আপনাকে খুঁজছে।'

'তুমি জানলে কি করে?' অবাক হলো ড্যাগো।

'জানি বলেই তো গোয়েন্দাগিরি করতে পারি,' জবাবটা এড়িয়ে গেল কিশোর।

'কি বুঝলে?' ড্যাগোর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কেইন। 'বলেছিলাম না, ডেঞ্জারাস ছেলে ওরা। নাম শুনেই চিনে ফেলল তোমাকে। খোঁজ-খবর রাখে। তবে যত বিপজ্জনকই হোক, এবার আর ওদের মুক্তি নেই।' দুই সহকারীর দিকে তাকাল সে। 'এনডি, ওদেরকে আমার জলজ প্রাণীগুলো দেখিয়ে আনো। গরমও যা পড়েছে আজ। মিয়ামির পচা গরম। ইচ্ছে করলে গোসল করার জন্যে পুকুরেও

নামিয়ে দিতে পারো।'

দাঁত বের করে হাসল কোরি। এনডিও হাসল। পিস্তল দেখিয়ে ইশারা করল দুই গোয়েন্দাকে। পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে পেছনের দরজার দিকে এগোতে বাধ্য করা হলো ওদের। তবে তার আগে পিছমোড়া করে হাত বেঁধে নেয়া হলো দু'জনেরই।

ওদিক দিয়েই ঢুকতে দেখা গেল নীরা লেভিনকে। ওকে দেখামাত্র পিস্তল লুকিয়ে ফেলল দুই গুণ্ডা। কিশোর আর মুসার পেছনে এমন করে গা ঘেঁষে দাঁড়াল যাতে ওদের বাঁধন দেখতে না পায়।

থমকে দাঁড়াল নীরা। 'ওরা এখানে কি করছে?'

দ্বিধা করল এনডি। 'কি-কিছু না, ম্যা'ম।...মিস্টার কেইনের অ্যাকোয়ারিয়াম দেখতে চাইল...'

'ওদের নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,' তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে এল কেইন। 'একটু পরেই চলে যাবে ওরা।' নীরার হাত ধরে টান দিল সে। 'এসো।'

'কিছুই তো বুঝতে পারছি না!' চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে নীরা। 'শত্রু থেকে বন্ধু হয়ে গেল কি করে হঠাৎ? তোমার চাকরি নিয়েছে নাকি?'

'ওসব নিয়ে পরে কথা বলব তোমার সঙ্গে,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কেইনের কণ্ঠ। 'এখন যেতে দাও।'

'এগোও,' কিশোরকে ধাক্কা দিল এনডি।

বাইরে দুটো বিশাল সুইমিং পুলের কাছে ওদেরকে নিয়ে আসা হলো।

'সাঁতার কাটতে বলবেন নাকি?' সেগুলোর দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করল মুসা, 'সুইমিং সুট তো ফেলে এসেছি, ভুলে।'

'কোন অসুবিধে নেই,' হেসে জবাব দিল কোরি। 'অনেক আছে আমাদের। ক'টা লাগবে?'

কিশোর লক্ষ করল একটা পুলেও ডাইভিং বোর্ড নেই। পাড়ের চারপাশ ঘিরে মোটা শিকলের বেড়া। অনেক নিচে পানি।

বেশ কিছুটা দূরে বোট হাউস আর জেটি। জেটিতে বাঁধা একটা সাদা বোট। চ্যানেলের বাইরে খোলা সাগরে একটা ইয়ট দেখা যাচ্ছে। বেআইনী কাজ-কারবার করে রাজার হালেই আছে কেইন আর ড্যাগো। হেলিকপ্টার, ইয়ট, কোন কিছুরই অভাব নেই।

কিশোরের গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো লাগাল মুসা। 'কোন্ দিকে তাকিয়ে আছ?'

পুলের দিকে দৃষ্টি ফেরাল আবার কিশোর। বিশাল একটা ত্রিকোণ পাখনা ভেসে উঠেছে একটা পুলের পানিতে। মসৃণ গতিতে ঘুরতে লাগল পুলের কিনার ঘেঁষে।

হাঙর!

হোয়াইট শার্ক!

মানুষখেকো বলে ভয়ানক বদনাম আছে এগুলোর।

আপনাআপনি দ্বিতীয় পুলটার দিকে নজর চলে গেল কিশোরের। ওটাতেও কি হাঙর আছে?

যেন তার মনের কথা পড়তে পেরেই হেসে বলল কোরি, 'ওটাতে কি আছে, ভাবছ, তাই না? যাও, নিজের চোখেই দেখো।'

দ্বিতীয় পুলটার কাছে নিয়ে আসা হলো ওদের। ছোট একটা বাক্সের ভেতরে রাখা সুইচ টিপে দিল এনডি। পানি নিরোধক আবরণে মোড়া বাল্ব জ্বলে উঠল পুলের নিচে। একবার তাকিয়েই শিউরে উঠল কিশোর। মস্ত দুটো অ্যালিগেটর শুয়ে আছে পানির তলায়। আলো দেখে নড়েচড়ে উঠল দানব দুটো। বিকট ভঙ্গিতে হাঁ করে ওপরের দিকে তাকাল একটা। ভঙ্গিটা মোটেও ভাল লাগল না ওর। জানোয়ারগুলো হয়তো ভেবেছে, খাবার নিয়ে আসা হয়েছে।

মনে হয় না মানুষের মাংসে এদেরও অরুচি আছে।

তেরো

কোন একটা পুলের পানিতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে ওদের–ভাবছে কিশোর। যেটাতেই ফেলা হোক, ফলাফল সমান। পাড়ের এত নিচে পানি, কোনমতেই হাত বাড়িয়ে নাগাল পাবে না। ধরে উঠতে পারবে না–যদি ওঠার সময় পায়, যদি তার আগেই ছিন্নভিন্ন করে না ফেলে ওদেরকে ভয়াবহ জানোয়ারগুলো।

ধাক্কা খাওয়ার অপেক্ষাতেই আছে সে আর মুসা। মনে মনে বাঁচার উপায় খুঁজছে।

নড়ে উঠল মুসা।

'উঁহুঁহু!' সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের খোঁচা মারল তার পাঁজরে এনডি। 'ওসব করে কোন লাভ হবে না। ফুটো হওয়া রক্তাক্ত লাশটা তখন ফেলে দেব পুলের পানিতে। হজম করে ফেলবে অ্যালিগেটরেরা।'

ঘড়ি দেখল কোরি। তারপর বলল, 'আসলে, এখুনি তোমাদের মারা হবে না। বসের নির্দেশ নেই। একটু ভয় দেখানো হলো কেবল। তবে বাড়াবাড়ি করলে ভয়টা সত্যে পরিণত হবে, মনে রেখো।'

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। বেঁচে থাকলে মুক্তির সুযোগ থাকবে। জিজ্ঞেস করল, 'কি করতে চান আমাদের নিয়ে?'

খিকখিক করে হাসল কোরি। 'আমাদের বস্ খুব মজার লোক। এসো, দেখাচ্ছি তোমাদের।'

সাগরের উল্টো দিকে বনে ঘেরা একটা জায়গায় ওদের নিয়ে আসা হলো। গাছপালার ভেতরে এক টুকরো খোলা জায়গা। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। মাঝখানে মস্ত একটা তাঁবু। এত বড়, একটা দোতলা বিল্ডিং অনায়াসে ঢেকে দেয়া যাবে ওই তাঁবু দিয়ে।

'খাইছে! এটা কি জিনিস?' চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে মুসা। 'সার্কাস দেখাবে নাকি?'

'তাই মনে হচ্ছে?' হেসে বলল কোরি। 'সার্কাসের তাঁবু নয়। এটা আমাদের

অস্থায়ী গুদাম। বনের মধ্যে বড় বেশি পোকামাকড়ের আড্ডা। খুব জ্বালায়। বেশি বেড়ে গেলে গ্যাস দিয়ে মেরে ফেলা হয় ওগুলোকে। তাতে পোকাও মরে, জিনিসপত্রও নষ্ট হয় না।'

'এখন পোকামাকড় বেড়ে গেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পোকা মারার গ্যাস ছাড়া হবে তাঁবুটাতে,' কোরির কথার খেই ধরল এনডি, দারুণ মজা পাচ্ছে যেন বলতে। ধাতব দুটো সিলিন্ডার দেখাল। তামার একটা 'টি'-এর মত সরু পাইপ দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে সিলিন্ডার দুটোর মুখ। টি'র ছোট দুটো মাথা সিলিন্ডারে লাগানো, লম্বা মাথাটা চলে গেছে তাঁবুর নিচ দিয়ে ভেতরে। 'তাঁবুর সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলে বাতাস আটকে যাবে।' ক্যানভাসের লম্বা লম্বা বেলুনের মত কতগুলো জিনিস দেখাল সে। 'তখন এগুলো দিয়ে তাঁবুর কানাগুলো মাটির সঙ্গে চেপে রাখা হবে।'

'হট ডগ তো মনে হচ্ছে না এগুলোকে,' মুসা বলল।

'বাহ্, এ সময়েও খাবারের চিন্তা,' এনডি বলল। 'সত্যি তোমার স্নায়ু ভীষণ শক্ত। না, হট ডগ নয়। এগুলোকে আমরা বলি স্যান্ড স্নেক। কানাগুলোকে এ জিনিস দিয়ে চেপে দিলে এক বিন্দু গ্যাসও আর বেরোতে পারে না।'

'আর ভেতরে যারা থাকে,' এনডি থামতেই কোরি বলল, 'দশ মিনিটের মধ্যে খতম। জ্যান্ত কোন প্রাণীই আর এরপর বেঁচে থাকতে পারে না।'

'কি জিনিস রাখা হয় তাঁবুটাতে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হাসল এনডি। 'কি জিনিস? ধরো স্মাগলিঙের মাল। দেখবে নাকি? এসো।'

তাঁবুর দরজা দিয়ে ভেতরে নিয়ে আসা হলো ওদের। নানা আকারের প্রচুর বাক্স সাজিয়ে রাখা হয়েছে ভেতরে। বেশির ভাগ বাক্সের গায়েই বার্মিজ আর থাই ভাষায় লেখা দেখতে পেল কিশোর। তার মনে পড়ল, ওই দুটো দেশ, বিশেষ করে মিয়ানমার হলো হেরোইন চোরাচালানিদের স্বর্গরাজ্য। তারমানে মাদকদ্রব্যের ব্যবসা করে কেইন।

তাঁবুর মধ্যে কাঠের তৈরি একটা কেবিন দেখা গেল। ওটাও অস্থায়ী। তবে লোহার ফ্রেম দিয়ে এমন করে নাট-বল্টু লাগিয়ে আটকানো, বেশ মজবুত, বোঝা যায়। দরজার বাইরের দিকে লাগানো লোহার চ্যাপ্টা ডাণ্ডাটা খুলে দিল কোরি। আড়াআড়ি লাগিয়ে দরজা আটকে রাখা হয়েছিল। টান দিয়ে পাল্লা খুলল। তারপর দু'জনকে ঠেলে দিল দরজার অন্যপাশে। পরক্ষণে আবার পাল্লা লাগিয়ে ডাণ্ডা তুলে দিল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার।

'দেখি, ঘোরো তো,' মুসা বলল। 'তোমার হাতের বাঁধনটা খুলতে পারি নাকি। নিজেরটা তো নিজে পারব না।'

'কে? মুসা নাকি?' অন্ধকার থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ।

'জিনা!' একসঙ্গে বলে উঠল কিশোর আর মুসা।

ঘরের এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে আসার শব্দ হলো।

'সত্যি! তোমরা! আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!' দু'জনকেই ছুঁয়ে দেখতে লাগল জিনা।

'বিশ্বাস না হওয়ার কিছু নেই,' কিশোর বলল। 'যে হারে সূত্র রেখে এসেছ, খুঁজে বের করতে বরং দেরিই করে ফেলেছি। আরও আগে বের করা উচিত ছিল।'

'আমাকে যে এখানে আটকে রেখেছে, কার্ডটা দেখে বুঝেছ, না?'

'বুঝলেও নিজে নিজে আসিনি। ওরাই আমাদের এখানে ধরে নিয়ে এসেছে। নাও, এখন বাঁধনগুলো খোলো তো আমাদের। সব কথা পরে শুনব। তা তুমি ভাল আছ তো?'

'এ অবস্থায় কি আর ভাল থাকা যায়,' প্রথমে মুসার বাঁধনটা খুলতে শুরু করল জিনা। 'রোজ এসে একবার করে খাবার দিয়ে যায়। ফাস্ট ফুড। একই বার্গার আর ফ্রাই খেতে খেতে জিভ পচে গেছে আমার।'

চাবির রিঙে ছোট্ট একটা টর্চ আছে জিনার। সেটা কিশোরের হাতে তুলে দিল। 'ব্যাটারি প্রায় শেষ। সারাক্ষণ জ্বালালে কিছুই থাকত না। অন্ধকারেই বসে থেকেছি। দিনের পর দিন এ ভাবে থাকাটা যে কি কষ্টের!'

'পরে শুনব,' কিশোর বলল। 'এখন বেরোনোর চেষ্টা করা দরকার।'

'আমি অনেক চেষ্টা করেছি, পারিনি। তোমরা পারো নাকি দেখো।'

বন্ধ, জানে, তবু প্রথমে গিয়ে দরজায় ধাক্কা মেরে দেখল কিশোর।

'তাড়াতাড়ি করা দরকার,' মুসা বলল। 'গ্যাস ছেড়ে দিলে আর বেরোনো লাগবে না কোনদিন।'

'গ্যাস!' বুঝতে পারল না জিনা।

তাকে বুঝিয়ে দিল মুসা। শুনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না জিনা। আপনাআপনি হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল যেন তার। বসে পড়ল মাটিতেই। বিষাক্ত গ্যাসের সাহায্যে কি করে গুদামে পোকা মারা হয়, জানে সে।

কিশোর কোন কথা বলছে না। কাজে ব্যস্ত। পেনলাইটের সামান্য আলো দিয়ে ছাতের একটা গ্রিল আবিষ্কার করে ফেলল।

'ওদিক দিয়ে বাতাস আসে,' মুসার দিকে ঘুরে তাকাল সে। 'মুসা, এসো তো এখানে। তোমার কাঁধে চড়ে দেখি কিছু করতে পারি কিনা।'

গ্রিলটার নিচে এসে দাঁড়াল মুসা। তার কাঁধে চড়ল কিশোর। জিনা মুসাকে এমন করে ধরে রাখল, যাতে সে ঠিকমত দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, কিশোরের কাজে ব্যাঘাত না হয়।

জিনার কী-রিঙটা আলো ছাড়াও আরও নানা ভাবে সাহায্য করল। একটা চাবি দিয়ে গ্রিলের স্ক্রুগুলো খুলে ফেলল কিশোর। ঠেলা দিয়ে সরাতে গিয়ে বুঝল, কেবিনের ওপরও ভারী জিনিসপত্র রাখা হয়েছে। গ্রিলের কিনারে চেপে বসেছে ওগুলো।

'রাজ্যের যত জিনিস চাপিয়ে দিয়েছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। হাত ওপর দিকে তুলে রাখতে রাখতে পেশীতে ব্যথা শুরু হয়েছে।

'পারছ না?' ওপর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা। কিশোরের ভার বইতে বইতে সে-ও ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে।

'সরাতেই হবে,' কিশোর বলল। 'বেরোনোর এটাই একমাত্র পথ।'

‘কিসের শব্দ!’ উদ্বিগ্ন শোনাল জিনার কণ্ঠ।

‘খবরদার, শ্বাস নেবে না!’ চিৎকার করে উঠল কিশোর। ‘গ্যাস ছেড়ে দিয়েছে!’

দুই হাতে প্রাণপণে গ্রিলটা ধরে ঠেলতে লাগল সে। তার চাপে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে মুসা। কিন্তু সরল না।

নড়তে শুরু করল অবশেষে গ্রিলটা। শেষ বারের মত জোরে ঠেলা মেরে পাশে সরিয়ে দিল কিশোর। দুড়ুম-দাড়ুম করে কি সব যেন পড়ল কেবিনের ছাত থেকে গড়িয়ে।

গ্রিলের ফোকরের দুই প্রান্ত চেপে ধরে নিজেকে টেনে তুলতে শুরু করল সে। মাথাটা ঢুকিয়ে দিল ফোকরের ভেতর দিয়ে। ফোকর গলে উঠে এল ওপরে। ছাতে উঠে বসল।

দম বন্ধ করে রেখেছে।

হামাগুড়ি দিয়ে ছাতের কিনারে চলে এল সে। লাফ দিয়ে মাটিতে নামল।

দরজার ডাণ্ডাটায় তালা দেয়া না থাকলেই হয় এখন। তালা থাকলে খুলতে পারবে না। বের করে আনতে পারবে না মুসা আর জিনাকে।

কতক্ষণ আর দম আটকাবে? শ্বাস টানল। ভয়ানক বিষাক্ত, তীব্র ঝাঁজাল গ্যাস মেশানো বাতাস ঢুকে গেল নাক দিয়ে। জ্বালা করে উঠল কণ্ঠনালী। ফুসফুসে চাপ অনুভব করল।

দৌড় দিল দরজাটার দিকে।

টর্চের সামান্য আলো ব্যবহার করে দেখল, তালা নেই।

দ্রুতহাতে ডাণ্ডাটা সরিয়ে খুলে ফেলল দরজা।

‘জিনা! মুসা!’ ডাক দিল সে।

হাঁসফাঁস করছে ওরা দু'জনে। জিনার গোঙানি শোনা গেল। ফ্যাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠে মুসা কি বলল, বোঝা গেল না।

‘শ্বাস নিচ্ছ কেন?’ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। ‘জলদি বেরিয়ে এসো!’

বলল বটে, কিন্তু সে নিজেই আর দম না টেনে থাকতে পারবে না। গলার মধ্যে ঘড়ঘড়ানি শুরু হয়ে গেছে। আগুন ধরে গেছে যেন ফুসফুসে। মাথার ভেতরটা ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। চিন্তার শক্তি হারাচ্ছে। কি করবে?

ইচ্ছে করছে মাটিতে শুয়ে পড়ে গভীর ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যেতে!

চোদ্দ

গ্যাসের শিকার হওয়া চলবে না এখন কোনমতে!

নিজেকে বোঝাল কিশোর।

কোন একটা অস্ত্রের জন্যে মরিয়া হয়ে তাকাতে লাগল চারপাশে। টর্চের আলো এত কমে গেছে যে, যে কোন মুহূর্তে নিভে যাবে। তার আগেই খুঁজে বের

করতে হবে কিছু একটা।

কেবিনের সামান্য দূরে একটা বেঞ্চ দেখতে পেল। ওঅর্কবেঞ্চ। তাতে দু'চারটা যন্ত্রপাতি পড়ে আছে। শাবল, হাতুড়ি, এ সব।

কিন্তু আসল জিনিসটা কই?

যেটা খুঁজছে সে?

দেখতে পেল। দুলে উঠল বুকের মধ্যে। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল।

থাবা দিয়ে তুলে নিল মরচে পড়া ছুরিটা।

দরজার কাছে ফিরে এল। বহু কষ্টে অজ্ঞান হওয়া থেকে বিরত রাখছে নিজেকে।

ঘোলাটে লাল একটা গোল রিঙ সৃষ্টি করে জ্বলছে টর্চটা। তবে দরজাটা কোথায় আছে দেখার জন্যে যথেষ্ট।

সেদিকে তাকিয়ে ডাক দিল, 'মুসা! বেরিয়ে এসো জলদি!'

সাড়া পেল না।

'মুসা!'

'এই যে!' দরজার কাছ থেকে শোনা গেল তার ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠ।

জিনার শক্তি প্রায় শেষ। তাকে ধরে ধরে নিয়ে আসছে মুসা।

বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে।

তাঁবুর দরজাটা কোন্ দিকে আছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মুসাদেরকে আসতে বলে আন্দাজে সেদিকে দৌড় দিল কিশোর।

দরজাটা পাওয়া গেল না। কিন্তু তাঁবুর দেয়াল ঠেকল হাতে। মরচে পড়া ছুরিটা চালাল পাগলের মত। ধার বলতে নেই। তবু চোখা মাথাটা কাজে লাগল।

যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে ছুরির খোঁচা মারতে মারতে ফেঁড়ে ফেলল ক্যানভাসের খানিকটা জায়গা। পেছনে তাকিয়ে ডাক দিল, 'মুসা!'

'এই যে আমি!'

ঠিক এই সময় নিভে গেল টর্চ।

কাজ প্রায় শেষ। আর দরকারও নেই এটার। তবে টর্চটার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গেছে কিশোরের মন। তাই ফেলতে পারল না। ভরে রাখল পকেটে।

বাইরে বেরিয়ে এল সে। তাঁবুর কাছেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে। মুখ হাঁ করে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেতে খেতে বাতাস টানতে লাগল।

ফুসফুস ভরে গেল সাগর থেকে আসা তাজা হাওয়ায়।

কমে আসতে লাগল জ্বলুনি। বুকের চাপ। মাথাটা পরিষ্কার হয়ে আসছে।

পেছনে গোঙানির মত আওয়াজ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখল মুসা আর জিনাও তার মত মাটিতে পড়ে বাতাস টানছে।

পুরো এক মিনিট পর কথা বলল জিনা, 'উহ্, নরক থেকে বেঁচে এলাম!'

'তাহলেই বোঝো, পোকামাকড়ের কত কষ্ট!' শুকনো হাসি হাসল মুসা। 'ওদেরকে যে কত ভাবে মারি আমরা!'

'জ্বালায় বলেই তো মারি,' জিনা বলল।

'আমাদের কাছে জ্বালানো মনে হয়। আসলে তো ওরা বাঁচতে চায়, খাবার

খেতে চায়। আমাদের যন্ত্রণা দেয়ার জন্যে মোটেও করে না।'

উঠে বসল কিশোর। 'কথা বোলো না। কাছাকাছিই থাকতে পারে ওরা। কথা শুনলে আবার এসে ধরবে। এবার এমন ব্যবস্থা করবে, যাতে কোনমতেই আর বাঁচতে না পারি।'

হামাগুড়ি দিয়ে বনের দিকে এগোল ওরা। উঠে দাঁড়ালে যদি চোখে পড়ে যায় এই ভয়ে।

গাছপালার ভেতরে এসে উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে শুরু করল বন থেকে বেরোনোর জন্যে।

বনের বাইরে বেরোতেই একটা গাড়ি চোখে পড়ল। হলুদ রঙের একটা সিডান। গায়ে বড় একটা পোকার ছবি। নিচে কোম্পানির নাম লেখা।

ভেতরে কেউ নেই, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর কাছে এল ওরা। নামটা পড়ে বুঝে গেল কিশোর, গাড়িটা এখানে কেন। কয়েকটা প্রশ্নেরও জবাব পেয়ে গেল। বলল, 'পোকা-মারা কোম্পানির গাড়ি। পেশাদার লোককে নিয়ে এসেছে ওরা। নিয়মিত বোধহয় পোকা মেরে রেখে যায় লোকটা। আমাদের তাঁবুর ভেতরে ভরে মারার কারণটা বুঝেছ?'

'না,' মাথা নাড়ল মুসা।

'অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে দেখানোর জন্যে। বলবে, ভুলক্রমে দুর্ঘটনায় মারা গেছি আমরা।'

'এত ঝামেলা না করে হাঙর কিংবা অ্যালিগেটরের পুলে ফেলে দিলেই কি ভাল করত না? চিহ্নও থাকত না আমাদের।'

'ওরকম কিছু করলেই বরং পুলিশের সন্দেহ বাড়ত। ওরা জানে, আমরা উধাও হয়ে গেলে সেটা নিয়ে তদন্ত হবে। আমাদের বাড়ি থেকে লোক আসবে। ডেপুটি গেকোর কথার দুই পয়সা দাম দেবে না। কারণ ঘুষখোর পুলিশটার সব কথা বলে দেবে রবিন। মিয়ামি পুলিশ যাবে তখন গাল আইল্যান্ডে। সূত্র ধরে ধরে গিয়ে হাজির হবে কেইনের বাড়িতে। সহজে ছাড়া হবে না তাকে। কোন্‌খানে তার কয়টা বাড়ি আছে বের করে ফেলবে পুলিশ। এ বাড়িটাতে আসবে। হাঙর আর অ্যালিগেটরের পুল দেখলে বুঝে যাবে আমাদের কি গতি করেছে কেইন।'

'গ্যাসের মধ্যে পড়ে মরলেও তো বুঝত।'

'না, অন্য কথা বোঝাতে পারত তখন কেইন। বলত জিনার খোঁজে আমরা গিয়ে তার তাঁবুতে ঢুকেছি। ঠিক এ সময় পোকা মারার জন্যে গ্যাস ছেড়েছে পোকা-মারা কোম্পানির লোক। আমরা যে ভেতরে আছি, জানার কথা নয় লোকটার। পুলিশকে বিশ্বাস করিয়ে ফেলত কেইন। তিন-তিনটা খুন করেও তখন ধোয়া তুলসি পাতা হয়ে থাকত সে।'

'কত্তবড় শয়তান!' দাঁতে দাঁত চাপল মুসা। 'ওকে ধরে একবার হাঙর, একবার অ্যালিগেটরের পুলে যদি চুবাতে পারতাম, রাগটা কমত!'

'রাগ পরে কমিয়ো,' হাসল কিশোর। 'এখন দেখো, গাড়িটা স্টার্ট দিতে পারো নাকি। হাতের কাছে যখন পেয়েই গেছি, পালানোর জন্যে রেডি থাকি।'

দরজায় তালা দেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি পোকা-মারা কোম্পানির লোক।

চাবিটাও ইগনিশনেই আছে। মোচড় দিতেই গুঞ্জন তুলল ইঞ্জিন। স্টার্ট নেবে।

'হয়েছে, থামাও!' মুসার পাশে উঠে বসল কিশোর। কার-টেলিফোনটা টেনে নিল। ফোন করল মিয়ামি পুলিশকে।

ফোন ধরল যে ডিউটি অফিসার, তার নাম ডিটেকটিভ ওয়ারেন। কোন ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'রাগবি ড্যাগোকে ধরতে চান? স্মাগলার এবং গ্যাংলীডার?'

সঙ্গে সঙ্গে জড়তা চলে গেল অফিসারের কণ্ঠ থেকে। 'কে বলছেন?'

'আমার নাম কিশোর পাশা। ঠিকানা দিচ্ছি, ভাল করে বুঝে নিন। এখানে এলেই আমাকে দেখতে পাবেন। শুধু রাগবি না, পুরো দলটাকেই ধরতে পারবেন।'

ঠিকানা জানা নেই কিশোরের, কিভাবে কিভাবে কোনখানে আসতে হবে বলে দিল ডিটেকটিভ ওয়ারেনকে। পেছনে খুট করে শব্দ হতেই তাড়াতাড়ি ফোন রেখে দিল কিশোর। তার মনে হলো, আরও কিছু যেন বলতে চেয়েছিল ডিটেকটিভ ওয়ারেন। কিন্তু সে-সময় আর নেই।

তাড়াতাড়ি ফোন রেখে গাড়ি থেকে নেমে এল সে।

শব্দটা যেদিক থেকে হয়েছে সেদিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। কাউকে আসতে দেখা গেল না। তারমানে কোন বুনো প্রাণী হবে। শেয়াল কিংবা র‍্যাকুন।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'নামলে কেন? চলো, বেরিয়ে যাই।'

'বেরোবে কি করে? গেট তো খোলে রিমোট কন্ট্রোলে।'

'গুঁতো মেরে ভেঙে ফেলব।'

'আমার মনে হয় না ভাঙতে পারবে। কেইন সিনেমা দেখেনি, এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারবে না। গাড়ি নিয়ে যে হরহামেশা গেট ভেঙে বেরিয়ে যায় হিরোরা, এটা তার অজানা নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যাতে না ভাঙা যায় সে-ভাবেই তৈরি করা হয়েছে গেটটা।'

'তাহলে কি করব? বসে থাকলে তো ধরা পড়ে যাব।'

'দেখি, কয়েক মিনিট অপেক্ষা করি। পুলিশকে কাছে আসার সময় দিই। আমাদের এদিকে শত্রুপক্ষের কাউকে আসতে দেখলে কেটে পড়ব। যদি না আসে, কয়েক মিনিট পর অ্যাকশনে যাব। শুধু পুলিশের আশায় বসে থাকলে হবে না। আমাদেরও প্রচুর কাজ আছে। কেইন আর ড্যাগোকে হাতে যখন পেয়েছি, প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ব না। নেমে এসো। লুকিয়ে থাকি।'

গাড়ির কাছেই ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসল তিনজনে।

'হ্যাঁ, এবার বলো তো,' জিনাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ধরল কি করে ওরা তোমাকে?'

'সামনে দিয়ে এসে গাড়িটার পথরোধ করল,' জিনা বলল। 'তারপর এনডি আর কোরি নেমে এসে পিস্তল দেখিয়ে ধরে নিয়ে গেল আমাকে।'

'হারম্যান কেগ ছিল না ওদের সঙ্গে?'

'এই কেগটা আবার কে?'

'বুঝলাম। তারমানে চেনো না একে। কেন তোমাকে কিডন্যাপ করল সেই

কথাটা বলো দেখি আগে।'

'জেরি আঙ্কেলের ডকটা ভাঙার সময় এনডিকে দেখে ফেলেছিলাম আমি,' জিনা বলল। 'বোটের মধ্যে লুকিয়ে ছিল সে। বোট চালাচ্ছিল আরেকটা লোক। পরে আর কখনও দেখিনি তাকে। এনডিকে যে দেখেছি, সেটা বুঝে ফেলেছিল সে। পরের দিন যখন সৈকতে গেলাম, আবার তাকে দেখতে পেলাম কেইনের বাড়িতে। কোরির সঙ্গে ধরাধরি করে একটা বোট থেকে মাল নামাচ্ছিল। বাক্সের গায়ে বার্মিজ লেখা। আমাকে এনডির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল এনডি।'

'কেন তোমাকে কিডন্যাপ করা হলো, সেটা তো বুঝলাম,' কিশোর বলল, 'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আমাদের খোঁজ পেল কি করে ওরা? ফ্লোরিডা থেকেই আমাদের পিছে লেগেছিল। গাড়ির চাকা কেটে দিয়ে ভয় দেখিয়ে আমাদের তাড়াতে চেয়েছে।'

'সেটা আমারই বোকামির জন্যে,' চাপা ক্ষোভের সঙ্গে বলল জিনা। 'আমাকে যখন ধরে নিয়ে গেল ওরা, কেইনের সামনে হাজির করল, তাকে হুমকি দিয়েছিলাম। তোমাদের নাম করে বলেছিলাম, তোমরা আমাদের বন্ধু। আমার নিখোঁজ হওয়ার খবর শুনলে অবশ্যই আমাকে উদ্ধার করতে আসবে তোমরা। সে-কারণেই নিশ্চয় সাবধান হয়ে গিয়েছিল ওরা। তোমাদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর করে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, তোমরা বিপজ্জনক। সে-জন্যে গাল আইল্যান্ডে ঢোকার আগেই তোমাদের বিদায় করতে চেয়েছিল।'

'হুঁ,' চুপ হয়ে গেল কিশোর।

'কেগকে চেনো না,' মুসা বলল, 'কিন্তু তার বাড়িতে তোমার ঘড়ি পাওয়া গেল কিভাবে?'

'কেগের বাড়িতে আমার ঘড়ি! আমি তো ভেবেছিলাম ঘড়িটা আমি কেইনের বাড়িতে ফেলে এসেছি। কেগকে আমি চিনিই না...'

'আমি বুঝে গেছি,' কিশোর বলল। 'তোমার কিডন্যাপিঙের দায় অন্য কারও ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেরা বেঁচে যেতে চেয়েছিল। এর জন্যে কেগের চেয়ে উপযুক্ত লোক আর কে আছে? করে বীমার দালালি, অথচ গাল আইল্যান্ডে এসে সময় কাটাচ্ছে পচা পচা ছবি এঁকে। চালচলন রহস্যময়। স্থানীয় লোকও নয় সে। মিয়ামি থেকে পুলিশ এসে তদন্ত চালালে ঘুষখোর গেকোটার সাহায্যে সহজেই তাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারত। সে-জন্যে ফাঁদ তৈরিও করে রেখেছিল ওরা। কেগের গাড়িটা চুরি করে সেটার সাহায্যে তোমাকে কিডন্যাপ করে, তোমার ঘড়ি নিয়ে ফেলে রেখে আসে তার বাড়ির টেবিলে। তোমার ছবি থেকে তার গাড়ির নম্বর বের করে আমরাও তো তাকে সন্দেহ করা শুরু করে দিয়েছিলাম।'

'কেইনটা আসলেই পাজি!' মুসা বলল। 'আমরা যখন প্রথম ঢুকলাম তার বাড়িতে, এমন ভঙ্গি করল, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না।'

'ফ্রিজের দরজায় আটকানো বাবার ছবিটা পেয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'রাখলে কখন?'

'আমাকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে কেইনের সঙ্গে যখন চেঁচামেচি করছি আমি, নীরা লেভিন নামে একটা বেটি এসে ঘরে ঢুকল। এনডিকে আমার পাহারায় রেখে

মেয়েলোকটাকে বের করে দিয়ে আসতে গেল কেইন। পানি খাওয়ার ছুতোয় ফ্রিজের কাছে গিয়ে তখন চুম্বকের সাহায্যে আটকে দিয়ে এলাম ছবিটা।'

'ভালই করেছিলে,' মুসা বলল। 'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। কার্ডটা পাঠালে কি করে?'

'এ বাড়ি থেকেই জোগাড় করেছিলাম ওটা,' জিনা জানাল। 'দোতলার একটা অফিস ঘরে সামান্য সময়ের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাকে। টেবিলে রাখা মিয়ামির সমুদ্রপাড়ের ছবিওয়ালা কার্ডটা দেখেই ফন্দি এল মাথায়। বোকা পিকোটাকে ফাঁকি দিয়ে চুরি করলাম ওটা। একটা কলমও চুরি করলাম। বাথরুমে গিয়ে লিখলাম। দরজা দিয়ে বের করে আমাকে তাঁবুতে নিয়ে যাওয়ার সময় দরজার পাশের ডাকবাক্সে ফেলে দিলাম, যেটা থেকে পিয়ন এসে চিঠি নিয়ে যায় পোস্ট করার জন্যে। রাতের বেলা ছিল বলেই এত কাজ করতে পেরেছি, দিনে হলে পারতাম না।'

'তার জন্যে বোকা পিকোটাকে একটা ধন্যবাদ দেয়া উচিত তোমার,' মুসা বলল।

জবাব দিতে যাচ্ছিল জিনা, দূর থেকে আসা সাইরেনের শব্দ শুনে থেমে গেল।

সোজা হয়ে বসল কিশোর। 'চলো, সময় হয়েছে।'

'পোকা-মারারা তো এল না,' মুসা বলল। 'এনডি আর কোরিরও দেখা নেই।'

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'খুব বেশিক্ষণ তো হয়নি। আমরা মরেছি কিনা, একেবারে শিওর হয়ে তারপর আসবে ওরা।'

গেটের দিকে ছুটল তিনজনে।

হেলিকপ্টারটা চোখে পড়তে থেমে গেল কিশোর। 'দাঁড়াও দাঁড়াও, এক কাজ করা যাক। অকেজো করে দিয়ে আসতে হবে ওটাকে, যাতে স্টার্ট না নেয়। পালাতে না পারে কেইন।'

'ঠিক। আমি যাচ্ছি।' হেলিকপ্টারের দিকে দৌড় দিল মুসা।

'বাকি থাকল বোটটা,' ছুটতে ছুটতে জিনাকে বলল কিশোর। 'গাড়িতে করে পালাতে গেলে পুলিশের সামনে পড়ে যাবে ওরা। বেরোতে পারবে না। আমি বোটটার ব্যবস্থা করে আসি। তুমি কোথাও লুকিয়ে পড়ো। খবরদার, কোনমতেই ওদের হাতে পোড়ো না আর। তাহলে তোমাকে ব্যবহার করে পালানোর ব্যবস্থা করে নেবে ওরা।'

ঘন গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। সামনে সমুদ্র। বোটহাউসটা দেখা যাচ্ছে। সাগর থেকে একটা চওড়া চ্যানেল বেরিয়ে এসেছে। সেটার মুখেই বানানো হয়েছে বোটহাউসটা। বোটহাউসের বাইরে নোঙর করে রেখেছে একটা বোট। ইয়টটা রয়েছে খোলা সমুদ্রে। ওটাতে যেতে চাইলে বোটে করে যেতে হবে। বোটটা নষ্ট করে দিলেই যাওয়ার উপায় থাকবে না আর।

পানির কিনারে এসে জুতো খুলে ফেলল কিশোর। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল

পানিতে। সাঁতরে এগোল বোটের দিকে।

কিশোরের কথা অমান্য করল না জিনা। কোন ঝুঁকি নিতে গেল না। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। তাকিয়ে রইল বাড়িটার দিকে।

ফর্সা হয়ে আসছে পুবের আকাশ। একটা দুটো করে পাখি ডাকতে আরম্ভ করেছে।

এগিয়ে আসছে সাইরেনের শব্দ।

সামনের দরজা দিয়ে ছুটে বেরোল হঠাৎ পিকো। দৌড় দিল ড্রাইভওয়ে ধরে। কিছুটা এগিয়ে রিমোট কন্ট্রোল তুলে সুইচ টিপে গেটটা খুলে ফেলল।

অবাক হয়ে গেল জিনা। পুলিশকে ঢোকার সুযোগ করে দিচ্ছে নাকি লোকটা?

বুঝল পরক্ষণেই। খোলা গেট দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল পিকো। পুলিশের আসার সঙ্কেত পেয়েই পালাচ্ছে ভীতু লোকটা।

সামনের দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল আরও তিনজন। ডগলাস কেইন, রাগবি ড্যাগো আর নীরা লেভিন। খোলা গেটের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করল ওরা। কি যেন বলল কেইন। শব্দ শুনলেও এত দূর থেকে কথাগুলো বুঝতে পারল না জিনা। নিশ্চয় পিকোকে গালাগাল করছে।

উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত তুলে হেলিকপ্টারটার দিকে দেখাতে লাগল কেইন। রাগবি দেখাতে লাগল পানির দিকে। বোঝা গেল সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ওরা, কোন পথে পালাবে। কেইন বলছে হেলিকপ্টারে করে যেতে, ড্যাগো বলছে বোটে করে। শেষমেষ হেলিকপ্টারের দিকেই ছুটল ওরা।

মুচকি হাসল জিনা। মনে মনে বলল, যাও, দেখোগে ওড়াতে পারো কিনা! একবার মুসার হাত পড়লে তোমাদের বাপেরও সাধ্য নেই ওটা আর এত তাড়াতাড়ি ওড়াতে পারো।

পেছনে হট্টগোল শুনে ফিরে তাকাল জিনা। এনডি আর কোরি দৌড়ে আসছে। ভীষণ উত্তেজিত। কেন, সেটাও অনুমান করতে পারল সে। নিশ্চয় কেবিনে ঢুকে ওদেরকে না পেয়ে তাজ্জব হয়ে গেছে ওরা। বসকে খবরটা দিতে আসছে। কিন্তু সাইরেনের শব্দ শুনে আর বস্‌দেরকে হেলিকপ্টারের দিকে দৌড়াতে দেখে থমকে গেল ওরা। বুঝল, পরিস্থিতি সুবিধের নয়।

যেতে যেতে চিৎকার করে আদেশ দিল কেইন, 'ওদিকে যাচ্ছ কোথায়, গাধা কোথাকার! জলদি বোট নিয়ে পালাও! ইয়টটা নিয়ে চলে যাও গাল আইল্যান্ডে। আমরা হেলিকপ্টারে করে যাচ্ছি।'

পৌঁছে গেছে পুলিশ। গেট দিয়ে ঢুকল প্রথম গাড়িটা। পেছনে একে একে আরও চারটা। পুরো বহর নিয়ে চলে এসেছে ওরা। রাগবি ড্যাগোকে ধরার এমন চমৎকার মওকা কোন ভাবেই হাতছাড়া করতে রাজি নয়।

গাড়ি-বারান্দায় এসে ব্রেক করল সামনের গাড়িটা। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দু'দিকের দরজা। প্রথমেই যাকে নামতে দেখল জিনা, দেখে অবাক হয়ে গেল।

রবিন!

বুঝতে পারল না, পুলিশের সঙ্গে ও এল কি করে?

রবিনকে দেখে আর লুকিয়ে থাকতে পারল না জিনা। লাফ দিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটল গাড়ি-বারান্দার দিকে।

দেখল, ইভাও নামছে গাড়ি থেকে। জিনা তো আর জানে না, কিশোর রবিনকে বলে এসেছে মধ্যরাতের পর ওরা মোটেলে ফিরে না গেলে মিয়ামি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ডিটেকটিভ ওয়ারেন রবিনের আসার সংবাদটাই জানাতে চেয়েছিল কিশোরকে। লাইন কেটে না দিলে ওই সময়ই রবিনের সঙ্গে কথা বলতে পারত কিশোর।

পনেরো

চব্বিশ ঘণ্টা পর নিজেদের ভাড়া করা ভ্যানটায় করে আবার গাল আইল্যান্ডে ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা। এবার ওদের সঙ্গে রয়েছে জিনা আর ইভা। মিয়ামি পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘ সিটিঙের পর, পুরো রিপোর্ট লিখে দিয়ে একটা হোটেলে গিয়ে উঠেছিল গোয়েন্দারা। পুলিশের অনুরোধে–অন্তত একটা দিন যেন থেকে যায় ওরা। ওদেরকে দরকার হতে পারে।

হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে গেছে ওদের। গাড়ি চালানোর সময় মনের আনন্দে শিস দিতে শুরু করল মুসা।

ঘুরপথে না গিয়ে অ্যালিগেটর অ্যালিতে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল সে। কিশোর জিজ্ঞেস করলে বলল, 'দিনের বেলা না দেখে যাচ্ছি না আমি, সে-রাতে কাদের খাবার হতে যাচ্ছিলাম।'

'দেখো, এখন সত্যি সত্যি না খাবার হয়ে যাও,' সাবধান করল বটে কিশোর, কিন্তু আপত্তি করল না। কারণ দিনের আলোয় অ্যালিগেটরে ভরা জলাভূমিটা দেখার লোভ সামলাতে পারল না সে-ও।

রবিন আর জিনারও আগ্রহ আছে। ইভার নেই। বহুবার দেখেছে সে। তবে বাধা দিল না। কিছু বললও না। ওরা দেখতে চাইছে, দেখুক।

নিরাপদেই পেরিয়ে এল বিশাল জলাভূমিটা। কোথায় পড়তে যাচ্ছিল রাতের বেলা, দিনের আলোয় দেখে শিউরে উঠল মুসা। সত্যি ভয়ানক জায়গা! বড় বাঁচা বেঁচেছে।

কজওয়ে ধরে গাল আইল্যান্ডে যখন ঢুকছে ওরা, মাথার ওপর উঠে এসেছে সূর্যটা। তীব্র হয়ে উঠেছে এ অঞ্চলের কড়া রোদ।

গাল আইল্যান্ডে ফিরে মোটেলে ঢোকার পথেই দেখা হয়ে গেল হারম্যান কেগের সঙ্গে। সবুজ গাড়িটা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গাড়ি থামাতে বলল কিশোর।

নেমে গেল ওরা দল বেঁধে। গাড়িটা থেকে খানিক দূরে ঝড়ে উপড়ে পড়া একটা পাম গাছের ওপর ছাতার নিচে বসে গভীর মনোযোগে পামের জটলার ছবি

আঁকছে সে। রোদ থেকে বাঁচার জন্যে বালিতে খাড়া করে গেঁথে দিয়েছে বড় একটা ছাতা।

ছেলেমেয়েদের সাড়া পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল হাত। থেমে গেল পেন্সিল। 'তোমরা!'

'হ্যাঁ, আমরা,' হাসিমুখে জবাব দিল কিশোর। 'আজ আর কোন অভিযোগ নিয়ে আসিনি আপনার কাছে। আসল কিডন্যাপাররা ধরা পড়েছে।...জিনা, হারম্যান কেগ।'

মাথা নাড়ল জিনা, 'জীবনেও দেখিনি একে।'

উঠে এল কেগ। ভুরু কুঁচকে জিনাকে দেখতে লাগল।

পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর। সংক্ষেপে জানাল সব।

'খোদা বাঁচিয়েছে আমাকে!' জোরে নিঃশ্বাস ফেলে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল কেগ। 'ওর ঘড়িটা যে আমার ঘর থেকে নিয়ে গেছ, একটা কাজের কাজ করেছ। চুরি করে আমার ঘরে ঢুকেছিলে বলে এক বিন্দু রাগ নেই আর আমার।'

'কিন্তু একটা কথা বলুন তো,' কিশোর বলল, 'বীমার দালালি ছেড়ে আপনি এতদিন ধরে এই গাল আইল্যান্ডে এসে বসে আছেন কেন?'

অবাক হয়ে গেল কেগ। 'আমি বীমার দালালি করি কে বলল তোমাকে?'

'ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমরা গোয়েন্দা। কেইন আর ড্যাগোর মত অপরাধীকে ধরিয়ে দিয়ে এলাম, আর আপনি কি কাজ করেন, সেটা বের করতে পারব না?'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল কেগ। 'আর মিথ্যে বলব না। সত্যি কথাটাই বলি। বীমার দালালি আমার পেশা নয়। আমি এ লাইনে নতুন। মানুষকে পলিসি গছানো যে কি কঠিন ব্যাপার, যে এ কাজ না করেছে সে বুঝবে না। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে যা-ও বা একজনকে রাজি করালাম, এমন একটা প্যাঁচে ফেলে দিল আমাকে যে, পারলে কোম্পানির ম্যানেজার আমাকে পুলিশে দেয়। কিছুটা সেই ভয়ে, আর মনের দুঃখে এসে এই স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছি।'

'পচা পচা ছবি আঁকার জন্যে,' হাসল মুসা। গলা লম্বা করে কেগের হাতের ছবিটা দেখল। 'এগুলো কি পামের জটলা, না মুঠি বাঁধা ছাগলের শিং? শিঙের মাথায় ওগুলো কি? তুলোর পোঁটলা?'

স্তব্ধ হয়ে গেল কেগ। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল গম্ভীর মুখে। তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। 'ঠিক বলেছ। আমি জানি আমার আঁকা ভাল হয় না। কিন্তু এত সহজে সত্যি কথাটা আমার মুখের ওপর কেউ বলেনি আর। শুধু এ কথাটার জন্যে তোমাদেরকে একটা দাওয়াত দিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।'

'খাওয়ার দাওয়াত তো?' সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটা লুফে নিল মুসা। 'বলুন, কবে আসতে হবে?'

কেগকে ধন্যবাদ দিয়ে, হাসাহাসি করতে করতে গাড়িতে ফিরে এল ওরা।

মোটেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই গাড়ির শব্দ শুনে অফিস থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন মিস্টার ব্রুক। গাড়ির কাছে এসে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'এসেছ তোমরা! বাঁচা গেল। দেরি দেখে আমি তো চিন্তায়ই পড়ে গিয়েছিলাম...'

'হ্যাঁ, চাচা,' গাড়ি থেকে নামতে নামতে জবাব দিল ইভা। 'অ্যালিগেটর

অ্যালিতে থেমেছিলাম। জলাভূমিটা দেখতে চেয়েছিল ওরা।'

'অ। টেলিফোনে সব শুনেও নিশ্চিত হতে পারছিলাম না,' মিস্টার ব্রুক বললেন। 'মনে হচ্ছিল, ড্যাগো আর কেইন সহ ধরা তো পড়েছে মাত্র চার-পাঁচজন। কিন্তু ওদের দলে আরও লোক আছে নিশ্চয়। যারা তখন ওবাড়িটাতে ছিল না। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে রাস্তায় যদি কিছু করে তোদের?'

'কিছু যে করেনি, দেখতেই তো পাচ্ছ,' হেসে বলল ইভা।

ড্রাইভিং সীট থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল মুসা। 'কিন্তু কথাটা হলো আঙ্কেল, আপনার দুশ্চিন্তা কমেছে, কিন্তু আমার যে বেড়ে যাচ্ছে।'

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন মিস্টার ব্রুক। ইভাও অবাক।

'কেন, এখন আর দুশ্চিন্তা কিসের?' জানতে চাইলেন মিস্টার ব্রুক। 'সব ঝামেলা তো শেষ।'

'দুশ্চিন্তাটা হলো, কেউ খাওয়ার কথা বলছে না,' মুখ গোমড়া করে বলল মুসা। 'নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে গেলে কোন মানুষ বাঁচে বলে আমার জানা নেই।'

হা-হা করে হেসে উঠলেন আঙ্কেল ব্রুক।

চমকে গেল ইভা। চাচাকে এ ভাবে হাসতে বহুকাল দেখেনি।

হাসতে হাসতে মিস্টার ব্রুক বললেন, 'ভাল কথা মনে করেছ তো। তোমাদের অপেক্ষায় থেকে থেকে পেট বলে যে একটা জিনিস আছে, ভুলেই গিয়েছিলাম। চলো চলো, কুপারের ওখানেই গিয়ে খাওয়াটা সেরে আসি। আমরা যে বিজয়ী হয়েছি, লাঞ্চ দিয়ে সেটা সেলিব্রেট করব।'

'তা-ই চলুন। মিস্টার কুপারকেও জানাতে পারব, তার রেস্টুরেন্টটা বেঁচে গেছে। কেইনের শয়তানি বন্ধ হয়েছে। আবার আসবে ট্যুরিস্ট, জমে উঠবে ব্যবসা।'

'সেটা জানে না মনে করেছ? সুখবরটা অনেক আগেই দিয়ে দিয়েছি ওকে।'

'আরও একবার জানাব আমরা, চলুন।'

আবার গাড়িতে উঠল সবাই। দলে এবার যুক্ত হলেন মিস্টার ব্রুক।

কুপার'স ডিনারের সামনে এনে গাড়ি রাখল মুসা। গাড়ি থেকে নেমে সারি দিয়ে ভেতরে ঢুকল সবাই। তাড়াহুড়ো করে চেয়ার টানাটানি করে এনে টেবিল গুছিয়ে দিল কুপার আর ম্যাগি। আরাম করে বসল সবাই। পনেরো মিনিটের মধ্যেই বিরাট এক ট্রে বোঝাই করে বার্গার আর স্টেক স্যান্ডউইচ নিয়ে হাজির হলো ম্যাগি।

'কেইনের বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেছে পুলিশ,' খেতে খেতে গোয়েন্দাদের জানালেন মিস্টার ব্রুক। 'নানা রকম দামী দামী চোরাই মালে ভর্তি ছিল বাড়ির নিচতলার স্টোররুম। বড় বড় মার্কেটের দোকান থেকে চুরি গেছে ওসব। লিস্ট আছে মিয়ামি পুলিশের কাছে। সেই সঙ্গে চোরাই পথে আনা প্রচুর ইলেকট্রনিক সামগ্রী, বিশেষ করে কম্পিউটারের পার্টস, বেআইনী ভাবে আনা। গ্যাংলীডার রাগবি ড্যাগো দক্ষিণ ফ্লোরিডাতেও তার ব্যবসা বিস্তার করতে চেয়েছিল। দলে ঢুকিয়ে নিয়েছিল স্মাগলার কেইনকে।'

'খালাস পেয়ে যাবে না তো?' প্রশ্ন করল জিনা।

'না, তা পাবে না,' মাথা নাড়লেন মিস্টার ব্রুক। 'প্রথমেই আমার এ কথাটা মনে হয়েছে। পুলিশকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওরা বলল, না, ওর বিরুদ্ধে এত বেশি প্রমাণ আছে ওদের হাতে, কোনমতেই ছাড়া পাবে না কেইন। আর ড্যাগো তো আগে থেকেই অভিযুক্ত হয়ে আছে।' মুখ তুললেন মিস্টার ব্রুক। 'আমাদের দ্বীপ থেকে কেন তাড়াতে চেয়েছিল ওরা, বলেছে কিছু?'

'কেইন আর ড্যাগো অন্তত আমাদের সামনে মুখ খোলেনি,' কিশোর বলল। 'পরে কি করবে জানি না। তবে নীরা বেগম জেরার মুখে ক্যানারি পাখির মত গান গাওয়া শুরু করেছিল। আর পিকোটাকেও ধরে ফেলেছে পুলিশ। সে তো এমন কাণ্ড করল, যেন পেটে যা আছে উগরে দিতে পারলে বাঁচে।'

'পিকো কে?'

'কেইনের বিসকেইনি বে'র বাড়ির পাহারাদার।'

'ও। তা কি বলল?'

'পুরো দ্বীপটাই কিনে ফেলতে চেয়েছিল কেইন,' ছুরি দিয়ে স্টেক কেটে কাঁটা চামচে গেঁথে মুখে পুরল কিশোর। 'ওদের হেডকোয়ার্টার বানাতে চেয়েছিল। চোর-ডাকাত স্মাগলারদের স্বর্গদ্বীপ। ফ্লোরিডার পশ্চিম উপকূলে সুন্দর, ছিমছাম, নিরিবিলি একটা দ্বীপের চেয়ে ভাল হেডকোয়ার্টার ওদের মত অপরাধীরা আর কোথায় পাবে? স্থলপথ, জলপথ, আকাশপথ, সব দিক থেকে ঢোকা যায়।'

'হুঁ, তা ঠিক। আমার গাছগুলো কে চুরি করেছে, বলেছে নাকি?' জানতে চাইলেন মিস্টার ব্রুক।

'ওই দুই শয়তানই লোক দিয়ে করিয়েছে,' কিশোর জানাল। 'এনডি আর কোরি। আপনি যে ভেবেছেন বিক্রির জন্যে নিয়ে গেছে, তা না; আসলে বিরক্ত করে করে আপনাকে বিদেয় করার জন্যে।'

'সে তো বোঝাই যাচ্ছে এখন,' মাথা দোলালেন মিস্টার ব্রুক। 'আর টাকা খেয়ে ওদের সহায়তা করে এসেছে শয়তান গেকোটা।'

'তাই তো, গিরগিটিটার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম,' খেতে খেতে মুখ তুলল মুসা। 'ওটার কি গতি করেছে মিয়ামি পুলিশ? নারকেল গাছে তুলে দিয়ে গেছে, যেখানে ওর আসল বাসা?'

হাসলেন মিস্টার ব্রুক। 'না, নারকেল গাছে তোলেনি। তবে শাসিয়ে দিয়ে গেছে, দ্বীপের কারও ব্যাপারে যেন আর নাক না গলায়। ওর জায়গায় একজন অফিসারকে বসিয়ে গেছে অস্থায়ী ভাবে দ্বীপে পুলিশের দায়িত্ব পালনের জন্যে। বলে গেছে যত শীঘ্রি পারে কাউন্টিতে নালিশ করে ওর ডেপুটিগিরি খতম করে ওকে জেলে ভরার ব্যবস্থা করবে।'

'মজার ব্যাপারটা কি জানেন?' আবার আগের কথায় ফিরে এল কিশোর। 'নীরা লেভিন কিন্তু ওদের সঙ্গে থেকেও জানত না কেইনের আসল ব্যবসাটা কিসের। তাকে বলা হয়েছিল এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা আছে কেইনের। সে একজন বিরাট বড়লোকের স্ত্রী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিল। সে-জন্যেই পুরো দ্বীপটা কিনে নেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করে আসছিল কেইনকে। একটু-আধটু অপরাধ করে ফেলেছিল।'

'বহু জায়গা এখন খালি পড়ে আছে দ্বীপে,' মিস্টার ব্রুক বললেন। 'সব নীরার কেনা, তার নিজের নামে। অনেকেই তার কাছে জমি বেচে দিয়ে চলে গেছে। অনেকে বাড়িঘরের কাজ শুরু করেছিল মাত্র, তাদের জায়গাও কিনে নিয়েছে নীরা।'

'তার অত সাধের কেইন তো গেছে চোদ্দ শিকের আড়ালে,' মুসা বলল। 'এখন এসে ওসব জায়গা ভোগ করুক। ইচ্ছে করলে তাঁবু খাটিয়ে বাস করতে পারে।'

'যদি সে-ও বেরোতে পারে শিকের আড়াল থেকে,' ফোড়ন কাটল রবিন।

'তা পারতেও পারে,' কিশোর বলল। 'যে রকম খেপেছে কেইনের ওপর, ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতেও দ্বিধা করবে না। তার শাস্তির মেয়াদ কমিয়ে তখন তাড়াতাড়িই ছেড়ে দেয়া হবে জেল থেকে।'

'তা তো হলো,' জিনা বলল। 'কিন্তু আমরা এখন কি করব? বাড়ি ফিরে যাব?'

'উঁহু, অত তাড়াতাড়ি না,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল মুসা। 'কিছুই দেখা হলো না এখানকার সমুদ্র। শুনেছি, পুরানো আমলে আশেপাশে প্রচুর জাহাজডুবী হয়েছে। সমুদ্রে ডুব দিয়ে দিয়ে গুপ্তধন খুঁজব। তা ছাড়া কেগের দাওয়াতটার কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? না খেয়ে চলে গেলে নিরাশ হবে না ভদ্রলোক?'

-: শেষ :-

(এ বইটি 'রোমহর্ষক' সিরিজে 'শ্বেতহস্তী' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লেখ্য: রোমহর্ষক সিরিজের লেখক জাফর চৌধুরী রকিব হাসানের ছদ্মনাম।)

চাঁদের পাহাড়

এক

রাস্তা জুড়ে দাঁড়াল বিশাল হাতিটা।

খাড়াই বেয়ে উঠতে উঠতে ছেলেদের মনে হলো মেঘে ঢেকে দিয়েছে সূর্য।

মুখ তুলে দেখল ওরা, আকাশ মেঘে ঢাকেনি। ঢেকেছে শুঁড়ওয়ালা এক চারপেয়ে কালো দানব। এতবড় হাতি আর দেখেনি ওরা।

হাতিটাও ওদের মতই অবাক হয়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে কুতকুতে চোখে তাকাল ওদের দিকে। গুমগুম শব্দ বেরোল গলার গভীর থেকে। রেগে গেছে। শুঁড়টা বাড়িয়ে দিল সামনে, ওদের গন্ধ নেয়ার জন্যে।

কাঁধের সঙ্গে ভাঁজ করে লেপ্টে ফেলেছিল কান দুটো। ঝটকা দিয়ে ছড়িয়ে দিল ছাতার মত। এতটাই বড়, কিশোর অনুমান করল, ওই সাইজের ডাইনিং টেবিল বানালে একেকটাতে আটজন করে লোক খেতে বসতে পারবে। রোদে ঝকঝক করছে ওটার ছয় ফুট লম্বা সাদা দাঁত।

কিশোরের মত স্থির থাকতে পারল না ওর বন্ধু মুসা। বলল, 'চলো, পালাই।'

'কোথায়?' দুই ধারে ঘন ঝোপঝাড়ের দেয়াল হয়ে আছে।

'যেদিক থেকে এলাম,' মুসা বলল।

'দৌড় দিয়ে লাভ হবে না। তাড়া করবে। হাতির সঙ্গে পারা যাবে না। ধরে ফেলবে। ছয়-সাত টন ওজনের হাতির এক পায়ের পাড়াই যথেষ্ট, ভর্তা হয়ে যাব।'

'তাহলে কিছু একটা করো! এ সব যুক্তি তো আর প্রাণ বাঁচাবে না।'

সামনের দিকে শুঁড়টাকে ছুঁড়ে দিয়ে বিকট চিৎকার করে উঠল দানব। রক্ত হিম করা চিৎকার। কলরব করে ছুটে পালাতে শুরু করল বানর আর পাখির দল।

পেছনে তাকাল কিশোর। ওদের ভাড়া করে আনা নিগ্রো কুলির দল আতঙ্কিত হয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে, একজন বাদে। তার নাম আকামি। ওদের গাইড এবং ট্র্যাকার। সে দাঁড়িয়ে আছে ওর একেবারে পাশেই। হাতে একটা হাতি মারার রাইফেল। সেটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'জ্যান্ত ধরার চেষ্টা করব।'

মুচকি হাসল আকামি। নিজে সে দুঃসাহসী লোক, সাহসী মানুষদের পছন্দ করে। কিন্তু হাতি ধরার কথা সে-ও কল্পনা করতে পারে না।

সামনে এগোনোর সাহস নেই, পিছিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছে, দু-ধারে

মাউন্টেইনস অভ দা মুন, অর্থাৎ চন্দ্রপাহাড়ের কুখ্যাত ঘন ঝোপঝাড়ের দেয়াল। সময় থাকলে হয়তো কুপিয়ে কেটে পথ করে নেয়ার চেষ্টা করতে পারত, কিন্তু হাতিটা ওদেরকে সে-সময় দেবে বলে মনে হলো না।

মাটিতে গর্ত থাকলে নির্দ্বিধায় তাতে ঢুকে যেত এখন, তাও নেই।

একটা মাত্র পথ খোলা আছে, ওপর দিকে। কিন্তু সেদিক দিয়ে পালাতে হলে ডানা দরকার, উড়ে যেতে হবে। তার মানে, পালানোর পথ নেই।

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। তাকিয়ে আছে ওপর দিকে।

'লিয়ানা!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে। মাথার ওপরে বড় বড় গাছের ডাল থেকে ঝুলছে ওই লতা। জাহাজ বাঁধার দড়ির মত শক্ত।

'ধরব কি করে?' কি করতে হবে বুঝে গেছে মুসা।

'আমার কাঁধে ওঠ,' কিশোর বলল।

কিশোরের কাঁধে উঠল মুসা। হাত বাড়িয়ে একটা লতা ধরে দোল দিয়ে উঠে যেতে শুরু করল ওপরে।

এ আবার কি হচ্ছে!—অবাক হয়ে ভাবছে যেন হাতিটা। তাকিয়ে রয়েছে আজব ওই দড়াবাজিকরের দিকে।

আকামিকে নির্দেশ দিল কিশোর, 'যাও, ওঠো, জলদি!'

কিশোরকে ছেড়ে আগে ওঠার ইচ্ছে ছিল না আকামির। কিন্তু তর্ক করে নষ্ট করার সময় এখন নেই। রাইফেলটা স্ট্র্যাপে ঝুলিয়ে, কিশোরকে মই বানিয়ে মুসার মতই উঠে যেতে শুরু করল সে-ও।

বিকট হস্তীনিনাদ করে দুলকি চালে এগোতে লাগল হাতি। লিয়ানার ডগায় ফাঁসের মত গিঁট বেঁধে থাকে। সে-রকম একটা গিঁটে পা ঢুকিয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়ল আকামি। হাত বাড়াল কিশোরকে ধরার জন্যে।

বাড়ানো হাতটা ধরে ফেলল কিশোর। টেনে তাকে তুলে নিতে লাগল আকামি।

কিন্তু সার্কাসের এই খেলা মোটেও পছন্দ হলো না হাতির। ধরার জন্যে ছুটে এল সে। কিশোরের নিচে দাঁড়িয়ে আরেকবার হাঁক ছাড়ল। শুঁড়ের ফুটো থেকে বেরোনো গরম নিঃশ্বাসের ঝাপটা লাগল পায়ে। কিশোরের গোড়ালি পেঁচিয়ে ধরল শুঁড়টা।

আকামি টানছে ওপর দিকে, হাতি টানছে নিচে। ঘাবড়ে গেছে কিশোর। ভয়ঙ্কর এক মুহূর্ত। এই টানাটানি বন্ধ না হলে ছিঁড়ে দুই টুকরো হয়ে যাবে সে। আকামি তাকে ছেড়ে দিলেও বিপদ। নিচে পড়বে। পায়ের তলায় পিষে মারবে তখন দানবটা।

চিৎকার করতে করতে দৌড়ে এল কুলিরা। টিন বাজিয়ে, নানা রকম শব্দ করে হাতির দৃষ্টি অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করল।

ওদের দিকে ফিরে ভয় দেখানোর জন্যে চিৎকার করে উঠল হাতি।

আওয়াজটা অদ্ভুত। ভয়াবহ সন্দেহ নেই, তবে বাঘ-সিংহের গর্জনের মত নয় শব্দটা, বরং অনেকটা মেয়েমানুষের চিৎকারের মত; অনেক গুণ জোরাল, গায়ের রক্ত জমিয়ে দেয়।

কুলিদের হট্টগোলের জবাবটা দিয়েই আবার কিশোরের দিকে নজর ফেরাল সে। যেন বলতে চাইল—দাঁড়াও, তোমাদেরও ধরব, আগে হাতের কাজটা শেষ করে নিই!

আবার টান দিল কিশোরের পা ধরে।

ওপরে হড়াৎ করে পিছলে গেল কিছু। এই সম্ভাবনাটার কথা ভাবেনি কিশোর। লতাটা বোধহয় খুলে আসছে ডাল থেকে। নতুন বিপদ। লতা ছিঁড়ে গেলে শুধু সে-ই না, আকামিও পড়বে—দুজনেই মরবে তখন।

'ছাড়ো! আমাকে ছেড়ে দাও!' মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে।

কিন্তু ছাড়ল না আকামি। কিশোরের কব্জিতে আরও চেপে বসল আঙুলগুলো।

আরও একটা জিনিস পিছলে যেতে শুরু করল টানাটানিতে। কিশোরের গোড়ালি ঢাকা ভারি বুট, সাপের কামড় থেকে বাঁচার জন্যে পরেছিল। পট করে ছিঁড়ে গেল ফিতে। দ্রুত পিছলে পা থেকে খসে বেরিয়ে গেল জুতোটা।

মুক্ত হয়ে গেল পা। টেনে তাকে তুলে নিল আকামি। তারপর দু-জনে মিলে বেয়ে উঠে গেল উঁচু ডালে।

জুতোটাকে নিয়ে পড়ল হাতি। আছাড় দিয়ে, পা দিয়ে মাড়িয়ে, দাঁত দিয়ে খুঁচিয়ে ওটাকে ছিঁড়ে, চ্যাপ্টা করে মাটিতে পুঁতে ফেলল। তারপর ঢেকে দিল লতাপাতা দিয়ে।

শিকারকে শেষ করে এ ভাবে কেন ঢেকে দেয় আফ্রিকান হাতি, এটা একটা বিস্ময়। এর জবাব কেউ জানে না।

কিশোর ভাবল, শান্ত হয়ে এবার চলে যাবে হাতিটা। কিন্তু গেল না ওটা। আবার নজর দিল ওদের দিকে। কুতকুতে চোখে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দেখল গাছের মানুষগুলোকে। হঠাৎ এসে বিশাল মাথা দিয়ে ঢুস মারল গাছের গায়ে।

থরথর করে কেঁপে উঠল গাছ। ঝাঁকুনির চোটে ওপরের ডাল থেকে চিৎকার করে খসে পড়ল একটা বানর। মাটিতে পড়ল না। ধরে ফেলল আরেকটা ডাল।

প্রমাদ গুণল কিশোর-মুসা। হাতির এই আচরণের কথা ওরা শুনেছে। একেক সময় এমন খেপা খেপে যায় ওরা, গাছ থেকে ফেলে হলেও শিকারকে ধরার চেষ্টা করে। এই হাতিটাও একই কাজ করছে।

সামনের ডান পা-টা গাছের গায়ে তুলে দিয়ে ঠেলতে লাগল সে। মোপানি গাছ। শিকড় খুব শক্ত। তাই সামান্য একটু বাঁকা হলো মাত্র, কাত হলো না।

ছাড়ল না হাতি। ফেলেই ছাড়বে। দাঁত দিয়ে গাছের গোড়ার চারপাশের মাটি খুঁড়তে শুরু করল। সেই সঙ্গে ছিঁড়তে লাগল শিকড়। গোড়াটা নরম করতে পারলেই,ব্যস।

চুপ করে বসে থাকলে মরতে হবে, চিৎকার করে ডেকে বলল কিশোর, 'মুংগা, শিকল!'

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতিটার কাণ্ড দেখছে কুলিরা। ডাক শুনে নড়ে উঠল তাদের একজন। আরও কয়েকজনের সাহায্যে মোটা একটা শিকলের এক মাথা তাড়াতাড়ি বেঁধে দিয়ে এল বিশাল টিলার চোখা মাথায়। আরেক মাথায় একটা ফাঁস বানিয়ে দৌড়ে এল হাতির এক পায়ের নিচে পেতে দেয়ার জন্যে।

হাতি তাতে পা দিলেই ফাঁস টেনে আটকে দেবে।

মাথা সোজা করে আবার গাছ ঠেলতে আরম্ভ করেছে হাতি। ভয়াবহ ঝাঁকুনি লাগছে। বানরের দল পালিয়ে গেছে অন্য গাছে। কিশোর-মুসারাও এ কাজ করতে পারলে বেঁচে যেত। কিন্তু ওরা তো বানরের মত লাফাতে পারে না। কেবল প্রাণপণে গাছ আঁকড়ে ধরে রইল।

মুংগার ওপর নজর পড়ল হাতির। বিকট চিৎকার দিয়ে ঘুরল।

শিকল ফেলে দৌড় মারল মুংগা। কিছুদূর তাকে আর কুলিদেরকে তাড়া করে গেল হাতি। চোখের পলকে যে যেদিকে পারল ছুটে ঝোপঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা।

আবার গাছের কাছে ফিরে এল হাতি।

গুলি করা ছাড়া উপায় নেই। ভারি .৫০০ ডাবল-ব্যারেল রাইফেলটা হাতির দিকে তাক করতে গেল আকামি।

ধরে ফেলল মুসা, 'আমাকে দাও।'

তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল আকামি, এত ভারি রাইফেল দিয়ে মুসা গুলি চালাতে পারবে না ভেবে।

'আরে দূর, দাও না! কি ভেবেছ আমাকে? ভারি রাইফেল চালিয়েছি আরও। দু-শো ফুট দূর থেকে ছোট্ট খাবারের টিন ফুটো করে দিতে পারি। আর এটা তো হাতি, বাড়ির সমান।'

অনুমতির আশায় কিশোরের দিকে তাকাল আকামি।

হাসল কিশোর। মাথা কাত করে ইঙ্গিত করল দেয়ার জন্যে।

রাইফেলটা নিয়ে গুলি করতে যেতেই আবার ঘুরে দাঁড়াল হাতি। আবার বিরক্ত করতে এসেছে তাকে মুংগা আর তার লোকেরা। খেপে গিয়ে আরেকবার কালো দু-পেয়ে জীবগুলোকে তাড়া করল সে।

আবার সরে গেল লোকগুলো।

কি করে এত দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায় ওরা, ভেবে অবাক লাগল মুসার। ভাবল, এ যাত্রা বাঁচতে পারলে কুলিদের কাছ থেকে কায়দাটা রপ্ত করবে ভালমত। কাজে লাগবে ভবিষ্যতে।

আবার গাছের দিকে ফিরে আসতে শুরু করল জানোয়ারটা। তাজ্জব ব্যাপার! ভয়ানক জেদ হাতির। যার পেছনে লাগবে তাকে শেষ না করে আর রাগ যায় না।

আর ওটাকে কাছে আসার সুযোগ দিল না মুসা। গুলি করল।

ভারি রাইফেলের প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল হাতিটা। মাটিতে কাত হয়ে পড়ল না, ভাঁজ হয়ে গেল সামনের দুই হাঁটু, যেন আস্তে বসে পড়ল মাটিতে, একটুও শব্দ না করে।

গুলি করার পর আরেক কাণ্ড ঘটেছে। গাছের ডালে বেকায়দা অবস্থায় দাঁড়িয়ে গুলি করেছে মুসা, রাইফেলের সাংঘাতিক ধাক্কা সইতে না পেরে পড়ে গেল মাটিতে। পাথরে পড়লে হাড়গোড় ভেঙে মরত, কিন্তু ওর ভাগ্য ভাল, গাছের গোড়ায় এখানে একধরনের শ্যাওলা হয়ে আছে। ওগুলোতে পড়ল। এত বড় আর মোটা শ্যাওলা পৃথিবীর আর কোথাও জন্মায় না। অনেক পুরু গালিচা তৈরি করে

রেখেছে যেন, ফলে তাতে পড়ে বেঁচে তো গেলই সে, কোন আঘাতও পেল না।

রাইফেলটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে। উঠে দাঁড়াল। চোখ পড়ল বিশাল হাতিটার ওপর। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না এতবড় একটা দানবকে এত সহজে মেরে ফেলেছে। দুঃখও হচ্ছে। হাতি শিকার করতে আফ্রিকায় আসেনি ওরা, এসেছে বিশাল ওই প্রাণী জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে।

কিশোরও নেমে এল গাছ থেকে। এগিয়ে গিয়ে হাতির কাঁধে বিঁধে থাকা একটা বল্লমের মাথার দিকে তাকিয়ে রইল। মরচে পড়ে গেছে। কেউ ছুঁড়ে মেরেছিল, মাংসে গেঁথে রয়েছে ফলাটা, কিন্তু ডাণ্ডাটা ভেঙে গেছে। পচে ঘা হয়ে গেছে। এ কারণেই বোধহয় মানুষের ওপর এত ক্ষিপ্ত হয়ে ছিল প্রাণীটা।

মাথার কাছে একটা বড় ফুটো। সেটা দেখিয়ে আকামি জিজ্ঞেস করল মুসাকে, 'এখানে গুলি করেছিলে?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

চট করে কিশোরের দিকে তাকাল আকামি। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল দু-জনের। তাড়াতাড়ি একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল সে–শিকলটা তুলে এনে ফাঁস পরিয়ে দিল হাতির পায়ে।

অবাক লাগল মুসার। জিজ্ঞেস করল, 'মরা হাতিকে বাঁধছ কেন?'

'মরেনি,' জবাব দিল কিশোর।

'মানে? মগজে বুলেট খেয়ে পড়ে গেল, মরেনি মানে?'

'হাতি শিকারে তোমার অভিজ্ঞতা নেই তো, তাই বলছো। হাতির মাথার সামনের দিকটায় শুধুই হাড়, পুরু শক্ত হাড্ডি। এই হাড়ে ঢুকে আটকে যায় বুলেট, মগজ পর্যন্ত যেতে পারে না। মগজ অনেক পেছনে, দুই চোখের মাঝামাঝি জায়গায়। গুলির আঘাতে কেবল বেহুঁশ হয়েছে ওটা, শীঘ্রি জেগে যাবে।'

হাঁ হয়ে গেল মুসা। কথাটা জানে না বলে নিজের ওপর রাগ হলো, তবে খুশিও হলো, প্রাণীটাকে খুন করতে হয়নি বলে।

কিশোরের কথাই ঠিক।

গলার গভীর থেকে ভারি একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ উঠে এল হাতিটার। তারপর চাপা গোঙানি। কাছাকাছি ছিল যারা, তাড়াতাড়ি সরে গেল।

চোখ মিটমিট করল হাতিটা। শুঁড় নাড়ল। তারপর বিকট চিৎকার করে আবার খাড়া হয়ে উঠল। তাড়া করতে গেল কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একজন কুলিকে।

কিন্তু পায়ে আটকানো শিকল ঠেকিয়ে দিল তাকে।

পিছিয়ে গিয়ে, আরেকবার চিৎকার করে আবারও তেড়ে গেল হাতি। সাংঘাতিক টান লাগল শিকলে। আর তাকে আটকাতে পারল না শিকল, মট করে ছিঁড়ে গেল।

উধাও হয়ে গেছে কুলিরা।

কাউকে না পেয়ে মোপানি গাছটার দিকে তাকাল সে। কেউ নেই দেখে নিরাশ হয়েই যেন আরেকবার চিৎকার করে, রওনা হয়ে গেল বনের দিকে। পাথরে ঘষা লেগে লেগে শিকলের শব্দ উঠছে ঝনঝন, ঝনঝন। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল সেই শব্দ।

খানিক দূরে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে মুসা আর কিশোর।
স্তব্ধ হয়ে গেছে দু-জনে। এত শক্ত শিকল এমন করে ছিঁড়ে ফেলতে পারবে হাতিটা, কল্পনা করেনি।
জোর গুঞ্জন করে উঠল কুলিরা।

দুই

কান পেতে শুনছে সবাই। হাতির চিৎকার থেমে যেতে হঠাৎ বড় বেশি নীরব মনে হলো বনটাকে। কেমন যেন গা শিউরানো পরিবেশ। মনে হচ্ছে, এর চেয়ে হাতির চিৎকারও ভাল ছিল।
'চলো, এগোই,' কিশোর বলল।
আকামি জানাল, 'কুলিরা আর এগোতে চায় না।'
'কেন?'
'ওরা বলছে এটা খারাপ জায়গা। এখানে কিছু ধরতে পারব না আমরা। এখানে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই। এ রকম জায়গা নাকি আর কখনও দেখেনি ওরা।'
মাথা ঝাঁকাল কিশোর। সে-ও দেখেনি কখনও। মনে হচ্ছে একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছে। আশপাশের দানবদের তুলনায় নিজেকে অতি ক্ষুদ্র লাগছে।
বড় বড় গাছগুলো এমন করে ছেয়ে আছে শ্যাওলায়–দেখে মনে হয় বুড়ো মানুষের দাড়ি। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে দুলছে। ডালে ডালে জড়াজড়ি করে আছে শত শত ফুট লম্বা লতা। যখন তখন নেমে আসছে আকাশের মেঘ, গাছপালা ভেদ করে মাটি ছুঁয়ে ভেসে যাচ্ছে, যেন শিকার দেখে ছোঁ মারার জন্যে নামছে আকাশচারী দানব।
ঘন হয়ে ঝুলে আছে কুয়াশার মত বাষ্প।
ভাবা যায় ঘরের সমান বড় একেকটা ফুল! ইউরোপ আমেরিকায় হাঁটু সমান উঁচু ফুল দেখেছে সে, কিন্তু এখানে সেই একই জাতের ফুলই চারজন মানুষের সমান উঁচু। আমেরিকায় যে বীজ পাখিতে খায়, সেটা এখানে পাখির চেয়ে বড়। যে সব ফার্ন সাধারণত হাঁটুর চেয়ে উঁচু হয় না, এই চন্দ্রপাহাড়ের সেগুলো বড় বড় গাছের সমান। সব কিছুই অস্বাভাবিক বড়।
অদ্ভুত এক জগৎ! শুরুতে তো কিশোর বিশ্বাসই করতে পারছিল না বাস্তবে রয়েছে। চিমটি কেটেও দেখেছে নিজের গায়ে ব্যথা পায় কিনা।
গাছপালার মতই এখানকার প্রাণীরাও বড়। হামিংবার্ড দেখেছে কবুতরের সমান। চিতাবাঘগুলো হয় বাঘের চেয়ে বড়। দেখতে দেখতে একসময় মুসা বলেছে, 'যা অবস্থা, কেঁচো দেখব সাপের সমান!'
মাথা ঝাঁকিয়েছে কিশোর, 'তাই তো হয় এখানে। কেঁচো হয় তিন ফুট লম্বা। মাউন্টেইনস অভ দা মুনের ওপর একটা সাইন্টিফিক রিপোর্ট করেছিল ন্যাশনাল

জিওগ্রাফি ম্যাগাজিন, উনিশশো বাষট্টির মার্চে বেরিয়েছিল সংখ্যাটা। এখানকার দানবীয় প্রাণীদের উল্লেখ আছে তাতে। অভিযাত্রীরা দেখে গেছে তিন ফুট লম্বা কেঁচো।'

'তাহলে এই আজব জায়গা সম্পর্কে কিছু শোনা যায় না কেন?'

'যায় না কে বলল? ম্যাপ দেখলেই পেয়ে যাবে। ভিকটোরিয়া হ্রদের কাছে, অনেক ট্যুরিস্ট যায়। ম্যাপে নাম রুয়েনজোরি। এর মানে রেইনমেকার, বা বৃষ্টি প্রস্তুতকারী। সারাক্ষণই বৃষ্টি হতে থাকে এখানে। আর এর জন্যেই কোন ট্যুরিস্ট রিসোর্ট গড়ে ওঠেনি। মানুষের চোখে না পড়ার আরেকটা বড় কারণ হলো, বেশির ভাগ সময়ই মেঘে ঢাকা পড়ে থাকে এই অঞ্চল।'

'বাব্বাহ্! এই অবস্থা! নামটা রুয়েনজোরি, না? আমি তো জানতাম মাউন্টেইনস অভ দা মুন।'

'এটা রুয়েনজোরির আরেক নাম।'

'পুরানো, না নতুন?'

'পুরানো। প্রাচীন মিশরীয়রা রেখেছিল।'

'কেন?'

'আজব জায়গা বলে। পৃথিবীতে এমন অবস্থা আর কোথাও নেই। এ যেন অন্য এক পৃথিবী। তাই পুরানো ম্যাপে নাম ছিল লুনায়ে মনটিস, অর্থাৎ মাউন্টেইনস অভ দা মুন, অর্থাৎ চাঁদের পাহাড়। একহাজার বছরেরও বেশি কাল ধরে ম্যাপে ওই নাম থাকার পর হঠাৎ করেই মুছে ফেলা হলো। হয়তো লোকে তখন মনে করেছিল এ রকম জায়গা বলে কিছু নেই। কারণ পরের দিকে অভিযাত্রীরা আর এ জায়গাটা খুঁজে পায়নি। বিখ্যাত পর্যটক স্টেনলি–লিভিংস্টোনকে খুঁজে পেয়েছিলেন যিনি, তিনি একবার বলেছেন–ম্যাপে যে জায়গায় চাঁদের পাহাড় দেখানো রয়েছে, ওই জায়গাটাতে শুধু পানি, জাহাজে করে পার হয়েছি আমি; তার মানে ওখানে পাহাড় বলে কিছু নেই। সুতরাং ম্যাপ থেকে মুছে ফেলা হলো তখন। পরে আবার ফিরে এলেন তিনি। আফ্রিকার এই এলাকা ধরে যাওয়ার সময় কয়েক মুহূর্তের জন্যে মেঘ সরে গেলে বেরিয়ে পড়ল পর্বতের চূড়া–চিরতুষারের রাজত্ব, দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। ফিরে গিয়ে চাঁদের পাহাড়ের জায়গায় নতুন নাম বসালেন, রুয়েনজোরি।'

'আগের নামটাই ভাল ছিল। শুনতে একটু কেমন কেমন লাগে বটে, কিন্তু এক ধরনের রোমান্টিকতা আছে। আমরা আরও সহজ করে চাঁদের পাহাড়ই বলব, কি বলো?'

'অসুবিধে নেই।'

এহেন রহস্যময় চাঁদের পাহাড়ের আরও গভীরে যে যেতে রাজি হবে না নিগ্রো কুলিরা, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, বিশেষ করে গুলি খেয়ে মরে যাওয়া হাতি জ্যান্ত হয়ে চলে যাওয়ার পর। হাতির মাথায় কোথায় গুলি লাগাতে হয়, ওরাও জানে না। কারণ বন্দুক দিয়ে শিকার করেনি ওরা, করেছে বর্শা আর তীর-ধনুক দিয়ে।

অধৈর্য হয়ে বলল মুসা, 'সারাদিন এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব নাকি? যেতে বলছ

না কেন? ধমক লাগালেই হয়।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'লাভ হবে না। ধমক দিয়ে কোন আফ্রিকানকে কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না, নিজের ইচ্ছেয় যদি না যায়। যেতে বাধ্য করলে বিপদে ফেলে দেবে। সাংঘাতিক কুসংস্কার এদের, বনের বাঘ-সিংহকে পরোয়া করে না, কিন্তু ভূতের ভয়ে কুঁকড়ে যায়। এদের বেশির ভাগেরই ধারণা প্রতিটি বড় ঝোপ, প্রতিটি পাথর একটা করে ভূতের বাসা। যত বড় ঝোপ হবে, ভূতটাও হবে তত বড়। সময় দিতে হবে ওদের, বুঝতে দিতে হবে, দানবীয় এই গাছপালা আসলে কোন ক্ষতি করতে পারে না।'

সময় কাটছে। কুলিদের বোঝানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করল আকামি। অনেকক্ষণ পর যখন দেখল ওরা, এই 'দানব বনের' ভূত তাদের কোন ক্ষতি করছে না, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও আরও কিছুদূর এগোতে রাজি হলো।

একটা বুট নষ্ট করে ফেলেছে হাতি। আরেকটা পায়ে রেখে কোন লাভ নেই। সেটাও খুলে ফেলে দিয়ে আরেক জোড়া বুট পরে নিল কিশোর।

যেটা ফেলে দিল, মহানন্দে সেটা তুলে নিল হামবি নামের এক কুলি সর্দার। পায়ে টায়ার কেটে তৈরি একজোড়া স্যান্ডেল। সেগুলো খুলে রেখে বুটটা পরে ফেলল সে। আরেক পায়ে জুতোর মত করে পাতা জড়িয়ে লতা দিয়ে বেঁধে নিয়ে গর্বিত দৃষ্টিতে তাকাল সঙ্গী কুলিদের দিকে। এত সুন্দর জুতো জীবনে আর পরেনি সে।

তিন

লোকে কথায় বলে–গর্বে মাটিতে পা পরে না। কিন্তু নতুন জুতোর গর্বে আরও বেশি করে পা ফেলতে লাগল হামবি, নতুন শক্তি দিল যেন বিচিত্র জুতোজোড়া। হাসতে হাসতে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল সে। কিন্তু আচমকা থমকে দাঁড়াল, হাসি মুছে গেছে মুখ থেকে। পাহাড়ী পথ বেয়ে একটা ভূতকে নেমে আসতে দেখেছে।

কুয়াশায় জড়িয়ে থাকায় ভূতটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। ভূত মনে হওয়ার কারণ, মানুষের মত দেখতে হলেও ওটা বেজায় লম্বা। তার ধারণা মানুষ এত লম্বা হতে পারে না।

পেছনের কুলিরাও দেখে ফেলল ভূতটাকে। আতঙ্কে, উত্তেজনায় একে অন্যের গায়ে গুঁতো দিয়ে কলরব শুরু করে দিল ওরা। দু-একজন ঘুরে দৌড় দেয়ারও চেষ্টা করল, ধরে ফেলল আকামি।

দমকা বাতাসে সরে গেল কুয়াশা। স্পষ্ট দেখা গেল এখন মানুষটাকে, ভূত নয়। কিন্তু তবু কুলিদের কারও বিশ্বাস হতে চাইল না।

ওরা যে অঞ্চল থেকে এসেছে, সেখানকার মানুষ পাঁচ ফুটের ওপরে কয়েক ইঞ্চির বেশি লম্বা হয় না। পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা মানুষ উয়াটুসিদের কখনও

দেখেনি ওরা, যারা সাত ফুটের বেশি লম্বা হয়।
উয়াটুসিরা নিগ্রো নয়, সাদা মানুষও নয়, ওদের চামড়া উজ্জ্বল তামাটে রঙের। মাথা সোজা করে চলার স্বভাব, চলেও দ্রুতগতিতে, যেন দমকা বাতাস। ভাল নাচতে পারে, লাফ দিয়ে উঠতে পারে অনেক উঁচুতে।
'কিং সলোমনস মাইনস ছবি থেকে উঠে এসেছে দেখি!' বিড়বিড় করল কিশোর।
মাথা ঝাঁকাল মুসা। ফিল্মটা সে-ও দেখেছে। ওই ছবিতে উয়াটুসিদের একটা চমৎকার দৃশ্য চিত্রায়িত করা হয়েছে।
আঁকাবাঁকা পথ ধরে নেমে আসা লোকটার গা একটা সাদা চাদরে মোড়া, হাতে লম্বা লাঠি। বিদেশীদের দেখে নিশ্চয় অবাক হয়েছে, কিন্তু ভয় পেল না। নিজের চেয়ে আকারে ছোট মানুষকে ভয় করে না উয়াটুসিরা।
এগিয়ে আসছে লোকটা। পাশ কাটানোর সময় সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম জানাল।
'আকামি,' কিশোর বলল, 'ওকে থামতে বলো। ওর সঙ্গে কথা বলব।'
সব আফ্রিকান গোত্রেরই মোটামুটি নিজস্ব একটা ভাষা থাকে, উয়াটুসিদেরও আছে। সেটা জানে না আকামি। সুতরাং সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলল সে—আফ্রিকার অনেক জায়গার লোকেই এই ভাষাটা বোঝে।
বুঝল লম্বা লোকটা। মাথা ঝাঁকাল। তবে সোয়াহিলিতে না বলে কিশোরের দিকে ফিরে ইংরেজিতে বলল, 'কি করতে পারি, বলো?'
অবাক হয়ে গেল কিশোর, 'আপনি ইংরেজি জানেন!'
হাসি ফুটল তামাটে মুখটায়। 'এত বছর ধরে ইংরেজরা মাতব্বরি করল আমাদের ওপর, ভাষাটা জানব না? তবে আমি শিখেছি সিনেমায় কাজ করার সময়।'
'সিনেমা?'
'হ্যাঁ, একটা ছবিতে কাজ করতে হয়েছে আমাকে। অভিনয়।'
'নেচেছেন?'
'নেচেছি, লাফিয়েছি, কথাও বলেছি।'
'লাফিয়েছেন?' কথাটা ধরল মুসা। 'তারমানে ওটা সাংঘাতিক লাফ, নইলে সিনেমায় নিতে যাবে কেন?'
'তা বলতে পারো।'
'আপনার নামটাই কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়নি এখনও,' কিশোর বলল।
'আমার নাম ওগারো। আমি একটা গাঁয়ের মোড়ল।'
ও, তারমানে সাধারণ লোক নয়। ইংরেজি জানে, গাঁয়ের সর্দার…নিজের, মুসার আর আকামির পরিচয় দিল কিশোর।
মুসা বলে বসল, 'পরিচয় তো হলো, এবার আপনার লাফ দেখাবেন? শুনেছি উয়াটুসিরা অনেক উঁচুতে উঠতে পারে লাফ দিয়ে, কথাটা সত্যি?'
ওগারো হাসল, 'সত্যি না হলে কি আর সিনেমার জন্যে ছবি তোলে?'
তা-ও তো বটে। একমুহূর্ত ভাবল মুসা, 'লাফ দিয়ে কত ওপরে উঠতে

পারবেন আপনি?'

'কতটা উঠতে বলো?'

আবার ভেবে নিল মুসা। কিশোরকে দেখিয়ে বলল, 'আমার বন্ধুর মাথার ওপর দিয়ে পেরিয়ে যেতে পারবেন?'

পরামর্শটা ভাল লাগল না কিশোরের। মুসার দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে বলল, 'ভাল করে ভেবে দেখো কি বলছ। যদি পার হতে না পারে, লাথি লাগবে আমার মুখে।'

'লাগবে বলা যায় না, লাগতে পারে,' মুচকি হাসল মুসা।

সব শুনতে পেল ওগারো। 'আরেক কাজ করো বরং। কিশোর, তুমি তোমার বন্ধুকে কাঁধে নিয়ে উঠে যাও। লাফিয়ে দু'জনের মাথার ওপর দিয়ে চলে যাব আমি।'

হেসে ফেলল কিশোর। এগিয়ে গেল মুসার দিকে। তাকে জব্দ করতে চেয়েছিল মুসা এখন পড়েছে বেকায়দায়।

কি আর করবে মুসা, নিজের ফাঁদে নিজেই পড়েছে। কাঁধ নিচু করে দিল। তার কাঁধে উঠে বসে দুই পা ঝুলিয়ে দিল কিশোর মুসার বুকের ওপর।

'কেমন লাগছে?' হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

রাগে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল মুসা।

শব্দ করে হেসে ফেলল কিশোর। তরল স্বরে বলল, 'মন খারাপ কোরো না। লাথি খেয়ে মরার ভয় পাচ্ছ তো? ভয় নেই, সবাইকে একদিন মরতে হবে—আগে আর পরে। তুমি না থাকলে তোমার জন্যে সত্যি খারাপ লাগবে আমার, মুসা। আহা, এতগুলো বছর একসঙ্গে ছিলাম, কত জ্বালিয়েছ আমাকে।'

কিশোরের পা খামচে ধরল মুসা।

'আঁউ!' করে চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'খামচি দিলে কেন!'

'যদি পড়ে যাও, সেজন্যে শক্ত করে ধরলাম।'

'আমি তো তোমার মাথা শক্ত করে ধরে আছি। পড়ব কেন?'

হাসল মুসা। 'বুঝলে না? বুঝিয়ে দিলাম, এখনও মরিনি! জ্বালানো শেষ হয়নি।'

গায়ের চাদর খুলে ফেলল ওগারো। তার তামাটে রঙের সুগঠিত শরীরটা দেখতে লাগছে একটা তামার স্তম্ভের মত।

দুই গোয়েন্দা ভাবল, কিছুদূর পিছিয়ে গিয়ে দৌড়ে এসে লাফ দেবে সে, হাই জাম্প যেভাবে দেয়া হয়। কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল ওগারো। হঠাৎ করে হাঁটু ভাঁজ করে আবার সোজা করে ফেলল, শূন্যে লাফিয়ে উঠল ঘড়ির মত। মুসার মাথা ছাড়াল পা, তারপর কিশোরের। ওর মনে হলো বিশাল পা দুটো এসে বাড়ি মারবে মুখে। চোখ বন্ধ করে ফেলল সে।

কিন্তু মাথার ওপর এক ঝলক দমকা বাতাস ছাড়া আর কিছু টের পেল না। চোখ মেলে দেখতে পেল তার পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছে সর্দার। এতবড় একটা পরিশ্রমের পরও সামান্যতম হাঁপাচ্ছে না। চাদরটা তুলে নিয়ে আবার গায়ে পেঁচাল।

'আর কিছু করতে হবে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'করলে খুবই উপকার হয়,' কিশোর বলল। 'তবে তার আগে বলে নিই, আমরা কেন এখানে এসেছি। আমরা এসেছি জন্তু-জানোয়ার ধরতে। চিড়িয়াখানা, সার্কাস, ফিল্ম কোম্পানির দরকার হয় এ সব জানোয়ার। তাদের কাছে বিক্রি করব। এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার।'

'জানোয়ার ধরা খুব বিপজ্জনক কাজ। একা করা কঠিন।'

'একা নই আমরা। তিরিশ জন লোক আছে। সবাই আফ্রিকান। আফ্রিকা চেনে ওরা, কোন্ জানোয়ার কোথায় থাকে, ওদের স্বভাব কেমন, জানে।'

মাথা নাড়ল সর্দার। 'ওরা জানে কেবল খুন করতে। জ্যান্ত ধরতে জানে না।'

'কিন্তু আমার লোকেরা শিখে ফেলেছে। কয়েক মাস ধরে আমাদের সঙ্গে আছে ওরা। অনেক জানোয়ার ধরেছি–জিরাফ, মোষ, হায়েনা, চিতাবাঘ, বেবুন, জলহস্তী, অজগর সাপ, দাঁতালো শুয়োর, বুশ-বেবি, হানি ব্যাজার, আরও অনেক কিছু।'

'ও, তাহলে তো অনেকই এগিয়েছ। নিয়েই ফেলেছ সব।'

'না, এখনও বাকি আছে। সবচেয়ে বড়টাকেই ধরা হয়নি এখনও।'

'হাতির কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। সাধারণ হাতি আগেই ধরতে পারতাম। তবে আমরা চাই চন্দ্রপাহাড়ের হাতি। বাচ্চা একটা হাতি অবশ্য চলে এসেছে আমাদের সঙ্গে। ওটার মা-কে মেরে ফেলেছে পোচাররা। হাতিটাকে বাঁচাতে গিয়ে পোচারদের মার খেয়ে আহত হয়েছে আমার আরেক বন্ধু রবিন মিলফোর্ড। অবস্থা এতটাই খারাপ, ফিরতি প্লেনেই দেশে, অর্থাৎ আমেরিকায় পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি তাকে। আমার বন্ধু মুসা মরা হাতির বাচ্চাটাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিল। বাচ্চাটা চলে এসেছে তার সঙ্গে। নেওটা হয়ে গেছে। খাঁচার বাইরে থাকলে মুসাকে ছেড়ে এক পা নড়বে না।'

হাসল সর্দার। 'কিন্তু এখানকার হাতি তো ধরতে পারবে না।'

'কেন পারব না?'

'এগুলো অনেক বড়, অনেক শক্তি গায়ে। চন্দ্রপাহাড়ের হাতির মত শক্তিশালী আর কোন জানোয়ার পৃথিবীতে নেই। কারণ ওরা পাহাড়।'

এই প্রথম লোকটার চোখে ভয় দেখতে পেল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'পাহাড়ের মত বড় বলতে চাচ্ছেন তো?'

'না, আসল পাহাড়ই বলতে চাইছি।'

সচল কুয়াশায় ডুবছে-ভাসছে যেন পেছনের আর আশপাশের পাহাড়গুলো।

'সাধারণ জায়গা মনে কোরো না এটাকে,' সর্দার বলল, 'জাদুর ছড়াছড়ি এখানে। চেহারা দেখে এখানে জিনিস চেনা মুশকিল। খালি চোখে যা দেখা যায়, আসলে সেটা সে-জিনিস নয়, অন্য কিছু। মস্ত ধোঁকা। আমাকে পাগল ভাবছ তো? বোকা ভাবছ? কোনটাই আমি নই। আমাদের ওঝারাও বোকা নয়। তাদের কথা বিশ্বাস করি আমরা। এই ভূমি হাতিদের পবিত্র স্থান। কুয়াশায় ঢেকে দেয় পাহাড়-পর্বত, হঠাৎ দেখবে একটা হাতি দাঁড়িয়ে আছে তোমার সামনে। পরক্ষণেই নেই, সেখানে আবার পাহাড়। দেখলে কে অবিশ্বাস করবে হাতি আর

পাহাড় এক নয়? সুতরাং বুঝতেই পারছ, হাতির সঙ্গে লাগতে যাওয়া আর পর্বতের বিরুদ্ধে লড়াই করা এখানে একই কথা।'

আজব বিশ্বাস, ভাবল কিশোর। অনবরত পাক খেয়ে ঘুরে মরছে যেন কুয়াশার স্তর, তার মধ্যে দানবীয় ফুল, অজগর সাপের মত মোটা মোটা লতাগুলোকে কেমন অপার্থিব লাগছে। 'আপনি বলতে চাইছেন হাতি যদি ধরেও ফেলি, ওটা পরে পাহাড় হয়ে যাবে?'

'তা বলছি না। বিদেশী মানুষের জাদু আমাদের জাদুর চেয়ে অন্য রকমও হতে পারে। আমি বলছি, হাতি ধরায় আমাকে সাহায্য করার অনুরোধ কোরো না। উয়াটুসিরা অসহায়।'

'বেশ, হাতি ধরতে না হয় না-ই গেলেন। কিন্তু আরও সাহায্য করতে পারেন আমাদের।' গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে গুজগুজ, ফিসফাস করছে কুলিরা। 'এগোতে সাহস পাচ্ছে না ওরা। একটু বোঝাবেন ওদের? বলবেন, সামনে কোন বিপদ নেই?'

'কিন্তু বিপদ নেই এ কথা তো বলতে পারি না। হাতির পেছনে লাগলে অবশ্যই আছে। সোজা গিয়ে মৃত্যুর মুখে ঢুকবে। এগিয়ে এসে পিষে মারবে তোমাকে পর্বত। ওগুলোর মধ্যে যে দুষ্ট প্রেতেরা বাস করে,' হাত তুলে আশপাশের দানবীয় উদ্ভিদগুলোকে দেখাল সর্দার, 'ওরা চোখের পলকে বুনো জানোয়ার হয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলবে তোমাদের।'

ওগারোর কুসংস্কার দেখে মনে মনে হাসল কিশোর, তবে মুখে সেটা প্রকাশ করল না। বলল, 'সেই ভাবনা আমাদের। বেশ, সামনে বিপদ নেই, একথাও নাহয় না বললেন। সামনে যে তাঁবু ফেলার নিরাপদ জায়গা আছে এটা বলতে নিশ্চয় আপত্তি নেই?'

'না, তা নেই, এ কথা খুশি হয়েই বলতে পারি। আমার গাঁয়েই থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি তোমাদের। বেশি দূরে নয়। তোমার আর সব লোক কোথায়? এখানে তো মাত্র বারোজন?'

'এটা স্কাউটিং পার্টি,' কিশোর জানাল। 'আগে আগে হেঁটে চলে এসেছি আমরা, পথঘাট চিনে নেয়ার জন্যে। মোটর চলার রাস্তা আছে কিনা দেখে গিয়ে ওদেরকে খবর দিলে ওরা আসবে। জীপ আর ট্রাক নিয়ে পাহাড়ের গোড়ায় অপেক্ষা করছে ওরা। খবর পেলেই রওনা হবে। এখন আপনি আমাদের সাহায্য না করলে সব ভজকট হয়ে যাবে।'

'দেখি, কি করতে পারি,' বলে ভয়ে কুঁকড়ে থাকা কুলিদের দিকে এগোল ওগারো।

মন দিয়ে সর্দারের কথা শুনল লোকগুলো। তার গাঁয়ে ওদেরকে থাকতে দেয়া হবে জেনে মুহূর্তে খুশি হয়ে উঠল ওরা, ভয় কেটে গিয়ে উজ্জ্বল হলো চোখমুখ। আনন্দে হুল্লোড় করে উঠল।

আবার এগিয়ে চলল দলটা। নানা রকম দানবীয় উদ্ভিদের অভাব নেই পথের পাশে, কিন্তু এখন ভয় কেটে গেছে কুলিদের। তবে গাছগুলোর কাছ থেকে দূরে থাকছে যতটা সম্ভব। মানুষ সমান উঁচু বিছুটির রোঁয়াগুলো বড় বড় কাঁটার মত,

সুচের মত তীক্ষ্ণ। তাড়াহুড়ো করে এগোতে গিয়ে এই কাঁটার খোঁচা খেলো মুসা। বুশ জ্যাকেট আর সাফারি ট্রাউজারের মত ভারি কাপড়ও অতি সহজেই ভেদ করে চামড়ায় ফুটে গেল কাঁটা। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে।

পথের ওপর পড়ে থাকা বিছুটির একটা ভাঙা ডাল তুলে নিয়ে কাঁটাগুলো পরীক্ষা করে কিশোর বলল, 'এতে লাগলে গাড়ির চাকাও ফুটো হয়ে যাবে! সাংঘাতিক শক্ত!'

এগিয়ে গিয়েছিল সর্দার। গোলমাল কিসের দেখার জন্যে ফিরে এল। মুসার হাতের আঁচড় থেকে রক্ত বেরোতে দেখে আন্দাজ করে ফেলল কি হয়েছে। গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'হবেই। চিতাবাঘের নখ ধারালই হয়।'

'চিতাবাঘ পেলেন কোথায়?' অবাক হয়ে বলল মুসা, 'এ তো কাঁটা!'

'চিতাবাঘ যখন মরে যায়, এই গাছ হয়ে যায়। আবার গাছ মরে গিয়ে চিতাবাঘ হয়।'

সর্দারের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। ইংরেজি জানা বুদ্ধিমান একজন মানুষের এরকম অদ্ভুত বিশ্বাস জন্মায় ভাবতে অবাক লাগে। 'সব গাছপালাই কি নানা রকম জানোয়ার?'

'না, সব জানোয়ার নয়। কিছু কিছু গাছ আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মা।'

'তাহলে নিশ্চয় ওসব গাছকে ভয় করার কিছু নেই। আপনার পূর্বপুরুষরা নিশ্চয় সব ভালমানুষ ছিলেন?'

'তা ছিলেন। ভাল এবং দয়ালু। কিন্তু মরার পর খারাপ হয়ে গেছে। খারাপ এবং নিষ্ঠুর।'

'কেন এ রকম হলো?'

'কারণ ওদেরকে খাবার দিই না আমরা। দিতে পারি না। অনেক বেশি লোক। কত দেব? যাকে দিতে পারি না, সে-ই আমাদের শত্রু হয়ে যায়, রেগে গিয়ে ক্ষতি করার চেষ্টা করে। ধারাল নখওয়ালা জানোয়ার হয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে, বিষাক্ত রস খাইয়ে আমাদের অসুস্থ করে ফেলে, গায়ের ওপর পড়ে পিষে মারে।'

সর্দারের কথাকে সত্য প্রমাণ করার জন্যেই যেন গাছ থেকে ঝরে পড়ল একটা বিশাল লবেলিয়া ফুল। লাফ দিয়ে সরে গেল নিচে যে লোকটা ছিল সে। গায়ে পড়লে মরত।

ফুলটা ভাল করে দেখল কিশোর। নীল রঙের পাপড়িগুলো যেন একেকটা ইস্পাতের পাত। দশ-বারো বছরের একটা ছেলের সমান বড় ফুলটা এত ভারি, টেনে তুলতেই কষ্ট হয়।

'চমৎকার নমুনা,' বলে আকামির দিকে ফিরল কিশোর। 'দু-জন লোককে আসতে বলো তো, তুলে নিক।'

হাত তুলল সর্দার। 'না না, নিয়ো না, আমার কথা শোনো। থাক এখানেই। এটা সঙ্গে নেয়ার মানে মৃত্যুকে বহন করা। দু-জন মানুষ হারাতে না চাইলে এ কাজ কোরো না।'

ফিসফিস করে বন্ধুকে বলল মুসা, 'লোকটা পাগল। এসো, আমরা দু-জনেই

বয়ে নিই।'

'না, মাইন্ড করে বসতে পারে। তাহলে বেকায়দায় পড়ব আমরা। ও এখানকার সর্দার, ভুলে যেয়ো না।'

পিপার মত ফুলটাকে ঠেলে রাস্তার ওপর থেকে সরিয়ে দিল কিশোর। 'থাক এখানে। পরে এসে নেব।'

গাঁয়ের দিকে এগোতে এগোতে আরও নানারকম অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল ওদের। মাটিতে চার ফুট উঁচু হয়ে জন্মে থাকা শ্যাওলার পাশাপাশি গাছের গায়ে আঠারো ফুট পুরু হয়ে জন্মেছে আরেক ধরনের শ্যাওলা। ওগুলোর মধ্যে গর্ত করে বাসা বেঁধেছে পেঁচা। কোন কোন জায়গায় এমন করে ঢেকে ফেলেছে, মূল গাছটাকেই আর দেখা যায় না, মনে হয় শ্যাওলার বড় বড় স্তম্ভ। সেইসব স্তম্ভকে আবার ছেয়ে রেখেছে অপূর্ব সব অর্কিড, কি তাদের রঙ—লাল, গোলাপী, নীল, সবুজ! রামধনুর সাতরঙের ছড়াছড়ি এখানে।

সামনে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেল জঙ্গল। ওখানে ঘাসের রাজত্ব। আর ঘাসও বটে! মানুষের মাথা ছাড়িয়ে যায়।

তারপর আবার বদলে গেল দৃশ্য। কলাবাগানে ঢুকল ওরা। কলাগাছ না বলে তালগাছ বলাই ভাল, আর কলাগুলোকে কলা না বলে শসা। এত বড়।

মাটিতে পড়ে থাকা একটা কলা তুলে নিয়ে ছুরি দিয়ে কেটে অবাক হয়ে গেল মুসা। কিছু নেই ভেতরে, কেবল বড় বড় বীচি। শাঁসটা কি হয়েছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, বেশিদিন পড়ে থাকলে খোসার ভেতরেই শাঁসটা নষ্ট হয়ে যায়।

আরও এগোতে মানুষের কলরব শোনা গেল। বোঝা গেল, গাঁয়ের কাছে চলে এসেছে।

গাঁয়ে ঢোকার মুখে পথের পাশে একটা বিরাট ঘর। ফুলে ফুলে ঢাকা। ভেতরে তাকে তাকে সাজানো রয়েছে ফল, শস্য, আর মাংস।

'এটা কি?' সর্দারকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'দুষ্ট প্রেতের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে এই ব্যবস্থা। খাইয়ে-দাইয়ে ওদের পেট ভরিয়ে রাখতে পারলে মানুষের দিকে আর নজর দেবে না।'

'কাজ হয় এতে?'

'সব সময় হয় না,' স্বীকার করল সর্দার। 'এত কিছু দেয়ার পরেও গাঁয়ে ঢোকে। নিয়ে আসে রোগ-শোক, আমাদের গরু ছাগল চুরি করে নিয়ে যায়। এ সব করতে করতে সাহস এতটাই বেড়ে গেছে, কিছুদিন ধরে আমাদের ছেলেমেয়েদেরও ধরে নিতে আরম্ভ করেছে। রাতের বেলা রহস্যজনক ভাবে হারিয়ে যায় ছেলেমেয়েগুলো। পরদিন সকালে পাহাড়, জঙ্গল আঁতিপাতি করে খুঁজেও ওদের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। একবার গেলে ফেরে না আর কখনও।'

বিষণ্ণ দেখাল সর্দারকে। 'আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী জাদুও এখানে বিফল হয়েছে। কি করব বুঝতে পারি না। যাই হোক, আমাদের যন্ত্রণার কথা বলে তোমাদের মন খারাপ করতে চাই না। এসো, আমাদের গাঁয়ে স্বাগতম।'

আফ্রিকার অন্যান্য গাঁয়ের চেয়ে ওগারোর গ্রাম অনেক বেশি সুন্দর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে করে রাখা হয়েছে। শক্ত, মোটা শ্যাওলা দিয়ে বেড়া

দেয়া হয়েছে কুঁড়েগুলোর; কাঠামো আর খুঁটি বাঁশের তৈরি। বাঁধা হয়েছে লিয়ানা লতা দিয়ে। পেপিরাসের ডাঁটি দিয়ে চাল ছাওয়া হয়েছে–প্রাচীন মিশরীয়রা যে জিনিস দিয়ে কাগজ বানাত, সেই একই জিনিস। তালপাতা দিয়ে তৈরি চালার চেয়ে এ চালা অনেক বেশি টেকসই। চালার নিচের দিকটা অনেকখানি করে বাড়িয়ে রাখা হয়েছে, যাতে বেড়াগুলোতে বৃষ্টির পানি না লাগতে পারে।

কিন্তু ঘরবাড়ির চেয়ে গাঁয়ের মানুষের প্রতিই বেশি কৌতূহল আর আগ্রহ কিশোর-মুসার। সাত ফুটের বেশি লম্বা নারী-পুরুষ এগিয়ে এল তাদের সঙ্গে মোলাকাত করার জন্যে। গায়ের সাদা চাদরের কারণে মার্বেলের স্তম্ভ বলে মনে হচ্ছে ওদেরকে। মেহমানদের ঘিরে ফেলল ওরা।

নিজের ভাষায় আগন্তুকদের পরিচয় গ্রামবাসীদের জানাল সর্দার।

ওগারোর মতই সহজ-সরল গ্রামের মানুষগুলো। হাসিমুখে মেহমানদের অভ্যর্থনা করল।

চার

একটা ব্যাপার লক্ষ করল কিশোর, গাঁয়ের সব মানুষ সাত ফুট উঁচু নয়।

ওদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে অনেক খুদে খুদে মানুষ, যাদের গায়ে সাদা চাদর নেই, শুধু কোমরের কাছে একটুকরো গাছের বাকল বাঁধা। ওটাই ওদের নেংটি। উয়াটুসিদের মত তামাটে নয় এদের গায়ের রঙ, কুচকুচে কালো।

সবচেয়ে আজব ব্যাপারটা হলো, ওদের উচ্চতা। তিন থেকে চার ফুট, তার বেশি নয়। অথচ সবাই প্রাপ্তবয়স্ক।

'এ তো মনে হচ্ছে গালিভারের গল্পের দেশে চলে এলাম!' অবাক হয়ে বলল মুসা। 'ব্রবডিংনাগ আর লিলিপুট, দু-জাতের একসঙ্গে বসবাস। একদল দৈত্য, আরেক দল বামন। কি করে সম্ভব হলো এটা?'

'বামনরা হলো পিগমি,' কিশোর বলল। 'কঙ্গোর এই এলাকার অনেক বিস্ময়ের একটা এই বিস্ময়। একই জায়গায় যেমন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মানুষের বাস, পাশাপাশি বাস পৃথিবীর সবচেয়ে খুদে মানুষদেরও–উয়াটুসি এবং পিগমি। উয়াটুসিদের কুঁড়ের পেছনে ওই যে ওইখানে মৌচাকের মত খুপরিগুলো দেখছ, ওগুলো পিগমিদের বাড়িঘর।'

ওদের কথা শুনছিল সর্দার। বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। গাঁয়ের একটা অংশে পিগমিরা থাকে। ওরা আমাদের চাকর। তবে ওদেরকে অসম্মান কিংবা অপমান করার কোন কারণ নেই। ওদের সর্দারের সঙ্গে দেখা হয়েছে? ওর নাম হিবা।'

নাম ধরে ডাকতেই বড় পুতুলের আকারের একজন মানুষ বেরিয়ে এল ভিড়ের মধ্যে থেকে। আন্তরিক ভঙ্গিতে হাত মেলাল কিশোর-মুসার সঙ্গে, অবশ্যই আফ্রিকান কায়দায়। শরীরের তুলনায় মাথাটা অস্বাভাবিক বড়। চোখের কোণে আর গলার ভাঁজ দেখেই বোঝা যায়, অনেক বয়েস তার, বুড়ো মানুষ।

উচ্চতার এই তারতম্য অদ্ভুত লাগছে কিশোরের কাছে।

কালো বনের কালো লোকটার চেহারার সঙ্গে মানুষের চেয়ে শিম্পাঞ্জীর মিলই বেশি। কিশোরকে আরও অবাক করে দিয়ে ইংরেজিতে কথা বলে উঠল সে, 'তোমাদের সাহায্য করতে পারলে খুশি হব আমরা। তোমাদের দেশের লোকেরা কথা-বলা-ছবি তুলতে এসেছিল আমাদের দেশে। তখন তোমাদের ভাষা শিখেছি।'

'তোমাদের দেশ' বলতে আমেরিকানদের বোঝাচ্ছে হিবা। তার জানা থাকার কথা নয়, আমেরিকা থেকে এলেও কিশোর আমেরিকান নয়, বাংলাদেশী। আর মুসা তো তাদেরই দেশী, আফ্রিকান। সেসব ব্যাখ্যা করতে গেলে বাংলাদেশ আর আমেরিকা সম্পর্কে অনেক জ্ঞান দিতে হবে লোকটাকে। অত কথার মধ্যে গেল না কিশোর। হেসে বলল, 'আপনাদের ভাষাও যদি আমি এমন করে বলতে পারতাম, খুব ভাল হত।'

'সর্দার হিবা বলল, হাতি মারতে এসেছ তোমরা। আমরা তোমাদের সাহায্য করব।'

পাহাড়ের সমান হাতি মারতে সাহায্য করবে এই বানরের সমান মানুষ!–হাসি পেল কিশোরের। তবে হাসল না। বলল, 'তাহলে তো উপকারই হয়। অবশ্য একটা ভুল করছেন, হাতি মারতে নয়, হাতি ধরতে এসেছি আমরা।'

'ওই একই কথা হলো,' বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল হিবা। 'ধরার পরই তো মারা।' মাংস না খেয়ে জ্যান্ত হাতি কেন ধরে নিয়ে যাবে বিদেশীরা, এটা বুঝবে না সে। তাকে বোঝানোর চেষ্টাও করল না কিশোর। ধরতে সাহায্য করলেই হয়। পরের কথা পরে।

কিশোর কি ভাবছে, আন্দাজ করে ওগারো বলল, 'পিগমিরা অনেক বড় হাতি শিকারি। আমরা, উয়াটুসিরা কাউকে ভয় পাই না, অথচ হাতি মারার সাহস নেই। কিন্তু পিগমিদের আছে। ওরা আমাদের চেয়েও সাহসী। তাদের জাদুর আলাদা ক্ষমতা আছে। আমি এখনও জানি না, হাতি ধরতে পারবে কিনা তোমরা, কিন্তু যদি পারো, এই পিগমিদের সাহায্যেই পারবে।'

মাথা নুইয়ে সর্দারের কথায় শ্রদ্ধা জানাল কালো বামন, বলল, 'হাতি ধরতে বিদেশীদেরকে সব রকম সাহায্য করব আমরা।'

আশ্বাস পাওয়া গেছে। একজন কুলিকে সঙ্গে দিয়ে গাঁয়ের একজন লোক পাঠিয়ে দিল ওগারো, পাহাড়ের গোড়ায় রেখে আসা কিশোরদের বাকি দলটাকে খবর দেয়ার জন্যে।

চোদ্দটা ট্রাক, লরি, জীপ আর ল্যান্ডরোভারের সারি এসে ঢুকল গাঁয়ের পাশের খোলা জায়গায়। ক্যাম্প করার ব্যবস্থা হলো ওখানে।

উয়াটুসিদের বড় বড় শিংওয়ালা গরুগুলো ঘাস খেতে খেতে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে লাগল একদল আজব মানুষকে।

তাঁবু খাটানো দেখতে এসেছে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরাও। তাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল বছর তেরো বয়েসের একটা ছেলে। গায়ের রঙ উজ্জ্বল তামাটে। সুন্দর চোখ, মুখে হাসি। ভাবভঙ্গিতে বোঝা গেল, কথা বলতে চায়।

ছেলেটাকে পছন্দ হয়ে গেল মুসার। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ইংরেজি জানো?'

'জানি। তবে বাবার মত বলতে পারি না।'

দ্রুত তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল মুসার। জানল, ছেলেটার নাম আউরো। সর্দার ওগারোর ছেলে সে।

চমৎকার একটা হ্রদ আছে এখানে। দুপুরের পর সেটা দেখিয়ে আউরোকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'মাছ আছে এখানে?'

'অভাব নেই,' আউরো বলল। 'মাছ ধরতে যেতে চাও?'

রাজি হয়ে গেল মুসা।

দৌড়ে গিয়ে বাবার কুঁড়ে থেকে পেপিরাস-আঁশের সুতোয় তৈরি দুটো ছিপ নিয়ে এল আউরো। সুতোর মাথায় কোনও প্রাণীর হাড় দিয়ে বানানো দুটো বড়শি বাঁধা। বুনো শুয়োরের চোয়ালের হাড়ে তৈরি একটা বেলচা জাতীয় জিনিসও আনল।

'এটা কি জন্যে?' জানতে চাইল মুসা।

'কেঁচো তোলার জন্যে।'

এক জায়গায় ভেজা নরম মাটি খুঁড়তে শুরু করল আউরো।

'দুটো কেঁচো হলেই চলবে আমাদের,' দুটো বড়শির দিকে তাকিয়ে বলল মুসা। চন্দ্রপাহাড়ের কেঁচোর আকারের কথা ভুলে গিয়েছিল।

অবাক হলো আউরো। 'দুটো কেন?'

'দুই ছিপের জন্যে দুটো।'

'একটাই তো একশো বার গাঁথতে পারবে।'

কথাটা বুঝল না মুসা।

ইঞ্চি ছয়েক খোঁড়ার পরই আচমকা গর্তের তলার মাটি ফুঁড়ে ছিটকে বেরোল একটা বাদামী মাথা।

'সাবধান, সাপ!' ঝট করে পেছনে সরে গেল মুসা।

'সাপ না।'

মাথার পেছনে একটু নিচে যেখানে ঘাড় থাকার কথা সেখানটা চেপে ধরল আউরো। খুঁড়েই চলল মাটি, যতক্ষণ না টেনে বের করে আনতে পারল জীবটাকে। তারপর হাত লম্বা করে তুলে ধরল।

পিগমির সমান লম্বা জীবটা, মুসার কব্জির মত মোটা। মাথাটা বাদামী, শরীরটা আগুনে-লাল। হাঁ করে রেখেছে কুৎসিত মুখ। এ ছাড়া চেহারায় আর কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

দূরে দাঁড়িয়ে ছিল কিশোর। দেখতে এগোল।

'চোখও নেই,' মুসা বলল, 'কানও নেই।'

'আমাদের দেশের সাধারণ কেঁচোর মতই,' কিশোর বলল। 'কানে শোনে না, গন্ধ পায় না, স্বাদ বোঝে না। তবে অল্প অল্প দেখতে পায়।'

'চোখ ছাড়া কি দিয়ে দেখে?'

'দেখে বলা যাবে না। খুদে খুদে ইন্দ্রিয় আছে এটার, এর সাহায্যে আলো আর অন্ধকারের পার্থক্য বোঝে। দিনের বেলা মাটির নিচে থাকে, রাতে বেরোয়।

তখন টর্চের আলো গায়ে ফেললেই তাড়াতাড়ি আবার গিয়ে মাটির নিচে সেঁধোবে।'

দানবীয় কেঁচোর শরীরের নিচের দিকে দু-পাশে এক ধরনের খোঁচা খোঁচা জিনিস আছে।

'এগুলো দিয়ে কি হয়?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'এগুলো মাটির নিচে সুড়ঙ্গ করে এগোতে সাহায্য করে কেঁচোকে।'

'কিন্তু সুড়ঙ্গই বা করে কি করে? খুঁড়ে ফেলা মাটি যায় কোথায়?'

'সেটাই তো এক বিস্ময়। শরীরের ভেতর দিয়ে পার হয়ে যায় ওই মাটি। খোঁড়া মাটি গিলে ফেলে কেঁচো, সেগুলো আবার বের করে দেয় পেছনের একটা ফুটো দিয়ে। ফলে শরীরটা এগিয়ে গেলেও মাটিতে কোন সুড়ঙ্গ রয়ে যায় না, বের হওয়া মাটিতেই ভরে যায় খোঁড়া অংশটা।'

'আচ্ছা, এই কেঁচোটা পুরুষ না মেয়ে?'

'মেয়েও, পুরুষও।'

'তারমানে উভয়লিঙ্গ! বাপরে বাপ! একটা সাধারণ কেঁচোর মধ্যে এত কারিগরি!'

'এখন বুঝলে তো, কেঁচোও সাধারণ কোন প্রাণী নয়।'

হ্রদের পাড়ে একটা কলাগাছের ভেলা বাঁধা আছে। মুসাকে নিয়ে সেটাতে চড়ল আউরো। বেয়ে নিয়ে এল বেশি পানিতে। মাথা কেটে ফেলে আগেই কেঁচোটাকে মেরে ফেলেছে সে। এখন সেটাকে কেটে দুই টুকরো করে বড়শিতে গাঁথল।

পানিতে বড়শি ফেলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টান পড়ল সুতোয়। টেনে তুলল মুসা। ক্যাটফিশের মত একটা মাছ, তবে আরও অনেক বড়।

মুসার পর পরই আউরোও ধরে ফেলল আরেকটা।

'অবাক কাণ্ড!' মুসা বলল, 'এখানকার সব কিছুই বিশাল, কেবল পিগমিরা বাদে। তোমরা, উয়াটুসিরা দুনিয়ার সবচেয়ে লম্বা মানুষ। এখানকার হাতিগুলো একেকটা দানব। ফুল বড়, গাছ বড়, এমনকি অতি সাধারণ একটা কেঁচো, তা-ও সাপের সমান। ব্যাপারটা কি?'

আউরো কিছু বলার আগেই পেছনের পর্বত থেকে ভেসে এল বিকট আওয়াজ। গাঁয়ে আসার পর এই শব্দ আরও শুনেছে ওরা, কিশোর বলেছে—পর্বতের গা থেকে কয়েক লক্ষ টন বরফ ভেঙে পড়ার আওয়াজ। কিন্তু উয়াটুসিদের বক্তব্য আলাদা।

আতঙ্কে গোল গোল হয়ে গেল আউরোর চোখ। 'তুমি বলছ আমরা বড়, কিন্তু আমাদের চেয়েও অনেক বড় সে!'

'সে? সে কে?'

'বজ্রমানব। সবচেয়ে লম্বা গাছটার চেয়েও লম্বা সে। হেঁটে যাওয়ার সময় মাটি কাঁপে থরথর করে। কথা বলার সময় মনে হবে হাজারখানেক সিংহ গর্জন করছে। তোমরা যাকে বিদ্যুৎ চমকানো বলো, আসলে সেটা হলো তার চোখের দৃষ্টি—রেগে গেলে অমন করেই জ্বলতে থাকে। সেই আগুন গাছে আঘাত হানলে

গাছ ভেঙে পড়ে। গাঁয়ের ওপর পড়লে ঘরবাড়ি সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সে আসে রাতের বেলা, চুপি চুপি। প্রথমে আমাদের গরু-ছাগল নিয়ে যেত। এখন মানুষও ধরে নিয়ে যায়। সন্ধ্যা নামলে আসে, ভোরের আগেই চলে যায়।'

'অতই যদি শক্তিশালী, চোরের মত আসে কেন?'

'তা বলতে পারব না।'

'আসলে সে ভীতু। নয়তো অন্যায় কিছু করে। সে-জন্যেই চুপি চুপি আসে।'

'ওরকম করে বোলো না!' ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল আউরো। 'বজ্রমানবকে চেনো না! তার বিরুদ্ধে কথা বললে তোমাদেরও ছাড়বে না। তোমাদের মারবে, তোমাদের জন্তু-জানোয়ার সব কেড়ে নেবে।'

হ্রদের একপাশে গ্রাম। অন্য পাশে পানিতে নেমে এসেছে বন। গাছের নিচে কালো ছায়া।

'অন্ধকার হয়ে আসছে,' আউরো বলল। 'বাড়ি চলে যাওয়া উচিত।'

লগি বেয়ে ভেলাটাকে তীরে নিয়ে এল ওরা। মাছ দুটো এবং বাকি কেঁচোর পুরোটাই মুসাকে দিয়ে দিতে চাইল আউরো।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কেঁচো দিয়ে কি করব?'

'রান্না করে খাবে। খুব স্বাদ।'

'ওয়াক, থুহ্! বলে কি! কেঁচো আবার খায় নাকি! সাপ হলেও কথা ছিল। তোমরা সাপ খাও?'

'খাব না কেন? সাপের মাংস খুব ভাল, মুরগীর মাংসের চেয়ে নরম আর রসাল। কেঁচোর মাংস আরও ভাল, কারণ এগুলোর হাড় নেই।'

হাড় থাকুক আর না থাকুক, খিদেয় মরে গেলেও কেঁচো খেতে পারবে না মুসা।

'মাছগুলো আমি নিয়ে যাই,' বলল সে, 'কেঁচোটা তুমিই নাও। মাছ ধরতে নিয়ে গিয়ে অনেক মজা দিলে, ধন্যবাদ তোমাকে। সকালে দেখা হবে।'

তাঁবুতে এসে মাছ দুটো রান্না করার জন্যে বাবুর্চির হাতে দিল মুসা। খেতে বসে বজ্রমানবের কাহিনী বন্ধুকে শোনাল সে।

'কেমন গাঁজা মনে হয় না?' মুসা বলল।

'হয়ও, আবার না-ও,' বলল কিশোর। 'যারা বিশ্বাস করে তাদের হদ্দ বোকা বলতে পারো। তবে এটাই স্বাভাবিক।'

'স্বাভাবিক! গাছের চেয়ে লম্বা, বজ্র নিক্ষেপ করে, গরু-মানুষ এ সব চুরি করে, এমন মানুষের গল্প তুমি বিশ্বাস করো!'

'আমি না করলেও দুনিয়ার অনেকেই এ ধরনের আজগুবী গল্প বিশ্বাস করে, বিশেষ করে বনের লোকেরা। আমাদের মত তো সভ্য জগতে বাস করে না ওরা, স্কুলে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায় না। বজ্রপাত, ভূমিকম্প, বন্যা, এ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেন ঘটে, তার বৈজ্ঞানিক কারণ জানে না। কুসংস্কার থাকবেই ওদের। তাই ওদের বিশ্বাস এসব ঘটানোর মূলে থাকে দুটো শক্তি—হয় দেবতা, নয়তো শয়তান। এই গাঁয়ে গরু-ছাগল হারাচ্ছে, ছেলেমেয়ে নিরুদ্দেশ হচ্ছে, ভয় ওরা পাবেই। আমারই তো চিন্তা হচ্ছে।'

'তার মানে বজ্রমানবের গল্পটা তুমি বিশ্বাস করছ?'

'ওরা যে ভাবে করছে সে-ভাবে করি না। আমার ধারণা গরু-ছাগল চুরি এবং বাচ্চাদের তুলে নিয়ে যাওয়ার পেছনে মানুষের হাত আছে। আজ রাতে পাহারার ব্যবস্থা করব। আমাদের জানোয়ারগুলোও নিতে আসতে পারে। গরু-ছাগলের চেয়ে দাম অনেক বেশি ওগুলোর।'

দলের সবচেয়ে বিশ্বাসী দু-জন লোক আকামি আর মুংগাকে পাহারায় নিয়োজিত করল কিশোর।

'আমি জানি তোমরা খুব ক্লান্ত,' ওদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বলল সে। 'সারাটা দিন কঠোর পরিশ্রম করেছ। কিন্তু জানোয়ারগুলো চুরি হয়ে গেলে এই পরিশ্রমের কোন অর্থ থাকবে না। পালা করে পাহারা দেবে তোমরা। একজন জেগে থাকলে আরেকজন ঘুমাবে।'

কিশোরের কথায় প্রতিবাদ করল না ওরা।

মুংগা বলল, 'ভাববেন না বাওয়ানা। আমাদের অসুবিধে হবে না। আমরা বেঁচে থাকতে জানোয়ার চুরি করতে পারবে না কেউ।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে জানোয়ারের খাঁচাগুলোর দিকে তাকাল কিশোর। অগ্নিকুণ্ডের আলোয় খাঁচার জানোয়ারগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ে না। সাবধানে থাকতে হবে, নিজেকে বোঝাল সে।

মুসা দাঁড়িয়ে আছে হাতির বাচ্চার সামনে। আদর করে ওটার নাম রেখেছে 'খুদে দানব'। কিছুতেই ভেতরে থাকতে চাইছে না ওটা, শিকের ফাঁক দিয়ে শুঁড় বের করে দিয়ে ওর হাত জড়িয়ে ধরে টানছে, আর হাতির ভাষায় মানব শিশুর মত আবদার করছে বের করে দেয়ার জন্যে।

হেসে তার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল মুসা। বলল, 'রাতে আর কোথায় রাখব তোকে, বল? এখানেই আরাম। আমি তো কাছেই থাকব, তুই ডাকলেই শুনতে পাব। থাক, হ্যাঁ? লক্ষ্মী ছেলে।'

কিন্তু লক্ষ্মী হওয়ার কোন ইচ্ছেই নেই খুদে দানবের। বেরোতে পারলে খুশি।

সারাদিন প্রচুর খাটাখাটনি গেছে। তাই তাঁবুতে ঢুকে শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল মুসা। কিশোরেরও সময় লাগল না ঘুমাতে।

পাঁচ

ভীষণ গোলমালে চমকে ঘুম থেকে জেগে গেল ওরা। প্রচণ্ড হই-হট্টগোল!

অনেক মানুষের কণ্ঠ, মহিলাদের কান্না, বাচ্চাদের তারস্বরে চিৎকার, রেগে যাওয়া পুরুষের ধমক–সব মিলিয়ে এক এলাহি কাণ্ড।

বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে একদৌড়ে তাঁবুর বাইরে চলে এল মুসা। প্রথমেই খেয়াল করল, হাতির বাচ্চাটা নেই।

খাঁচার কাছে দৌড়ে এল সে। পেছনে এল কিশোর।

শূন্য খাঁচা।
সারা গাঁয়ে তুমুল হই-চই। লম্বা, বেঁটে, দুই প্রজাতির মানুষেরাই ভীত-পিঁপড়ের মত আতঙ্কে ইতস্তত ছোটাছুটি করছে।
শূন্য খাঁচাটার কাছে, দুই গোয়েন্দার পাশে এসে দাঁড়াল সর্দার ওগারো।
'হাতিটাকে নিয়ে গেছে,' কিশোর বলল।
কথাটাকে গুরুত্বই দিল না সর্দার। আরও জরুরী দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে সে।
'আমার ছেলেকে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল সে। কান্নার পর্যায়ে চলে গেছে তার কণ্ঠস্বর, 'তাকে খুঁজে পাচ্ছি না! মনে হয় নিয়ে গেছে!'
আরও কয়েকজন গ্রামবাসী দৌড়ে এল দুটো গরু হারানোর খবর নিয়ে। উয়াটুসিদের কাছে মানুষের চেয়ে কম দামী নয় গরু। ভাল হলে তো কথাই নেই। কিন্তু গ্রাম থেকে আসা মহিলা কণ্ঠের বিলাপ আর কান্না গরুর জন্যে নয়। কাঁদছে সর্দারের ছেলে আউরোর জন্যে, তার মা।
গাঁয়ের সর্দার, অবশ্যই সাধারণ লোকেদের মত হবে না। তার ঘরবাড়িও অন্যদের চেয়ে আলাদা। দরজায় তালা লাগানোর ব্যবস্থা আছে তার ঘরে। গাঁয়ের একমাত্র তালা। সেই ঘর থেকে আউরোকে নিয়ে যাওয়া একটা বড় রহস্য।
'দরজায় তালা ছিল না?' জানতে চাইল কিশোর।
'নিশ্চয় ছিল,' সর্দার জানাল।
'তাহলে ঢুকল কি করে লোকটা?'
'তুমি বুঝতে পারছ না, ও মানুষ নয়, দুষ্ট প্রেত, স্বয়ং বজ্রমানব। আর প্রেতের জন্যে তালা কোন ব্যাপার নয়।'
'রাতে তো দু-জনকে পাহারা রেখেছিলাম,' বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল মুসা। 'ওদের তো দেখছি না! কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল নাকি?'
আকামি আর মুংগাকে দেখেছে নাকি কুলিদের জিজ্ঞেস করল কিশোর। না, দেখেনি ওরা।
খাঁচার আশপাশের সমস্ত ঝোপঝাড় খুঁজে দেখা হলো। এক জায়গায় ঝোপের ডাল ভাঙা, দোমড়ানো। ঘাস দলিত মথিত। লড়াই হয়েছে যেন ওখানটাতে।
বনের অনেক ভেতরে ঢুকেও খোঁজা হলো।
ঘাবড়ে গেল কিশোর, দু-জন অভিজ্ঞ লোককে হারাল না তো? আকামি আর মুংগা না থাকলে এই অভিযানই ব্যর্থ হয়ে যাবে।
এই সময় শোনা গেল মুসার চিৎকার, 'এই যে, ওরা এখানে!'
দৌড়ে এল কিশোর। একটা বড় পাথরের ফাটলে পড়ে আছে দু-জন লোক।। হাত-পা বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা। মারধরও করা হয়েছে।
মুখের কাপড় খুলে, বাঁধন কেটে দেয়া হলো ওদের ।
'কি হয়েছিল?' জানতে চাইল কিশোর।
লজ্জায় মাথা তুলতে পারছে না আকামি। 'কি আর বলব! মুংগা ঘুমাচ্ছিল, আমি পাহারা দিচ্ছিলাম। চোখ বন্ধ করিনি, তবে খুব ক্লান্তি লাগছিল। কাউকে আসতে দেখলাম না, শুনলামও না কিছু, হঠাৎ কে যেন মুখ চেপে ধরল। চিৎকার

করার চেষ্টা করলাম। আমার মুখে কাপড় গুঁজে দেয়া হলো। ঘুমের মধ্যেই মুংগার মুখেরও কাপড় গুঁজে বেঁধে ফেলল। আমি অনেক ধস্তাধস্তি করলাম, কিন্তু ছুটতে পারলাম না। আমাকেও বেঁধে ফেলল। তারপর এখানে এনে ফেলে দিয়ে চলে গেল।'

'বেশি লোক?'

'অনেক।'

'কি ধরনের মানুষ ওরা?'

'দেখিনি। তবে ওরা যে কালো মানুষ নয়, এটুকু বুঝেছি। সাদাও নয় ওরা।'

'কি যা-তা বলছ। ওদের দেখইনি, গায়ের রঙ বুঝলে কি করে?'

'গন্ধ থেকে। ওদের গায়ে রোদ আর মাটির গন্ধ নেই কালো মানুষদের মত। সাদা মানুষের মত তামাকের গন্ধও নেই। ওদের গায়ে চা আর পুদিনার গন্ধ। ওরা নাবিক, জাহাজে করে উত্তর থেকে মোমবাসায় এসেছে।'

'আরব!' অনুমান করল কিশোর। 'কিন্তু আরবরা এই পার্বত্য অঞ্চলে কি করতে এসেছে?'

আরবদের সম্পর্কে এ সব কথা বুঝতে পারছে না আউরো।

'ওরা হলো দুষ্ট প্রেত,' বলল সে। 'আর ওদের সর্দার হলো বজ্রমানব। ও এসেছিল?'

'বজ্রমানবের কথা আমি কিছু জানি না,' আকামি বলল।

'তার মাথা থাকে তারার দেশে। কথা বলার সময় গলা দিয়ে বজ্রের গর্জন বেরোয়, চোখের দৃষ্টিতে জ্বলে বিদ্যুতের চমক।'

'বজ্র বা বিদ্যুৎ কোনটাই ছিল না আমাকে যখন ধরল।'

বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল আউরো। 'গলা বন্ধ করে রেখেছিল, চোখ করে ফেলেছিল অন্ধকার, যাতে আওয়াজও না হয়, আলোও দেখা না যায়। হলে যে আমরা জেগে যাব। কিন্তু ষাঁড়ের মত শক্তিশালী আর গাছের সমান লম্বা একজনকে তো নিশ্চয় দেখেছ?'

'অন্ধকারে ওসব কিছুই দেখিনি। তবে গায়ে মোষের জোর আছে এ কথা বলতে পারি। প্রথমে কয়েকজন চেপে ধরল আমাকে। ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিলাম। তারপর দুটো হাত এসে পড়ল আমার গায়ে। পিষে ফেলতে শুরু করল। দুর্বল করতে করতে একেবারে পানি বানিয়ে দিল আমাকে। কারও হাতে এত শক্তি আর দেখিনি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ওগারো। 'ওই তো বজ্রমানব! আমার ছেলেকে নিয়ে গেছে। আর কোনদিন তাকে পাব না। কোন মানুষ লড়াই করে পারে না বজ্রমানবের সঙ্গে।'

'আমরা লড়াই করব তার সঙ্গে,' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল কিশোর, 'এবং আমরা পারবও! আপনার ছেলেকেও ফিরিয়ে আনব, যদি সে বেঁচে থাকে। সর্দার, কিছু মনে করবেন না, আপনার ভূতের গল্প আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। গরু যে চুরি করে, সে আধিভৌতিক কিছু নয়, আমার-আপনার মতই মানুষ। বাজি ধরতে পারেন আমার সঙ্গে।'

মাটি পরীক্ষা করছে মুসা।

'কি ধরতে চাও বলে ফেলো!' হঠাৎ বলে উঠল সে। 'এই পায়ের ছাপগুলো দেখো আগে। তারপর বুঝবে মানুষ কিনা!'

কাদামাটিতে বসে গেছে খালি পায়ের ছাপ, স্বাভাবিক আকারের নয় সেগুলো। আশেপাশে বড় আকারের বুটের ছাপও বসে গেছে গভীর হয়ে।

দেখে মিইয়ে গেল কিশোর। একটু আগে যা বলেছে সেগুলোকে এখন বড় বড় কথা বলে মনে হতে লাগল। মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে যেন টেনে নিয়ে যাওয়া হলো ভয়ের সরু একটা সুতো। আরও নিশ্চিত হয়ে গেছে, কিডন্যাপাররা অবাস্তব কিছু নয়। তবে সাধারণ মানুষও নয়। এতবড় জুতো যে পরে, সেই মানুষটা কত বড়! ওজনও নিশ্চয় অনেক। আর সেই ওজন চর্বির নয়, মাংসপেশীর। ভয়াবহ সেই শক্তির নমুনা কিছুটা পেয়েছে আকামি।

শুধু গায়ের জোরই নয়, আরও নানা রকম ক্ষমতা আছে দৈত্যটার। এতবড় শরীর নিয়ে নিঃশব্দে হাজির হয়ে যেতে পারে, আকামির মত শক্তিশালী মানুষকে সহজে কাবু করে ফেলে, তালা খুলতে পারে, সামান্যতম শব্দ না করে চুরি করতে পারে একটা তেরো বছরের ছেলেকে, গরু চুরি করে; সবচেয়ে বড় কথা, একটা হাতির বাচ্চাকে খেদিয়ে নিয়ে চলে গেল, কেউ টেরও পেল না। অচেনা কেউ ধরতে এলে ভীষণ চেঁচামেচি করে হাতির বাচ্চা। তার মানে এই লোকটা হাতির ব্যাপারে অভিজ্ঞ।

অস্বস্তিটা মুখের ভাবে কিংবা আচরণে প্রকাশ পেতে দিল না কিশোর।

'বড় বড় বুটের ছাপ থাকায় সুবিধেই হয়েছে,' বলল সে। 'অনুসরণ করা যাবে। নাস্তা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব আমরা।'

বিশ মিনিট পর দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কিশোর-মুসা। এগিয়ে চলল বুট ও হাতির পায়ের ছাপ অনুসরণ করে। সঙ্গে কয়েকজন কুলি, আর অবশ্যই আকামি ও মুংগা। কয়েকজন অতি উৎসাহী গ্রামবাসীও আসতে চেয়েছিল। বাধা দিয়েছে সর্দার ওগারো।

'মরতে চাও?' হুঁশিয়ার করেছে সে। 'বজ্রমানবকে রাগিয়ে দিয়ে আমাদের সবাইকে মারতে চাও? এক হাতে টিপে এই গ্রামটা ভর্তা করে দিতে পারে সে। আউরো তো আমারই ছেলে, আমারও যেতে ইচ্ছে করছে; কিন্তু আমি শুধু বাবাই নই, আমি এ গাঁয়ের সর্দারও, সবার ভালমন্দ দেখার ভার আমার ওপর।'

শুরুতে অনুসরণ বেশ সহজ হলো। মানুষের ছাপ যেখানে চোখে পড়ল না সেখানেও হাতির পায়ের বড় গোল গোল গভীর ছাপ পরিষ্কার দেখা গেল। দুনিয়ার আর কোন জানোয়ারই এত স্পষ্ট পায়ের ছাপ রেখে যায় না।

'একেবারেই তো সহজ,' হেসে উঠল মুসা। 'এই আরবগুলো ততটা চালাক নয়। শীঘ্রি দেখা পেয়ে যাব। তারপর বোঝাব মজা।'

কিশোর কিছু বলল না। গভীর ভাবে পরীক্ষা করছে মানুষের পায়ের ছাপগুলো। আকামিকে জিজ্ঞেস করল, 'কয়জন মানুষ মনে হয় তোমার?'

'বারো…বড়জোর পনেরো।'

'আর আমাদের তিরিশ,' সন্তুষ্ট হয়ে বলল মুসা। 'ব্যাটাদের খতম করে দেয়া

কোন ব্যাপারই না।'

'কিন্তু ক্যাম্পে আরও লোক থাকতে পারে,' কিশোর বলল। 'কথা হলো, এত স্পষ্ট ছাপ রেখে যাচ্ছে, এটা কি জানে না ওরা?' নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিল, 'নিশ্চয় জানে। বেশিক্ষণ আর অতটা সহজ থাকবে না। কোথাও না কোথাও কোন চালাকি খাটাবে। তোমরা সব সাবধানে থাকো, চোখকান খোলা রাখো।'

সামনে বুনো ফুলের একটা বন, গাছগুলো ওদের মাথার চেয়ে উঁচু। ডালগুলো এত মোটা, ফুলগাছের বলে মনে হয় না। বিশাল মোমবাতির মত লাগছে খাড়া হয়ে থাকা বিশ ফুট উঁচু লবেলিয়াকে। চূড়ার কাছে ছড়িয়ে থাকা কুঁড়ির দিকে তাকালে মনে হয় আগুন লেগেছে ওখানে।

ফুলবন পেরোতেই বদলে গেল বনের চেহারা, শুরু হলো বাঁশঝাড়। অনেক উঁচুতে চোখা চোখা বাঁশপাতায় তৈরি চাঁদোয়াকে নীল আকাশের পটভূমিতে অনেক বেশি সবুজ লাগছে। কুয়াশার কারণে সব সময় ভিজে থাকে পাতা, ভেজা মাটিতে ঝরে পড়ে মুক্তোর মত পানির ফোঁটা টুপটাপ, টুপটাপ। বাঁশগুলোও স্বাভাবিকের চেয়ে মোটা, থামের মত।

'এতটা বড় হতে নিশ্চয় অনেক সময় লাগে,' মুসা বলল।

'মোটেও না,' মাথা নেড়ে বলল কিশোর, 'বাড়া দেখলে অবাক হবে। এক মিনিটের জন্যে এখানে মাটি শুকাতে পারে না। ফলে খেয়ে না খেয়ে বাড়তে থাকে বাঁশ। দুই মাসেই একশো ফুট লম্বা হয়ে যায়। আমি বানিয়ে বলছি না।'

মুসার চোখে অবিশ্বাস দেখে হাসল সে। 'অন্য গাছ বড় হতে যত সময় লাগে, তারচেয়ে অনেক কম সময় লাগে বাঁশ বড় হতে, খুব দ্রুত বাড়ে। কিন্তু এখানে যে হারে বাড়ে, তাকে বলতে হয় তীব্র গতি, কিংবা ঝড়ের গতি।'

'এত লম্বা বাঁশের বয়েস মাত্র দুই মাস! আমি বিশ্বাস করি না।'

'না করলেও ব্যাপারটা সত্যি।'

'আর বড় হবে?'

'না, একশো ফুটই শেষ।'

'এরপর কি ঘটবে?'

'ফুল ফুটবে। মাত্র একবার। তারপর মারা যাবে। ফুল থেকে যে বীজ ঝরবে সেগুলো থেকে নতুন চারা গজাবে। ওই যে দেখো একটা নতুন চারা, সবে গজানো শুরু হয়েছে।'

মানুষের ঊরুর সমান মোটা ফুটখানেক উঁচু একটা বাঁশের চারার দিকে তাকাল মুসা।

'কাল দিনের বেলায়ও এটা ছিল না এখানে,' কিশোর বলল। 'রাতারাতি গজিয়ে গেছে।'

'কি করে জানলে?'

'পত্রিকা আর বই পড়ে। বৈজ্ঞানিক অভিযান চালানো হয়েছে এদিকটায়। অনেক মাপামাপি করেছেন বিজ্ঞানীরা। প্রথম কয়েক সপ্তাহ বাঁশের চারা চব্বিশ ঘণ্টায় দুই ফুট করে বাড়ে। আস্তে আস্তে কমে আসে বাড়ার এই হার। তবে অনেক চারাই কমার সুযোগ পায় না।'

'কেন?'

'জন্তু-জানোয়ারে খেয়ে ফেলে। খেতে খুব ভাল, নরম, রসাল।'

'আমি তো জানতাম বাঁশ শুধু মানুষে খায়। চাইনিজ রেস্টুরেন্টগুলোতে পাওয়া যায় বাঁশের তরকারি।'

'উয়াটুসি আর পিগমিরাও পছন্দ করে। গরিলার তো খুব প্রিয় খাবার। দেখো, গরিলারা ঘুরে গেছে এখান থেকে।'

ভেজা নরম মাটিতে স্পষ্ট দেখা গেল গরিলার পায়ের ছাপ। মানুষের খালি পায়ের ছাপের মতই দেখতে। তবে আকারে অনেক বড়, এর পাশে পূর্ণবয়স্ক মানুষের পায়ের ছাপকে মনে হবে শিশুর পায়ের মত।

'এত গভীর কেন?' জানতে চাইল মুসা।

'হবে না, যা ভারির ভারি। একটা পূর্ণবয়স্ক পুরুষ গরিলার ওজন হয় সাতশো পাউন্ড, বড় একজন মানুষের চারগুণ।'

'গেল তো এখান দিয়েই, বাঁশের এই চারাটাকে খেলো না কেন?'

'এটা গজানোর আগেই হয়তো গেছে। যত দূরে চলে যায় ততই ভাল। রোমশ ওই ভদ্রলোকদের সঙ্গে মোলাকাত করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার।'

'কেন, ভয় পাচ্ছ?'

'না পাওয়ার কোন কারণ আছে? আদর করে যদি তোমার গায়ে হাত ছোঁয়ায় তাহলেই চিত হয়ে যাবে।' চারপাশে তাকাল কিশোর। 'আল্লাই জানে, কাছাকাছি আছে কিনা! দেখছে কিনা এখন আমাদের!'

'অত ভয় পাচ্ছ কেন? হামলা চালাবে নাকি?'

'গরিলার মেজাজ-মর্জির কোন ঠিক ঠিকানা নেই। চালাতেও পারে।'

'বিরক্ত না করলেও মারতে আসবে? কোন জানোয়ারই নাকি বিরক্ত না হলে মানুষকে আক্রমণ করে না?'

'তা করে না। কিন্তু কিসে যে গরিলাকে বিরক্ত করবে, সেটা বলাই মুশকিল।'

এগিয়ে গেছে আকামি আর মুংগা। বাঁশের আড়ালে হারিয়ে গেছে। ওদেরকে ধরার জন্যে তাড়াতাড়ি এগোল দু-জনে।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আকাশে কালো মেঘ। অন্ধকার কেমন নিঃসঙ্গ আর বিষণ্ন করে তুলেছে বনতল। ভারি, এক ধরনের চাপা ঘড়ঘড় শব্দ ভেসে এল হঠাৎ। ঝট করে শব্দের দিকে ফিরে তাকাল দু-জনে।

'গরিলার বাসা আছে এখানে!' নিচু স্বরে বলল কিশোর।

কিন্তু বাসাটা পাওয়া গেলেও তার মধ্যে গরিলা দেখা গেল না। দুই ফুট উঁচু করে গাছের ডালপাতা আর ঘাস বিছিয়ে একটা গদিমত তৈরি করা হয়েছে। গরিলার বিছানা।

'আমি তো জানতাম গাছে থাকে ওরা,' মুসা বলল।

'গাছে চড়তে পারে, তবে রাতে ডালে থাকতে চায় না। এত ভারি শরীরের ভারে ডাল ভেঙে পড়ার ভয়ে বেশি ওপরেও উঠতে চায় না। বড়গুলো তো মাটি ছেড়ে নড়েই না।'

বিড়বিড়, ফিসফাস, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে কথা বলছে যেন অনেক মানুষ। এগিয়ে

আসছে ক্রমে। কিসের শব্দ, আন্দাজ করতে পারছে না মুসা। তবে শব্দ নিয়ে মাথা ঘামানোর আগে পেট নিয়ে ঘামানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল সে। সামনে আবছা অন্ধকারে একটা বাঁশের কোঁড় গজিয়ে থাকতে দেখল। হাতের কাছে আর কোন খাবার নেই দেখে ছুরি বের করে নিয়ে এগোল কেটে নেয়ার জন্যে। ভাবল, গরিলারা যদি খেতে পারে, সে পারবে না কেন?

ছয়

বিষণ্ন অন্ধকারকে যেন খানখান করে দিল তীব্র, তীক্ষ্ণ চিৎকার। শিরশির করে উঠল মুসার পিঠের কাছটায়। পাঁচ ফুট দূরের যে কালো ছায়াটাকে বনের ছায়া মনে করেছিল সে, আসলে ওটা একটা গরিলা। একজন উয়াটুসি পুরুষের সমান লম্বা, কিন্তু তিন-চারগুণ চওড়া। কুচকুচে কালো শরীর, তার মধ্যে সাদা বলতে কেবল বিকট হাঁ থেকে বেরিয়ে থাকা ভয়ঙ্কর দাঁতগুলো। গভীর কোটরে বসা চোখের রঙও কালো। কালো নাকটাকে মনে হচ্ছে শক্ত রবারে তৈরি, আর দাড়িকে লাগছে রঙ করার ব্রাশের মত।

লম্বা একটা কালো হাত বাড়িয়ে মুসার হাত থেকে বাঁশের কোঁড়টা কেড়ে নিল গরিলা। ছুঁড়ে দিল ঝোপের ভেতর। কিঁচমিচ করে উঠল কয়েকটা কণ্ঠ। তারমানে ওখানে রয়েছে তার বাচ্চাগুলো। দুই হাতে নিজের বুকে দমাদ্দম কিল মেরে যেন ঢাক বাজাতে শুরু করল গরিলাটা। এতেও সন্তুষ্ট হতে না পেরে ঢাকের সঙ্গে সঙ্গত করার জন্যে গলা ছেড়ে চিৎকার করতে লাগল।

এই শিক্ষা জীবনে ভুলবে না মুসা। কোন বড় জানোয়ারকে বিরক্ত করার পর যে অভিজ্ঞতা হয় সেটা বলার জন্যে বেঁচে থাকে না বেশির ভাগ মানুষই। কেন যে কি কারণে বিরক্ত হবে জানোয়ারেরা, সেটাও ঠিক করে বলার উপায় নেই। এই যেমন, এই গরিলাটা হয়েছে মুসা একটা বাঁশের কোঁড় তুলেছে বলে।

দুপদাপ করে হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে ওর। পিছাতে শুরু করল মুসা। অতবড় এক গরিলার সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইয়ে যাওয়ার মত বোকামি আর হয় না। সঙ্গে বন্দুক নেই। আছে শুধু দু-জনের কাছে দুটো ছুরি। এই দানবের বিরুদ্ধে সেগুলো দুটো সাধারণ শলাকা মাত্র।

পিছাতে পিছাতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কিশোরের গায়ের ওপর এসে পড়ল মুসা।

'দাঁড়িয়ে থাকো,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'একচুল নড়বে না। যেই বুঝবে তুমি ভয় পেয়েছ, মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলবে মুণ্ডটা।'

পাশাপাশি দাঁড়াল দু-জনে।

সমানে ঢাক বাজিয়ে চলেছে গরিলাটা। চিৎকারও বন্ধ করছে না। আট ইঞ্চি লম্বা হাতের রোম। থাবাটা যেন একটা ভাত খাওয়ার বাসন।

'ওর ভাষাতেই ওকে শাসানো দরকার,' কিশোর বলল।

নিজের বুকে চাপড় মারতে শুরু করল সে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে এমন ভঙ্গি করে ফেলল, কুৎসিত ভঙ্গি, যেন সে-ও একটা গরিলা। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল।

দেখাদেখি মুসাও তা-ই করল।

দু-জন মানুষ আর একটা গরিলার মিলিত বিচিত্র চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল বাঁশবনে। চতুর্দিকে এখানে ওখানে শুরু হয়ে গেল আরও গরিলার ঢাক বাজানো আর চিৎকার। কলরব শুরু করল পাখি আর বানরের দল।

কি হয়েছে দেখার জন্যে দৌড়ে এল আকামি আর মুংগা। সঙ্গে কুলিরা। কাণ্ড দেখে তো হতবাক। একটা গরিলা চাইছে দুটো ছেলেকে ভয় দেখাতে, আর ছেলেরা চাইছে গরিলাটাকে ভয় দেখাতে।

কি করবে বুঝতে পারছে না আকামি আর মুংগা।

তবে খানিক পরে বোঝা গেল গরিলাটাই পরাজিত হতে চলেছে। কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে গেল ওটা। সঙ্গে সঙ্গে এক পা এগিয়ে গেল ছেলেরা। হাত নেড়ে এমন ভঙ্গি করছে যেন ধরতে পারলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে গরিলাকে।

চিৎকার থামিয়ে দিল গরিলাটা। মুখের ভাব বদলে গেল। চোখে ভয় ফুটছে।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে, লম্বা দুই হাত মাটিতে নামিয়ে দিয়ে, কব্জিতে ভর রেখে, চার হাত-পায়ে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের ভেতর।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। ভয়টা প্রকাশ করল এতক্ষণে। বলল, 'আমার পা জমে গেছে।'

হাসল কিশোর। 'তোমার কিছু খাবার দরকার। বাঁশের কোঁড় খেয়ে দেখতে পারো।'

'আরও!' ভয়ে ভয়ে গাছের নিচে ছায়ার দিকে তাকাতে লাগল মুসা, এখন তার মনে হচ্ছে প্রতিটি ছায়াই একটা করে গরিলা। 'না খেয়ে মরে যাব, তবু বাঁশের কোঁড়ের লোভ আর করছি না!'

আবার চলতে শুরু করল ওরা। বাঁশবন থেকে বেরিয়ে এল খোলা তৃণভূমিতে।

তারপরে একটা হ্রদ। বৃষ্টির মধ্যেও খুব সুন্দর লাগছে দেখতে।

বৃষ্টি-ভেজা আজব এই পার্বত্য অঞ্চলের এটা আরেক অদ্ভুত ব্যাপার। ঢালটা যেন বিচিত্র এক ব্যালকনি, আর প্রতিটি ব্যালকনিতে রয়েছে একটা করে হ্রদ। অভিযাত্রীরা চমৎকার সব নাম দিয়েছে এগুলোর–গ্রীন লেক, ব্ল্যাক লেক, হোয়াইট লেক, গ্রে লেক। ওপর থেকে নেমে আসা বরফগলা পানি আর ক্রমাগত বৃষ্টির পানিতে সব সময় টইটম্বুর থাকে হ্রদগুলো। প্রতিটি ব্যালকনি থেকে জলপ্রপাতের মত পানি ঝরে পড়ছে তার নিচের হ্রদটায়।

উদ্বিগ্ন হয়ে আকামি বলল, 'ওই পানিতে পায়ের ছাপ মুছে যাবে। এগোব কি করে?'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল সে। বিশাল একটা ফুলের ওপর বসে রয়েছে চন্দ্রপাহাড়ের এক ভয়াল চেহারার প্রাণী। একটা ক্যামেলিয়ন। বড় বড় চোখ, মাথা থেকে বেরিয়েছে তিনটে শিং, যেন প্রাগৈতিহাসিক দানবের খুদে সংস্করণ।

'খুব খারাপ লক্ষণ,' আকামি বলল। 'কোনখানে যাওয়ার সময় এই প্রাণী সামনে পড়লে আর এগোনো উচিত না। এগোলেই বিপদ।'

এ সব কুসংস্কার বিশ্বাস করে না কিশোর, অধৈর্য হয়ে বলল, 'হলে হবে। এগোও।'

সঙ্গে আসা কুলিরাও দাঁড়িয়ে গেছে। কেউ এগোতে রাজি নয়। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে ছোট্ট গিরগিটিটার দিকে। আকামির সঙ্গে ওরাও একমত–ক্যাম্পে ফিরে যাওয়া উচিত।

'দেখো,' বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর, 'তোমরা সবাই সাহসী মানুষ। ভয়ানক বাঘ-সিংহের মুখোমুখি হতে পরোয়া কোরো না। হাতি-গণ্ডারের সঙ্গে লাগতে ভয় পাও না। দাঁত নেই, বিষ নেই এমন একটা খুদে প্রাণীকে ভয় পাচ্ছ তোমাদের মত মানুষ, এ কথা বিশ্বাস করতে বলো আমাকে?'

প্রাণীটার মুখের কাছে আঙুল নিয়ে গেল কিশোর।

আতঙ্কিত চোখে নীরবে তাকিয়ে রয়েছে লোকগুলো।

নড়ল না ক্যামেলিয়নটা। কোথা থেকে উড়ে এসে একটা মাছি বসল কিশোরের আঙুলে। ক্যামেলিয়নের মুখ থেকে বিদ্যুতের মত ছিটকে বেরিয়ে এল লিকলিকে জিভ, মাছিটাকে আটকে ধরে নিয়ে চলে গেল আবার মুখের ভেতর।

'অনেকটা পিঁপড়েখেকোর মত কাজ করে এর জিভ,' মুসাকে বলল কিশোর। 'কেমন লম্বা দেখলেই তো। চটচটে আঠা, লাগলে আর ছুটতে পারে না।'

মাছিটাকে খেয়ে আরেকটা ফুলের ওপর সরে গেল ক্যামেলিয়নটা। এতক্ষণ ছিল নীল ফুলের ওপর, তার শরীরের রঙও ছিল নীল; যেই কমলা রঙের অন্য ফুলটাতে গেল, শরীরটা হয়ে গেল কমলা। মুহূর্তে গায়ের রঙ বদলে ফেলেছে।

'দেখলেন!' কাঁপা গলায় বলল আকামি, 'জাদু জানে!'

'জাদু না ছাই!' রেগে গেল কিশোর। 'নিজেকে বাঁচানোর আর কোন উপায় নেই এটার, তাই এই ব্যবস্থা করে দিয়েছে প্রকৃতি। ভয়ঙ্কর চেহারা বানিয়েছে, যাতে অন্যেরা খেতে না আসে একে, ভয় পেয়ে সরে যায়। নিজের রঙ বদলাতে পারে, যাতে যে ফুলের ওপর বসবে তার সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। দুটো কাজ হয় এতে–শত্রুর চোখ এড়িয়ে থাকতে পারে, শিকারও তাকে দেখতে পায় না বলে জিভের নাগালে চলে আসে।'

কিন্তু কোনভাবেই বোঝানো গেল না কুসংস্কারাচ্ছন্ন কুলিদের।

রেগেমেগে শেষে কিশোর বলল, 'বেশ, তোমরা না আসতে চাইলে চলে যাও। আমি আর মুসা একাই যেতে পারব।'

ক্যামেলিয়নটার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সে। পেছনে চলল মুসা।

আধ মাইলও গিয়ে সারেনি, ছুটতে ছুটতে এল আকামি। জিজ্ঞেস করল, 'সত্যিই তাহলে ফিরে যাবেন না?'

'না,' কিশোর বলল। 'তোমার আসার দরকার নেই।'

'আমি যাব আপনাদের সঙ্গে।'

'কিন্তু অশুভ লক্ষণ যে দেখলে?'

'বিপদে পড়লে একসঙ্গেই পড়ব। আপনাদের ফেলে আমি যাব না।'

লোকটার বিশ্বস্ততায় গলে গেল কিশোর। কতটা দুঃসাহস দেখাচ্ছে আন্দাজ করতে পারল। রক্তে মিশে যাওয়া শত বছরের কুসংস্কার ভাঙতে চলেছে সে, সোজা কথা নয়।

কিন্তু আকামি একাই নয়, কয়েক মিনিট পর হাঁপাতে হাঁপাতে মুংগাও এসে হাজির।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল কিশোর।

হাতের রাইফেলটা দেখিয়ে কৈফিয়তের সুরে মুংগা বলল, 'ভাবলাম, এটা ফেলে যাচ্ছেন, বিপদে পড়তে পারেন। তাই নিয়ে এলাম।'

নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল কিশোর।

সরে গেল মুংগা। 'না না, আপনার বয়ে নেয়া লাগবে না। আমিই নিতে পারব।'

খানিক পর এক এক করে ফিরে এল সব ক'জন। একজন লোকও ক্যাম্পে ফিরে যায়নি। ক্যামেলিয়নের ভয় কাউকে ঠেকাতে পারল না শেষ পর্যন্ত।

সাত

বৃষ্টির বেগ বেড়েছে। অঝোরে ঝরছে এখন বড় বড় ফোঁটায়। মাথার ওপর অনেক নেমে এসেছে কালো মেঘ। হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যায়। অন্ধকারও বেড়েছে। দশ ফুট দূরের জিনিসও আর চোখে পড়ে না ঠিকমত।

কিন্তু দমল না ওরা। হাতির পায়ের ছাপ অনুসরণ করে ঠিকই এগিয়ে চলল।

খুদে দানবের ছাপের পাশে মাঝেসাঝে খালি পায়ের ছোট ছাপ চোখে পড়ছে, বোধহয় সর্দারের ছেলে আউরোরই হবে।

'বেচারা আউরো!' আনমনে বলল কিশোর, 'যা শুনলাম, সুন্দর চেহারার ছেলেমেয়েগুলোকেই কেবল নিয়ে যায়। কেন নেয়?'

'আন্দাজ করতে পারি,' আকামি বলল।

'কেন?'

'কিডন্যাপাররা স্ল্যাভার, মানুষের ব্যবসা করে। গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। সুন্দর চেহারাগুলো নেয় বেশি দাম পাবে বলে।'

কান খাড়া করে ফেলেছে মুসা। 'কিন্তু দাস ব্যবসা তো বহু আগেই বন্ধ হয়ে গেছে বলে শুনেছি? এর বিরুদ্ধে এখন কড়া আইন করা হয়েছে।'

'কই আর হলো?' আকামির হয়ে জবাব দিল কিশোর। 'আগের মত খোলাখুলি বাজারে বিক্রি হয় না, এই যা। গোপনে গোপনে এখনও হরদম চলছে এই ব্যবসা। শুধু আফ্রিকাই নয়, ভারত, বাংলাদেশ আর ওরকম দরিদ্র আরও অনেক দেশ থেকে মানুষ পাচার করে দেয়া হয় ধনী দেশগুলোতে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে। নারী আর শিশুরাই প্রধানত এসবের শিকার।'

'নিশ্চয় জাহাজে করে সাগর পার করে নিয়ে যায়। সেজন্যেই জাহাজীদের গায়ের গন্ধ পেয়েছে আকামি।'

মাথা ঝাঁকাল আকামি।

'সামনে পেলে গন্ধ শুঁকে চিনতে পারবে লোকটাকে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'নিশ্চয় পারব। আরবদের ওই ডাউ জাহাজগুলোর গন্ধ বড় বদ। একবার নাকে ঢুকলে জীবনে আর ভোলার উপায় নেই।'

হ্রদের পাড়ে এসে দাঁড়াল ওরা। সব চিহ্ন আচমকা শেষ হয়ে গেছে এখান থেকে। আকামির মত ওস্তাদ ট্র্যাকারও আর কোন চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছে না।

'ব্যাটারা ভীষণ চালাক,' বলল সে। 'এখান থেকে কোথায় গেছে বলার উপায় নেই। পানিতে নেমেছে এটুকু বুঝতে পারছি। কিন্তু তারপর? যে কোনও দিক দিয়ে নেমে অল্প পানিতে হেঁটে গিয়ে আবার পাড়ে উঠতে পারে। সাঁতরে লেক পার হয়েও ওপাড়ে চলে যেতে পারে। কোনটা করেছে?'

'হাতি কি সাঁতরাতে পারে নাকি?' জানতে চাইল মুসা।

'খুব ভাল পারে,' জবাব দিল তার বন্ধু। 'তবে পানি বেশি গভীর না হলে সাঁতরানোর চেয়ে তলা দিয়ে হেঁটে চলে যেতেই বেশি পছন্দ করে ওরা।'

'তাজ্জব ব্যাপার! শ্বাস নেয় কি করে?'

'শুঁড়টা উঁচু করে রাখে, নাকের ফুটো বের করে রাখে পানির ওপর।'

'তাহলে তো পানির নিচে কাদায় পায়ের ছাপ থাকার কথা।'

হ্রদটা বেশি গভীর না। টলটলে পরিষ্কার পানিতে চোখ ডুবিয়ে নিচের কাদা দেখতে লাগল আকামি। কিছুই দেখতে পেল না। একটা পরীক্ষা করল তখন। নেমে গেল পানিতে। পা দেবে গেল কাদায়। নাড়া লেগে ঘোলা হয়ে গেল পানি। ওপরে উঠে এল সে। আবার পানিতে চোখ ডুবিয়ে দেখল। আস্তে আস্তে থিতিয়ে গেল কাদা, আবার পরিষ্কার হলো পানি। তার পায়ের ছাপ নেই।

তারমানে হাতি এদিক দিয়ে গেলেও বোঝার উপায় নেই, চারপাশ থেকে গলিত কাদা সরে এসে নিমেষে ঢেকে দিয়েছে তার পায়ের ছাপ।

'কোনওখান দিয়ে তো নিশ্চয় উঠেছে পানি থেকে,' মুসা বলল। 'পাড়ে নিশ্চয় ছাপ পড়েছে। সেটা খুঁজে বের করলেই তো পারি?'

কিন্তু বিশেষ আশাবাদী হতে পারল না আকামি। কারণ অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। পায়ের ছাপ পড়লে সেটা মুছে দেবে এই বৃষ্টি। তবু কিশোরের কথার প্রতিবাদ না করে হ্রদের পাড়ে খুঁজতে শুরু করল সে।

সাংঘাতিক বিরক্তিকর এই শীতল বৃষ্টি। বেশিক্ষণ এর মধ্যে থাকলে একধরনের অস্থিরতায় পেয়ে বসে মানুষকে। কুলিদের মধ্যে সেই লক্ষণ দেখা যেতে শুরু করল।

হ্রদের পশ্চিম পাড়ে এসে আরেক বিপদ, চলাই মুশকিল হয়ে উঠল। থিকথিকে কালো কাদা, পা পড়লে ডেবে যায়–কোথাও কোথাও হাঁটু পর্যন্ত দাবে। কি মনে হতে ম্যাপ বের করল কিশোর। দেখল, এখানেই আছে সেই কুখ্যাত বিগো বগ, এর ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রচুর লেখালেখি করেছে অভিযাত্রীরা। পানি আর কাদার আঠাল সূপ তৈরি হয়ে থাকে যেন এখানে। মানুষের পা আঁকড়ে ধরে

রাখে। এর মধ্যে হাঁটতে গেলে সাংঘাতিক পরিশ্রম।

শরীর ডেবে গেলেও এটাকে চোরাকাদা বলা যাবে না। কারণ চোরাকাদাকে যেমন 'অতল' বলা হয়, এটা ঠিক সেরকম নয়। তবে চোরাকাদার চেয়ে কম বিপজ্জনকও নয়। যেখানে বেশি গভীর, সেখানে পড়লে অন্যের সাহায্য ছাড়া উঠে আসা কঠিন।

কাদার মধ্যে নেমে এগোনোর চেষ্টা করতে হঠাৎ কোমর পর্যন্ত ডেবে গেল আকামির। সবাই মিলে টেনেটুনে তাকে তুলে আনল বগ থেকে।

হেঁটে যেতে পারবে না বুঝে সাঁতরে যাওয়ার চেষ্টা করল মুসা। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত করে পড়ল তরল কাদার ওপর। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল তার শরীর।

তাড়াতাড়ি কাদার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তার বাহু ধরে টেনে তুলে আনল কিশোর আর আকামি।

সারা গায়ে কাদা মেখে ভূত সেজে গেছে মুসা। হাত দিয়ে মুছতে মুছতে বলল, 'বাপরে বাপ, কি জঘন্য! পানি আর কাদা যে এক জিনিস নয় এতদিনে বুঝলাম! সাঁতার কাটা অসম্ভব!'

এই সময় একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল ওদের। দুটো হাতি। একটা বড় মাদী, আরেকটা ছোট মদ্দা–বয়েস খুব অল্প, সবে কৈশোর পেরিয়েছে। কিন্তু বাচ্চা হলেও হাতির বাচ্চা, গায়ে-গতরে অনেক বেড়ে গেছে। বড়টা সম্ভবত ছোটটার মা।

কাদায় পড়েছে বড়টা। পাড়ে দাঁড়িয়ে শুঁড়ে শুঁড় লাগিয়ে তাকে টেনে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে বাচ্চাটা।

অনেক চেষ্টা করেও মাকে তুলতে পারল না সে। মায়ের তুলনায় অনেক ছোট, গায়ে শক্তিও কম, অতবড় ভারি একটা শরীরকে কি আর তুলে আনতে পারে? আর্তচিৎকার করতে করতে কাদায় পুরোপুরি ডুবে গেল মা। বিলাপ করে কাঁদতে শুরু করল বাচ্চাটা, কাদার পাড়ে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। অনেকটা মা-হারা মানবশিশুর মতই।

বড় মায়া লাগল মুসার। কিন্তু কি করবে? বিশাল একটা হাতিকে কাদা থেকে তুলে আনার সাধ্য তাদের নেই।

এই করুণ দৃশ্য মন খারাপ করে দিল অভিযাত্রীদের। কাদার ভয়াবহতাও বুঝতে পারল। এই কাদা মাড়িয়ে আর এগোনোর সাহস করল না।

তা ছাড়া পায়ের ছাপ নেই, কোন চিহ্ন নেই, কোন দিকে এগোবে? অহেতুক আর হাঁটাহাঁটি না করে নিরাশ হয়ে গাঁয়ে ফিরে চলল দলটা।

অদ্ভুত একটা কাণ্ড করল এই সময় হাতির বাচ্চাটা। একাকী এই ভয়ঙ্কর জায়গায় থাকতে যেন সাহস হলো না তার, মানুষের পিছে পিছে চলল।

হাতির বাচ্চারা এ রকম করে, জানা আছে মুসার। নিরালা জায়গায় একলা থাকতে ভয় পায়। কি মনে হতে হাত বাড়িয়ে ডাকল ওটাকে সে। কুকুরের বাচ্চার মতই সাড়া দিল হাতির বাচ্চা। এগিয়ে এসে তার হাতে শুঁড় ঘষতে লাগল।

আদর করে তার শুঁড়ে হাত ঘষে দিল মুসা। সহজেই জন্তু-জানোয়ার নেওটা

হয়ে যায় তার। এই বাচ্চাটারও হতে দেরি লাগল না। নামও একটা দিয়ে দেয়া হলো। মায়ের কাদায় ডুবে মরার ঘটনাটা স্মরণীয় করে রাখার জন্যে বাচ্চার নামকরণ হলো 'কাদার খোকা'।

আট

অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল সর্দার ওগারো, ওদের দেখেই দৌড়ে এল। ভেজা চুপচুপে, কাদামাখা বিধ্বস্ত মানুষগুলোকে দেখেই অনুমান করে নিল কি ঘটেছে। তবু জিজ্ঞেস করল, 'আমার ছেলেকে পেয়েছ?'

নীরবে মাথা নাড়ল কিশোর।

বিষণ্ণ চোখ তুলে পর্বতের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল সর্দার, 'হে বজ্রমানব, তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে মানুষের কিছু করার নেই! বুঝলাম, আর কোনদিন ছেলেকে দেখতে পাব না আমি!'

'দেখুন, এত সহজে হাল ছাড়বেন না,' বোঝাতে চাইল কিশোর, 'আমরা এখনও চেষ্টা ছাড়িনি। খবরটা পুলিশকে জানিয়েছেন?'

'লোক পাঠিয়েছি। কিন্তু জানি, লাভ হবে না। এমনিতেই অনেক কাজ পুলিশের, গোলমাল লেগেই আছে দেশে, ছেলে হারানোর মত একটা ছোট্ট ঘটনাকে পাত্তাই দেবে না ওরা। আসবে না।'

বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে কুঁড়েতে ফিরে গেল সর্দার।

শরীর থেকে আঠাল কাদা ধুয়ে ফেলার জন্যে হ্রদে নামল কিশোর-মুসা আর তাদের সঙ্গীরা।

প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। ক্যাম্পে যারা ছিল, তারা রান্না করেই রেখেছে। তাঁবুতে ঢুকেই খেতে বসে গেল কিশোররা। গপগপ করে গিলতে লাগল সবাই। কাদার খোকারও খাবারের ব্যবস্থা করল কুলিরা।

পেট শান্ত হয়ে এলে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'আজ রাতে কি করব? পাহারা লাগবে? হাতির এই বাচ্চাটাকেও যদি চুরি করতে আসে?'

'খাঁচায় তালা দিয়ে রাখব,' জবাব দিল কিশোর।

খাঁচায় ঢুকতে চাইল না হাতির বাচ্চা। শেষে মুসাকে আগে ঢুকে গিয়ে ডেকে ডেকে তাকে ঢোকাতে হলো। তারপর এক ফাঁকে পিছলে বেরিয়ে চলে এল সে। চট করে তখন দরজা লাগিয়ে তালা আটকে দেয়া হলো। শিকের ফাঁক দিয়ে শুঁড় বের করে হাতির ভাষায় প্রতিবাদ জানাতে লাগল কাদার খোকা। আদর করে তার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল মুসা, 'থাক, কোন ভয় নেই। এখানে তুই বেশি নিরাপদ।'

বলল বটে, কেন যেন কথাটা নিজেই বিশ্বাস করতে পারল না। আগের রাতে খুদে দানবকেও এ রকম অভয় দিয়েছিল। কিন্তু রক্ষা করতে পারল কই?

তবে এদিন আর ভুল করল না। এক তালার ওপর ভারি আরেকটা তালা

লাগাল সে। 'দেখি, এবার কি করে খোলে ব্যাটারা?'

ঝুঁকি নিতে চাইল না কিশোর, পাহারার ব্যবস্থা করল। হাতির বাচ্চাটা ছাড়াও আরও অনেক দামী দামী জানোয়ার আছে। নিলে ভাল দামে বেচতে পারবে ডাকাতরা।

আকামি আর মুংগা বেজায় ক্লান্ত। কুলিদের কারও ওপর পাহারার ভার দিতে ভরসা পেল না কিশোর। সর্দার ওগারোর সঙ্গে পরামর্শ করল।

গ্রাম থেকে লোক দিল সর্দার।

হাতে বল্লম নিয়ে খাঁচার সামনে পাহারায় বসল দু'জন শক্তিশালী উয়াটুসি যোদ্ধা।

আহত হাতির চিৎকারের মত অদ্ভুত শব্দ পৃথিবীতে আর আছে বলে জানা নেই মুসার। চমকে জেগে গেল সে। মেরুদণ্ডে বয়ে গেল শীতল শিহরণ, শিরশির করে উঠল চামড়া, খাড়া হয়ে গেল রোম। মনে হলো বিদ্যুতের তার ছুঁয়ে ফেলেছে।

একটা মুহূর্ত যেন পাথর হয়ে পড়ে রইল সে। তারপর বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড় দিল তাঁবুর বাইরে, কি হয়েছে দেখার জন্যে।

খাঁচার কাছে এসে হোঁচট খেল। কিসে লাগল দেখার জন্যে তাকাল নিচে। অন্ধকার এখনও কাটেনি। আবছা ভাবে দেখল ওগারোর একজন প্রহরী পড়ে আছে। নিথর। তাড়াতাড়ি বসে তার নাড়ি দেখল। মারা গেছে লোকটা।

হাতড়ে হাতড়ে দ্বিতীয় লোকটাকেও বের করল সে। সে-ও মৃত।

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কিশোর। তাঁবু থেকে বেরোতে শুরু করেছে কুলিরা। গাঁ থেকে আসছে গ্রামবাসীরা। খাঁচার মধ্যে এখনও চিৎকার করে চলেছে হাতির বাচ্চাটা।

'কি হয়েছে ওর?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর।

'মনে হয় ডাকাতেরা ভয় দেখিয়েছে।'

তালায় হাত দিয়ে দেখল মুসা। একটা খোলা। আরেকটা লাগানো রয়েছে।

দৌড়ে তাঁবুতে গিয়ে চাবি নিয়ে এল সে। তালা খুলল।

'কি করবে?'

'ভেতরে গিয়ে ওকে শান্ত করব।'

'যেয়ো না! এখন ওর হুঁশ নেই, খুন করে ফেলবে!'

'করবে না। আমাকে চেনে।'

দরজা খুলে আস্তে ঢুকে পড়ল মুসা।

'এই, খোকা, চুপ কর! আমি, চিনতে পারছিস না? আমি...'

কিন্তু তার কথা হাতির কানে ঢুকল বলে মনে হলো না। নিজের চিৎকারেই হয়তো কান ঝালাপালা, মুসার কথা আর শুনতে পাচ্ছে না। এক ধাক্কায় তাকে ফেলে দিল।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। খাঁচার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

চেপে ধরল তাকে বাচ্চাটা। চাপ দিতে শুরু করল। আরেকটু বাড়লেই মড়মড় করে পাঁজর ভেঙে যাবে মুসার। বুঝল, কিশোর ঠিকই বলেছে। ঢোকাটা

উচিত হয়নি।

শুঁড়টা ধরার জন্যে হাতড়াতে শুরু করল সে। ওটাতে হাত বুলিয়ে দিতে পারলে হয়তো শান্ত করা যাবে।

একটা কান ঠেকল হাতে। একটা দাঁত। হাত চলে গেল যেখানে শুঁড় থাকার কথা, কিন্তু নেই ওটা। তার বদলে চটচটে আঠাল পদার্থ ভিজিয়ে দিল হাত।

আরেকটু ওপর দিকে হাত তুলতে হাতে ঠেকল কাটা মাংস। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। আরও ওপরে কাটা শুঁড়ের গোড়াটুকু।

ব্যাপারটা বুঝে ফেলল মুসা। চুরি করতে এসে দু-জন প্রহরীকে খুন করেছে ডাকাতেরা। হাতিটাকে চুরি করতে চেয়েছে। কিন্তু তালা খুলতে পারেনি। বাচ্চাটা ভেবেছিল, কোন বন্ধু এসেছে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। শুঁড় বাড়িয়ে স্বাগত জানাতে গিয়েছিল সে। কেটে ফেলেছে ভয়ানক নিষ্ঠুর লোকটা। নিশ্চয় ভেবেছে–নিতেই যখন পারলাম না, অন্য কাউকেও রাখতে দেব না। শুঁড় কাটা হাতির কোন দাম নেই।

প্রচণ্ড যন্ত্রণায় পাগল হয়ে গেছে বাচ্চাটা। শান্ত করার আশা বৃথা। খাঁচায় থাকলে মরতে হবে। তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোল কিশোর।

এই খেপা অবস্থায় শুঁড় থাকলে কিছুতেই বেরোতে পারত না মুসা, ধরে ফেলত তাকে হাতি। এখন ধরতে পারল না বটে, মাথা দিয়ে ঢুস মারতে ছাড়ল না।

খাঁচার বাইরে কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়ল মুসা।

তাড়াতাড়ি এসে তাকে তুলে নিল কয়েকজন কুলি।

খাঁচা থেকে ছুটে বেরোল ক্ষিপ্ত হাতি। যাকে সামনে পেল তাকেই ধরার চেষ্টা করতে লাগল। এদিক ওদিক ছুটে পালাতে শুরু করল লোকে।

কাউকে ধরতে না পেরে গাঁয়ের দিকে ছুটল মত্ত হাতি। প্যাপিরাসের তৈরি কুঁড়ের বেড়াগুলো ধসিয়ে দিতে লাগল ঢুস মেরে। তছনছ করে ফেলতে লাগল সবকিছু।

আচমকা কানফাটা শব্দে গর্জে উঠল ভারি রাইফেল।

ঢলে পড়ল হাতিটা।

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে তখন। সেই আবছা আলোয় কিশোরের হাতে রাইফেলটা দেখতে পেল মুসা।

'কেন মারলে?' চিৎকার করে উঠল সে।

'আর কি করতে পারতাম!'

'কয়েক মিনিট সময় পেলে শান্ত করতে পারতাম ওকে। মেরে ফেলার দরকার ছিল না।'

'পারতে না। ওর শুঁড়ের যন্ত্রণা কমত না। ক্রমেই আরও ক্ষিপ্ত হত। রক্তক্ষরণে মরার আগে আরও কি কি ক্ষতি করত কে জানে। মানুষ মারলেও অবাক হতাম না।'

'কিন্তু ওষুধ আছে আমাদের কাছে। ওর চিকিৎসা করতে পারতাম।'

'দেখো, মুসা, মাঝে মাঝে তুমি খুব বোকা হয়ে যাও! তোমার দুঃখ বুঝতে

পারছি। একটা কথা বুঝতে পারছ না, জখমটা সারানো গেলেও কোনদিনই আর শুঁড় ফিরে পেত না সে। বেঁচে থাকতে সাংঘাতিক অসুবিধে হত। তোমার দুটো হাত কেটে দিলে কি অবস্থা হবে বলো? হাতির শুঁড় না থাকলে আমাদের হাত না থাকার চেয়েও বেশি অসুবিধে হয়। পানিও খেতে পারে না। ওকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়ার আর কোন উপায় ছিল না।'

ছুরি আর কুড়াল নিয়ে মৃতদেহটার ওপর ততক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গ্রামবাসীরা। হাতির মাংস তাদের প্রিয় খাবার। নষ্ট করার মানে হয় না।

কিশোরের কথায় তখনকার মত চুপ হয়ে গেলেও রাগ চাপা আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলতে লাগল মুসার মনে। ডাকাতদের ওপর বিষিয়ে গেছে মন। দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন একটা প্রতিজ্ঞা করল সে। তাকাল বন্ধুর দিকে।

বুঝতে পারল কিশোর। নীরবে মাথা ঝাঁকাল শুধু।

নয়

নাস্তার পর ঘটনাটা নিয়ে আকামির সঙ্গে আলোচনায় বসল কিশোর।

'সামান্য ক'টা টাকার জন্যে এত নিষ্ঠুর হতে পারে কেউ, ভাবা যায় না!' বলল সে। 'কাল রাতে আবার নিশ্চয় পায়ের ছাপ রেখে গেছে। কি মনে হয় তোমার, পিছু নিয়ে ধরা যাবে?'

মাথা নাড়ল আকামি। 'না, লাভ নেই। কালকের অবস্থাই হবে। পানির কাছে টেনে নিয়ে যাবে আমাদের, তারপর ফুস্!'

'যদি খালি জানতাম কোথায় থাকে ব্যাটারা! এতবড় পার্বত্য এলাকায় কোথায় খুঁজব ওদের?'

'হাঁটাচলাও সহজ নয় এখানে,' মুসা বলল। 'রাস্তা তো নেইই, দুনিয়ার যত কাদা, হ্রদ, জঙ্গল, খাড়া খাড়া টিলা আর তুষার।'

'তারপরেও, হাল আমরা ছেড়ে দিতে পারি না,' কিশোর বলল। 'আকামি, সবাইকে বলো তৈরি হতে। একঘণ্টার মধ্যেই বেরোব আমরা।'

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে ফিরে তাকাল মুসা। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল। বন থেকে বেরোতে দেখেছে খুদে দানবকে।

মাথা বের করেই দাঁড়িয়ে গেছে হাতির বাচ্চাটা। সাবধানে তাকাচ্ছে। মুসাকে দেখে চিৎকার করে উঠল আনন্দে। ছুটে এল তার দিকে।

মুসাও ছুটে গেল। 'কোথায় ছিলি তুই খুদে! জলদি বল! কেমন আছিস?'

ম্যাজিকের মত চারপাশে লোক জড় হয়ে গেল। মুসার দুঃখ দেখে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ওদেরও, আনন্দ দেখে খুশি হলো।

সবাই খুশি, কেবল সর্দার ওগারো বাদে।

'আমার ছেলে? আমার ছেলে তো এল না ওর সঙ্গে!'

সবগুলো চোখ ঘুরে গেল বনের দিকে। আউরোকে দেখা গেল না।

ডাকাতদের আখড়া থেকে পালিয়ে এসেছে একলা খুদে দানব। কাদায় মাখামাখি। তাকে হ্রদে গোসল করাতে নিয়ে গেল মুসা।

ভাল করে গোসল করিয়ে তাকে নিয়ে পানি থেকে উঠে এল সে। খেতে দিল।

অনেক অত্যাচার চলেছে বেচারার ওপর। চামড়ায় আঁচড় আর কাটাকুটির দাগ। কাঁটা বসানো ভারি বুটের লাথি আর চামড়ার চাবুকের বাড়ির স্বাক্ষর ওগুলো।

ভীষণ রাগ লাগছে মুসার। শাস্তি দিতেই হবে শয়তানগুলোকে। আউরোকেও উদ্ধার করে আনতে হবে। কিন্তু ওদের আস্তানাটা খুঁজে পাবে কি করে? পায়ের ছাপ ধরে গিয়ে যে লাভ নেই, সে তো জানাই হয়ে গেছে।

চট করে মাথায় এল বুদ্ধিটা। তাই তো, খুদে দানবের পায়ের ছাপ ধরে ধরে গেলেই হয়! কাছেই আকামিকে দেখে উত্তেজিত হয়ে তাকে কথাটা জানাল মুসা।

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল আকামি।

'হতে পারে, কাজ হতে পারে!'

সুতরাং আবার দল বেঁধে বেরোনোর পালা। আগের রাতে ডাকাতেরা যে ছাপ রেখে গেছে, সেগুলোকে গুরুত্ব দিল না ওরা, বাচ্চা হাতিটার ছাপ অনুসরণ করে এগোল। অনেক জায়গায় ছাপ অত্যন্ত অস্পষ্ট, কিন্তু আকামির অভিজ্ঞ চোখে তা-ও এড়াল না।

গ্রীন লেকের দিকে এগিয়ে গেছে চিহ্ন। তবে এবার আর পানিতে হারিয়ে গেল না। বরং হ্রদের পাড় ধরে এগোল। ডানে ঘুরে পুব দিকে চলে গেছে। পুব প্রান্ত ছাড়িয়ে, জলপ্রপাত পেরিয়ে প্রায় খাড়া পথ বেয়ে উঠে গেছে ব্যালকনিতে, যেখানে ব্ল্যাক লেককে ঢেকে রেখেছে কালো মেঘ। এখানে জন্মে আছে প্রকাণ্ড পাম, প্রকাণ্ড মিমোসা আর আট ফুট উঁচু ঘাস। বিশাল এক গণ্ডার চরছে দানবীয় বিছুটি বনে, তিন ইঞ্চি লম্বা কাঁটাওয়ালা ডালগুলো চিবিয়ে চলেছে–ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আইসক্রীম কেক খাচ্ছে। হ্রদের কিনারে জন্মে আছে বড় বড় জলজ উদ্ভিদ।

পুরো দৃশ্যটা এতটাই অস্বাভাবিক, মুসার মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছে। বিড়বিড় করে বলল, 'এ তো ফ্যান্টাসি ল্যান্ড! কল্পনার রঙিন জগৎ!'

'মোটেও কল্পনার জগৎ নয়, বাস্তব, অতিমাত্রায় বাস্তব,' কিশোর বলল। 'তিরিশ লক্ষ বছর আগে পুরো আফ্রিকারই এই চেহারা ছিল। এখান থেকে বেশি দূরে নয় সেরেঙ্গেটি প্লেন–বিশাল এক তৃণপ্রান্তর, ওখানে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে অতিকায় শুয়োর, ভেড়া, উটপাখি, বেবুন আর গণ্ডারের ফসিল। আজকের গণ্ডারের দুই গুণ বড় ছিল ওগুলো। আফ্রিকা ছিল দানবের রাজত্ব। দানবেরা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কেবল এই পার্বত্য এলাকা বাদে। এখানে ওরা টিকে আছে আজও।'

'কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না আমার, পৃথিবীর সব জায়গা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল দানবেরা, অথচ এখানে টিকে থাকল কি করে?'

'এর সঠিক জবাব কেউ দিতে পারে না। প্রতিদিন বৃষ্টি হওয়াটা অবশ্য একটা বড় কারণ। তাতে দ্রুত বাড়ে গাছপালা, বড় হয়; আর বেশি খাবার পেলে

তৃণভোজীরাও বিশালাকার হয়ে যায়। কিন্তু অনেক কারণের একটা হতে পারে এটা, সব নয়। আরেকটা জবাব হতে পারে এই জায়গাটা কোনভাবে আলাদা হয়ে গিয়েছিল দুনিয়ার সঙ্গে, এখনও আলাদা হয়েই আছে, সাগরের মাঝে দ্বীপগুলো যেমন মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে যায়। মাটিরও কোন ব্যাপার থাকতে পারে। এই অঞ্চলে কখনও আগ্নেয়গিরির উৎপাত হয়নি, ফলে সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে একই রকম রয়ে গেছে মাটি। যা-ই ঘটে থাকুক, এখানে আমরা তিরিশ লক্ষ বছর আগের পৃথিবীর পরিবেশে রয়েছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেমন লাগছে ভাবতে?'

'ভূতুড়ে!'

ভারি কুয়াশা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে রূপ নিল। বাড়তে বাড়তে একেবারে মুষলধারে শুরু হলো, সেই সঙ্গে বজ্রপাত। দশ মিনিটে মুছে দিল বাচ্চা হাতিটার পায়ের ছাপ।

হঠাৎ করে থেমে গেল বৃষ্টি। পায়ের ছাপের জন্যে ব্যর্থ খোঁজাখুঁজি চলল। মেঘের নিচে ঢেকে থাকা অদৃশ্য পর্বতের দিক থেকে ভেসে এল বাজ পড়ার প্রচণ্ড শব্দ, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল যেন ব্যঙ্গের হাসি হেসে।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে সবাইকে ছড়িয়ে পড়ে একশো ফুট গোল একটা বৃত্ত তৈরি করার নির্দেশ দিল আকামি। তারপর ভাল করে প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা পরীক্ষা করে দেখতে বলল। দেখতে দেখতে কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে আসবে সবাই।

কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। ভেজা মাটিতে বসে পড়ল ওরা।

আবার বজ্রের হাসি শোনা গেল গুপ্ত পর্বত থেকে।

এই শব্দ রাগিয়ে দিল কিশোরকে। 'এখানে বসে বসে ওই হাসি শুনবে নাকি? তোমরা পুরুষ মানুষ, না কচি খোকা? দুদু খাও? যাদের ভয়ে কাবু হয়ে বসে আছ এখানে, তারা দেবতা নয়, আমাদেরই মত মানুষ। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আশেপাশেই কোথাও আছে ওরা, হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। ওদের খুঁজে বের আমাদের করতেই হবে। এক কাজ করি এসো, ভাগাভাগি হয়ে খুঁজতে থাকি। একসঙ্গে দু-জন দু-জন করে থাকব। এই জায়গা থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ব আমরা। তন্নতন্ন করে খুঁজব। দুপুর নাগাদ ফিরে আসব আমরা এই জায়গায়, কেউ কিছু পেয়ে থাকলে বলব।'

কেউ আনমনে মাথা নাড়ল, কেউ বিড়বিড় করল, কিন্তু নির্দেশ অমান্য করল না কেউ। কে কার সঙ্গে থাকবে, ভাগ করে দিল আকামি। একেক দল একেক দিকে ছড়িয়ে গেল। কিশোর-মুসা রওনা হলো উত্তরে।

খাড়া আরেকটা ঢালের কাছে চলে এল ওরা। দানবীয় গাছপালা এখানেও, রোমশ ডালপালা; বিরাট বিরাট ফুল—যেমন ডেইজির আকারই বাসনের সমান। যে সব শ্যাওলা পায়ের নিচে কার্পেটের মত হয়ে থাকার কথা, সেগুলো কিশোরের মাথা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে দিয়ে কয়েক গজ এগিয়েই থেমে গেল দু-জনে। সামনে অসম্ভব ঘন হয়ে জন্মেছে শ্যাওলা, লতার সঙ্গে জট পাকিয়ে দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে একেবারে নিরেট, কোন ফাঁক-ফোকর নেই এর মধ্যে।

'হবে না এ ভাবে,' মাথা নেড়ে বলল কিশোর। 'শ্যাওলা ঠেলে এগোনো যাবে না। এমন কাণ্ড আর দেখিনি!'

'জন্তু-জানোয়ার চলাফেরা করে কি ভাবে তাহলে?'

'ভাল প্রশ্ন। নিশ্চয় সুড়ঙ্গ আছে। করে নিয়েছে ওরা। চলো, বেরিয়ে গিয়ে খুঁজে দেখি।'

যতটা কষ্ট করে ঢুকেছে, ঠিক ততটাই কষ্ট করে শ্যাওলা যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে আবার বেরিয়ে এল ওরা। শ্যাওলার কিনারা ধরে এগোল। খুঁজে বের করল সুড়ঙ্গমুখটা। কিন্তু বড় বেশি সরু ওটা—সাপ কিংবা ইঁদুর-ছুঁচো জাতীয় প্রাণীরা তৈরি করেছে। কিন্তু চন্দ্রপাহাড়ের ইঁদুর-ছুঁচোও বেড়ালের চেয়ে বড়।

মুসা বলল, 'মোড়ামুড়ি করে ঢুকে যাওয়া যায়।'

'তা যায়। গিয়ে সাপের কামড় খেয়ে মারাও যায়। ইঁদুর চলাচল করলে এখানে সাপ থাকতে বাধ্য। মাম্বা কিংবা গোখরোর মুখোমুখি পড়লে আর বাঁচতে হবে না। অন্য কিছু করা দরকার।'

কি করবে ভাবছে ওরা, এই সময় সমস্যার সমাধান করে দিল একটা শুয়োর। ছুটে বেরোল আরেকটা বড় সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে। এতক্ষণ ওই মুখটা চোখে পড়েনি ওদের।

মানুষ দেখে থমকে দাঁড়াল শুয়োরটা। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শুরু করল। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে গোলমাল না করে ছাড়বে না।

ছুরির মত ধারাল ভয়ঙ্কর দাঁতগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। মুসাকে সাবধান করল, 'চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো!'

চোখ গরম করে গোঁ-গোঁ করে ধমক দিল শুয়োরটা, কয়েকবার আক্রমণ করার মিথ্যে হুমকি দিল। কিন্তু 'বোকা মানুষগুলো' তার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না দেখে বোধহয় ভাবল, এই কাপুরুষদের সঙ্গে লড়াই করে মজা নেই। শেষবারের মত একবার শাসিয়ে, দাঁত নাচিয়ে, নেমে চলে গেল পর্বতের ঢাল বেয়ে।

দশ

সুড়ঙ্গটার ভেতরে উঁকি দিল ওরা। তিন ফুট উঁচু, দুই ফুট মত চওড়া। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

ভেতরটা মোটেও পছন্দ হলো না মুসার। 'হাত-পায়ে ভর দিয়ে এগোতে হবে। ভেতরে ঢুকে আরেকটা শুয়োরের যদি মুখোমুখি হয়ে যাই? যা অন্ধকারের অন্ধকার, বাপরে বাপ! সাংঘাতিক বিপদে পড়ব!'

'অন্য ভাবেও ভেবে দেখতে পারো। তোমার যেমন অপছন্দ, শুয়োরেরও তেমনি অপছন্দ হতে পারে এই সুড়ঙ্গ। চিতাবাঘের ভয়ে। সুতরাং সামনে যদি শুয়োর পড়ে, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করেই, তুমিও চেঁচানো শুরু করবে। চিতাবাঘের মত গর্জন করতে পারলে তো আরও ভাল। চিতাবাঘ সাজার এই মোক্ষম সুযোগ ছাড়া

বোধহয় উচিত হবে না। কি বলো?'

'পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু গর্জনের ওপর ভরসা করতে পারব না আমি। ছুরিটা হাতে রাখব। চিৎকার শুনে ভয় না পেলে শেষ ভরসা এই ছুরি।'

'হাতে নয়, দাঁতে,' শুধরে দিল কিশোর। 'হামাগুড়ি দেয়ার জন্যে হাত দুটো ব্যবহার করতে হবে তোমাকে। ছুরি ধরতে পারবে না।'

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে, দাঁতে ছুরি কামড়ে ধরার পর শুয়োরের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর মনে হলো না দুই গোয়েন্দাকে।

আগে সুড়ঙ্গে ঢুকল কিশোর। সামনে কোনও বিপদ থাকলে প্রথমে সে-ই সেটার মোকাবেলা করতে চায়।

এতে মুসা যে বিপদমুক্ত থাকল তা নয়, কারণ আক্রমণ পেছন থেকেও আসতে পারে।

তাতে বরং বিপদটা বেশিই, পেছন দিকে ছুরি চালাতে পারবে না। এত সরু সুড়ঙ্গে ঘোরার উপায় নেই।

বন্ধুকে সামনে থাকতে দেয়ায় শুরুতে যে অস্বস্তিটা ছিল, এখন আর নেই। বিপদে পড়লে কিশোর তো অন্তত ছুরি চালাতে পারবে, সে তা-ও পারবে না। তার সামনের দিকটায় একটা বাধা অন্তত আছে, পেছনে কিছুই নেই। একেবারে খোলা। শুয়োর এসে যদি দাঁত দিয়ে চিরে দেয়, কিংবা চিতাবাঘে কামড়ে ধরে, কিছুই করার থাকবে না তার।

'চলো, এগোই,' কিশোর বলল। 'কোন অসুবিধে আছে?'

'না,' মানা করে দিল মুসা। বিপদটা বুঝতে যখন পারেনি তার বন্ধু, না বুঝুক, না বুঝে স্বস্তিতে থাকুক।

চলতে চলতে নতুন আরেকটা দুশ্চিন্তা এসে ভর করল মাথায়–কত লম্বা এই সুড়ঙ্গ? কয়েক মাইলও হতে পারে। এভাবে হামা দিয়ে কতটা এগোনো সম্ভব? বিপদ আরও আছে। মাটিতে পড়ে থাকা কুটো আর চোখা পাথর ইতিমধ্যেই হাতের তালু আর হাঁটুতে খোঁচা দিতে আরম্ভ করেছে। এই অত্যাচার কতক্ষণ সইতে পারবে?

সামনে থেকে ডাকল কিশোর, 'মুসা, আসছ?'

অনেকটা এগিয়ে গেছে সে। শ্যাওলার সুড়ঙ্গের ভেতর প্রতিধ্বনি তেমন হলো না, শব্দটাও কেমন চাপা চাপা।

চিৎকার করে জবাব দিল মুসা।

কয়েক মিনিট নীরবে হামাগুড়ি দিল সে। হঠাৎ শ্যাওলায় বাড়ি খেল মাথা। থেমে গিয়ে হাতড়ে হাতড়ে বোঝার চেষ্টা করল, ব্যাপারটা কি? দু-ভাগ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ।

এবার কি? কোনটা ধরে যাবে? ডাকল, 'কিশোর?'

মনে হলো, তার মুখ ভর্তি তুলো। বিস্ময়কর ভাবে শব্দ চেপে দিচ্ছে শ্যাওলা। আবার চিৎকার করে ডাকল সে। কোন ফল হলো না। বেশিদূর এগোল না তার ডাক। সাড়াও মিলল না।

আবার চিৎকার করল।

জবাব নেই।

তার জন্যে অপেক্ষা করল না কেন কিশোর? হয়তো দু-ভাগ যে হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ, এটা খেয়ালই করেনি। খোলা পেয়েছে, ঢুকে পড়েছে। মাথায় বাড়ি না লাগলে সে নিজেও বুঝতে পারত না। যেটা খোলা পেত, সেটা দিয়েই ঢুকে যেত।

মাথা গরম হতে দিল না সে। তাতে বিপদ বাড়বে। শান্ত থেকে ভাবার চেষ্টা করল–কি ঘটতে পারে? সুড়ঙ্গটা যে ভাগ হয়েছে কিশোর এটা খেয়াল না করলে যেটা সোজা গেছে সেটা দিয়েই ঢুকবে। মোড় নিয়েছে যেটা সেটা দিয়ে নয়। তাহলে সোজা গেছে কোনটা? কি ভাবে বোঝা যাবে?

গাঢ় অন্ধকারে সেটা বোঝা কঠিন।

দুটো সুড়ঙ্গই সোজা গেছে মনে হচ্ছে।

ভীষণ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করল–ভয়ে নয়, আসলে পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছি আমি। পরিশ্রম হবেই, রয়েছে খাড়া পর্বতের ঢালে। হাত-পায়ে ভর দিয়ে ঢাল বেয়ে ওপরের দিকে ওঠা সহজ ব্যাপার নয়।

কিন্তু মন কি আর ফাঁকিতে পড়ে? ঠিকই বুঝতে পারছে, পরিশ্রমে নয়, বুক কাঁপছে প্রচণ্ড ভয়ে। ফাঁদে পড়া ইঁদুরের চেয়েও খারাপ অবস্থা হয়েছে তার।

অন্ধকার এই গর্তের মধ্যে বোঝারও উপায় নেই কোথায় ঘাপটি মেরে আছে হিংস্র জানোয়ার, কিংবা মারাত্মক বিষাক্ত সাপ। কোনদিকে যাচ্ছে তা-ও বোঝা যায় না। যদি দেখতে পেত, এতটা অনিশ্চয়তায় ভুগত না।

ছুরি দিয়ে ছাতে খোঁচা মেরে দেখল। গায়ে গায়ে জড়িয়ে গিয়ে শক্ত রবারের মত হয়ে আছে শ্যাওলা। কাটার জন্যে খুঁচিয়েই চলল। হাত ব্যথা হয়ে গেল। কিন্তু থামল না সে। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে ছাত দিয়ে দেখা গেল এক চিলতে আলো।

দ্বিগুণ উদ্যমে খোঁচাতে থাকল সে।

মাথা গলানোর মত একটা ফোকর করে ফেলল।

আলোয় মাথা বের করতে পারাটা একটা বিরাট স্বস্তি। কিন্তু লাভটা কি? চারদিকে যেদিকেই তাকায় কেবল শ্যাওলা, শ্যাওলা আর শ্যাওলা। তা-ও বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। কুয়াশায় গিলে নিয়েছে যেন শ্যাওলার বনকেও।

কোনটা যে কোন দিক, বাইরেটা দেখে আরও অনিশ্চিত হয়ে গেল। কিছু বোঝার উপায় নেই। ভেতরে তো অন্তত দুটো সুড়ঙ্গ আছে, যে কোন একটা বেছে নিতে পারে। এখানে কি আছে? কিচ্ছু না।

আবার মাথা নিচু করে ফেলল। হাত-পায়ে ভর দিয়ে এগোল ডানের সুড়ঙ্গ ধরে।

কিশোরের নাম ধরে ডাকল আবার।

সাড়া নেই।

বুঝল, এভাবে ডেকে ডেকে অহেতুক দমই শেষ করবে, লাভ হবে না।

ছড়ে যাওয়া তালু আর হাঁটুতে ভর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল। প্রতিবার হাত বাড়াতে গিয়েই মনে হচ্ছে এই বুঝি হাতটা পড়ল মসৃণ, পিচ্ছিল কোন ঠাণ্ডা

কিলবিলে শরীরে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠবে সরীসৃপটা, ছোবল মারবে।

কিন্তু তেমন অঘটন ঘটল না।

আরেকটা দুই-সুড়ঙ্গের কাছে পৌঁছাল সে।

ডানে যাবে না, বাঁয়ে?

দুটো একই রকম মনে হলো তার, বাঁয়েরটাই ধরল।

একটু পরেই থেমে গেল। কান পেতে আছে। সামনে মৃদু একটা খসখস শব্দ। এগিয়ে আসছে!

কিছু একটা আসছে!

আশা করল, ছোট কিছু হবে, নির্বিষ, ক্ষতি করতে পারবে না, এমন কিছু, শজারু কিংবা খরগোশ। কিন্তু অত ছোট জানোয়ার এমন শব্দ করতে পারবে না। শব্দটা হচ্ছে সুড়ঙ্গের ছাত আর দেয়ালে ঘষা খাওয়ার ফলে।

দ্রুত মনের পর্দায় খেলে গেল ভয়াবহ কতগুলো জন্তুর মুখ। প্রাণীটা গরিলা, দানবীয় পিঁপড়ে ভালুক কিংবা জঘন্য হায়েনা হতে পারে। তিনটেই সাংঘাতিক জীব। শুয়োরও কম বিপজ্জনক নয়। ক্ষুরের মত ধারাল দাঁত ওগুলোর। চোখের পলকে চিরে ফালাফালা করে দিতে পারে।

এ রকম বদ্ধ জায়গায় সবচেয়ে মারাত্মক হলো চিতাবাঘ।

ভাবনাটা অবশ করে দিতে চাইল তার শরীর।

পিছিয়ে যাবে?

লাভ নেই। যত তাড়াতাড়িই পিছাক, তারচেয়ে অনেক দ্রুত ছুটে আসতে পারবে চিতাবাঘ। ধরে ফেলতে কয়েক সেকেন্ডও লাগবে না।

ভয় পেয়েছে সে এটা বুঝতে পারলে আরও সাহস হয়ে যাবে বাঘটার। দ্বিধা থাকবে না আর, আক্রমণ করতে ছুটে আসবে।

মনে পড়ল কিশোরের কথা–ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করবে···

কিন্তু শুয়োর হওয়ার ইচ্ছে নেই তার। জানোয়ারই যখন হতে হবে, চিতাবাঘই হবে, গর্জন করবে।

এমন গর্জন শুরু করল, দুনিয়ার কোন চিতাবাঘই তা পারবে না। একই সঙ্গে সামনের দিকে ছুটে গেল আক্রমণের ভঙ্গিতে। জানোয়ারটা সাহস সঞ্চয় করার আগেই তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে হবে।

গর্জনের জবাবে গর্জন। জবাবটাও কম ভয়ঙ্কর নয়।

আরও জোরে গর্জন করতে লাগল মুসা। মনে হচ্ছে ফুসফুস ফেটে যাবে। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে জন্তুর মত করে যতটা জোরে সম্ভব ছুটে গেল সামনের দিকে।

ঠাস করে মাথায় মাথায় বাড়ি লাগল।

'উফ্!' করে উঠল চিতাবাঘটা।

'উফ্!' করে উঠল সে নিজেও।

বসে পড়ল দুই চিতাবাঘ। হাসতে লাগল। ভীতুর হাসি। কারণ দু-জনেই ভয় পেয়েছে সাংঘাতিক।

'এখানে তোমার দেখা পাব, কল্পনাই করিনি,' কিশোর বলল।

'মুখটার কাছে অপেক্ষা করনি কেন? দু-ভাগে ভাগ হয়েছে যেখানটায়।'
'দু-ভাগ? বুঝতেই পারিনি! এখন বলো দেখি, ভুল পথে এলে কি করে?'
'আন্দাজে ঢুকে পড়েছি দুই সুড়ঙ্গের একটাতে।'
'ঘুরতে পারবে?'
চেষ্টা করল মুসা। শরীর বাঁকিয়ে, মুচড়ে-টুচড়ে, অনেক ভাবে। শেষে বাদ দিল চেষ্টা।
'পারব না। বেশি সরু।'
'তাহলে পিছাতেই হবে তোমাকে, উপায় নেই। বেশি দূর যেতে হবে না, ভেবো না, এই পাঁচ থেকে দশ মাইল!' তিক্ত কণ্ঠে বলল কিশোর।
কি যেন ভাবল মুসা। শান্তকণ্ঠে বলল, 'দাঁড়াও, পাঁচ মিনিটেই ঘুরে যাব।'
'কি করে?'
হাসল মুসা, 'জাদু জানি আমি। এসো।'
পিছাতে লাগল মুসা। চলে এল দ্বিতীয় দুই-সুড়ঙ্গটার মুখে। পাশেরটাতে ঢুকে চুপ করে বসে রইল। তার পাশ কাটিয়ে গেল কিশোর। তখন পিছু নিল সে।
কিশোর ভাবল, এখনও তার সামনেই রয়েছে মুসা। হঠাৎ পেছনে এক ভয়াবহ গর্জন শুনে চমকে উঠল। অপেক্ষা করছে চিতাবাঘের ধারাল নখের আঁচড়ের। তার বদলে খোঁচা লাগল ছুরির মাথার।
'তুমি! পেছনে গেলে কি করে!'
'বললাম না, জাদু।'
'আরে বাবা অত মশকরা করছ কেন? বলেই ফেলো না।'
ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল মুসা।
একটা ঘণ্টা হামাগুড়ি দিল ওরা।
তারপর থেমে গেল কিশোর। 'আমার হাতও শেষ, হাঁটুও শেষ। আর কোন দিন উঠে দাঁড়াতে পারব না! জানোয়ার হয়ে বাঁচতে হবে।'
চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মুসা। 'না ঘুমিয়ে আর পারব না আমি। যাও, ঘুরে এসো। আমি এখানেই অপেক্ষা করব।'
কিন্তু এখানে ঘুমানো অসম্ভব মনে হলো তার। শ্যাওল-বনে বুকে হেঁটে চলা কুৎসিত প্রাণীর অভাব নেই, ওগুলো জাগিয়ে রাখল তাকে। চুপ করে থাকলেই শরীরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।
কাঁপুনি উঠে গেল এক সময়।
'জমে যাচ্ছি ঠাণ্ডায়,' বলল সে। 'চলো, এগোই। না হলে শরীর গরম থাকবে না।'
'বাপরে বাপ, এমন ঠাণ্ডার ঠাণ্ডা! মনে হচ্ছে মেরু অঞ্চলে আছি!' আবার এগোতে শুরু করল কিশোর।
খানিক দূর এগিয়ে থেমে গেল। 'এই মুসা, দেখো, মনে হয় এসে গেছি। আলো দেখতে পাচ্ছ?'
নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলল ওরা।
আলোটা বাড়ছে ক্রমে।

অবশেষে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। আলো এত উজ্জ্বল লাগল, চোখই মেলতে পারল না ঠিকমত, মিটমিট করতে থাকল। অথচ আলো যে খুব বেশি, তা নয়। রোদের চিহ্নও নেই, মেঘে ঢাকা সূর্য; এমন লাগছে বেশিক্ষণ একটানা অন্ধকারে থেকে দিবালোকে বেরিয়ে আসার কারণে।

'আমি মনে করেছিলাম বিষুবরেখার কাছাকাছি আছি,' মুসা বলল। 'কিন্তু এ তো মেরু অঞ্চল।'

'বিষুবরেখাতেই আছি। তবে সাগরসমতল থেকে অনেক ওপরে তো, তাই এত ঠাণ্ডা। আল্পস পর্বতের চূড়ার চেয়েও ওপরে রয়েছি আমরা।'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। 'যাহ্, বেশি বলে ফেলছ! তা কি করে হয়? মন্ট ব্ল্যাঙ্কের উচ্চতা পনেরো হাজার ফুট।'

'জানি। কিন্তু এটার চূড়া সতেরো হাজারের কাছাকাছি। আমরা আছি প্রায় ষোলো হাজার ফুট উঁচুতে।'

'মস্ত বড় পর্বতারোহী হয়ে গেলাম তো তাহলে। তাই তো বলি, এত শীত লাগে কেন! কিন্তু এত ওপরে, এই ঠাণ্ডাতেও যে দাবানল লাগতে পারে, জানতাম না। দেখো, কত ছাই।'

'ছাই? কুয়াশার জন্যে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছি না আসলে। ছাই কোথায়?'

'এই তো।'

'হাত রেখে দেখো।'

হাত রাখল মুসা। হাতে লেগে গেল ভেজা ভেজা সাদা জিনিস।

'আরি, তুষার! বিষুব অঞ্চলে তুষার! স্বপ্ন দেখছি নাকি!'

'আরও দেখো। ওই যে, হ্রদটা, হোয়াইট লেক।'

কুয়াশা বড় বেশি সচল এখানে। এই সরছে, এই জমছে। সরে যেতে বেরিয়ে পড়েছে হ্রদটা। আক্ষরিক অর্থেই সাদা। পানির ওপরে পুরোটা বরফ হয়ে আছে। তার ওপর হালকা তুষারের আস্তরণ।

কেমন পাথুরে, মরু প্রকৃতি এখানকার। দানবীয় ফুল আর গাছপালা অনেক পেছনে পড়ে আছে। কুয়াশার চাদরের ওপাশে কোথাও রয়েছে পর্বতের আকাশ ফুঁড়ে ওঠা চূড়া। আছে বরফের নদী। যেখান থেকে যখন তখন হিমবাহ নেমে যায় নিচের খাঁড়ির দিকে।

কুয়াশা কুণ্ডলীর ফাঁকে ফাঁকে নিচের আজব দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, যেন এলিসের মত এক আজব দেশে এসে পড়েছে ওরা। যেখানকার সবই অদ্ভুত। পর্বতের কোলে বিশাল ছড়ানো আঙিনায় যেন বিষণ্ন হয়ে ঘুমিয়ে আছে কালো ব্ল্যাক লেক। তার নিচে ব্যালকনিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যেন গ্রীন লেক, চারপাশের জঙ্গলের পটভূমিতে একটা রত্নের মত জ্বলছে।

নিচে, অনেক নিচে, পর্বতের পাদদেশে চোখে পড়ছে ছোট হোটেলটার চালাগুলো, যেখানে গেস্ট বুকে দেখেছে সেই সব বিখ্যাত মানুষদের নাম, যাঁরা এই পর্বতের চূড়ায় চড়ার বহু চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অনেক রাজকুমার, কাউন্ট, ডিউক, এবং রয়্যাল জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটির লোয়েল টমাস জুনিয়র আর অ্যাডলাই স্টিভেনসনের মত অভিযাত্রীরা।

তবে গেস্ট বুকে খুব কম নামই লেখা আছে। আরও হাজার হাজার মানুষ সেই অনাদিকাল থেকে ঘুরে গেছে এই রহস্যময় পর্বতের পাদদেশ থেকে, চেষ্টা চালিয়েছে এর চূড়ায় ওঠার।

আবার এগিয়ে এল কুয়াশার ধূসর চাদর, চোখের সামনে বাধা হয়ে ঢেকে দিল নিচের অপরূপ দৃশ্য–হ্রদ, জঙ্গল, বাড়িঘর।

চন্দ্রপৃষ্ঠের চেয়েও বিস্ময়কর এই পর্বতের জন্যে চাঁদের পাহাড় নামটা মোটেও অসঙ্গত নয়!

এগারো

বাতাসে ক্রমাগত রূপ বদল করছে কুয়াশা। অদ্ভুত সব আকৃতি তৈরি হচ্ছে–কোনটা স্তম্ভ, কোনটা গাছ, কোনটা বা আবার একশো ফুট লম্বা মানুষ।

'কিশোর, আমার গা ছমছম করছে,' মুসা বলল। 'ওই যে ওই কুয়াশার স্তরটাকে দেখো, মনে হয় যেন একটা হাতি। সাদা হাতি।'

আজব জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। কুয়াশার মত আচরণ করছে না। কুয়াশা হলে এক আকৃতিও বেশিক্ষণ থাকত না, বাতাসেও সরে যেত। এই জিনিসটা সরছে না। একই জায়গায় একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যেন একটা সাদা হাতি, কিংবা সঠিক ভাবে বললে ছাই-সাদা হাতি।

চোখ ডলল কিশোর।

এখনও আছে ওটা।

উত্তেজনায় টগবগিয়ে উঠল রক্ত।

এ সত্যি হতে পারে না। শ্বেতহস্তী খুব দুর্লভ। একটা সাদা হাতির জন্যে ওদেরকে দুই লক্ষ ডলার দেবে বলেছে টোকিও চিড়িয়াখানা।

কিশোরের মনে হলো স্বপ্ন দেখছে। তবে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন যে ভাবে দ্রুত বদলাতে থাকে, এটা তেমন করে বদলাচ্ছে না। এক রকম রয়ে গেছে।

কাছে এগোনোর চেষ্টা করলে হয়তো কুয়াশা হয়ে মিলিয়ে যেতে পারে হাতিটা। তখন নিশ্চিত হতে পারবে, স্বপ্ন, নাকি চোখের ভুল?

'দেখা যাক এটা সত্যি কিনা,' বলল সে। 'এসো। খুব আস্তে, এক পা এক পা করে।'

এগোতে লাগল ওরা।

নড়ল না দানবটা। মিলিয়ে গেল না। ভয় পেয়ে পালাল না। রেগেও গেল না। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো আর কখনও মানুষ দেখেনি। সুতরাং জীবগুলোকে ভয় পাবে, না ঘৃণা করবে, বুঝতে পারছে না।

আরও কাছে এসে কিশোর দেখল, সাদাটা আসলে কুয়াশার জন্যে মনে হয়েছে। কিন্তু কুয়াশার মধ্যে আরও হাতি তো দেখেছে আগে, ওগুলোকে তো এ রকম মনে হয়নি? এটাকে এখন হালকা ধূসর লাগছে। তাতে নিরাশ হলো না সে।

জানা আছে, শ্বেতহস্তী বলতে ধবধবে সাদা হাতি নয়। তুষার শুভ্র হাতির কথা কেবল গল্প-কাহিনীতেই লেখা থাকে। বাস্তবে যেগুলোকে সাদা হাতি বলা হয়, সেগুলোর চামড়া পুরোপুরি কালো নয়, ফ্যাকাসে ধূসর।

একেবারে কাছাকাছি যেতে পারলে বুঝতে পারত, এই হাতিটার ফ্যাকাসে ভাবটা কতখানি বেশি। যত বেশি হবে, তত দাম বাড়বে।

মুসাও কিশোরের মতই সাবধানে এগোচ্ছে। শ্বেতহস্তীর দাম তারও জানা।

ওদের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না হাতিটা।

দশ ফুটের মধ্যে চলে এল দু'জনে। তারপর থামল।

এই মুহূর্তটা জীবনে ভুলবে না ওরা। দম বন্ধ হয়ে আসছে উত্তেজনায়।

এটার চামড়ায় ফ্যাকাসে ভাবটা অনেক বেশি, সে-জন্যেই দূর থেকে কুয়াশার মধ্যে সাদা লাগছিল। মাঝে মাঝে লালচে ছোপ। পিঠটা সাদা, ময়লা তুষারের মত, যেন তুষার জমা পর্বতের চূড়া। নখ সাদা, চোখের রঙ লালচে-সাদা। কান আর মাথায় সাদার মধ্যে লাল লাল ছোট-বড় ফুটকি।

আর কোন সন্দেহ নেই, শ্বেতহস্তীই এটা! মাদী হাতি।

সাদা হাতি যে, তার আরও একটা বড় প্রমাণ, কালো হাতির মত বদমেজাজী নয়। মারচিসন ন্যাশনাল পার্কে একটা সাদা গণ্ডার ছিল। অনেকেই লিখেছে ওটার কথা। খুব নাকি ভদ্র ছিল ওটা, সাধারণ গণ্ডারের মত বদমেজাজী নয়। সাদা খরগোশ, সাদা ইঁদুর, কালো কিংবা ধূসর জাতের পাখি যেগুলো সাদা হয়ে যায়, সবই নাকি শান্ত স্বভাবের হয়। সাদা রঙের তুষার-চিতাকে ভয় পায় না মানুষ। অথচ কালো চিতা আর কালো জাগুয়ার ভয়ানক হিংস্র হয়।

যে চিড়িয়াখানা এই হাতিটাকে পাবে, তারা অতি ভাগ্যবান। দর্শকদের জন্যে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হবে এটা। অনেক চিড়িয়াখানার এই হাতি কেনার সামর্থ্যই নেই। জাপানীদের আছে, দুর্লভ জানোয়ারের জন্যে তারা খরচও করে। ওরা ঘোষণা করেছে দুই লাখ ডলার দেবে, চাপাচাপি করলে আরও অনেক বেশিও দিতে পারে, বিশেষ করে এই হাতিটার জন্যে।

মাত্র দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে এতগুলো টাকা, অথচ ধরে নিয়ে যাওয়ার কোন উপায় দেখছে না ওরা। এতবড় একটা হাতির বিরুদ্ধে দুটো ছেলে কিছুই করতে পারবে না। ধরতে হলে অনেক লোকবল দরকার। এই সাফারির জন্যে যত লোক ভাড়া করেছে ওরা, সবাইকে নিয়ে এলেও হয়তো কাজ হবে না। একটাই কাজ করার আছে আপাতত, জানোয়ারটাকে বিরক্ত না করে, চমকে না দিয়ে চুপচাপ পিছিয়ে যাওয়া। তারপর লোকজন নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসা।

হাতিটার ওপর চোখ রেখে আস্তে আস্তে পিছাতে শুরু করল দু-জনে। যে ভাবে এগিয়েছিল, তার চেয়ে সাবধানে।

হঠাৎ কানের কাছে কথা বলে উঠল একটা ভারি কণ্ঠ।

চমকে ফিরে তাকাল ওরা।

ছয়জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। পরনে আরবদের সাদা পোশাক। হাতে পিস্তল আর তলোয়ার।

'দৌড় দেব নাকি?' মুসা বলল।

'লাভ নেই। গুলি করে মেরে ফেলবে। বরং কথা বলে দেখি।' বাংলা বোঝার প্রশ্নই ওঠে না, ইংরেজিও যে বোঝে না সেটা বোঝা গেল জিজ্ঞেস করতেই। নেতার কাছে জানতে চাইল কিশোর, 'ইংরেজি জানেন?'

জবাবে রাগী ভঙ্গিতে মাথা নাড়ানো আর কিছু আরবী শব্দের তুবড়ি। আকামি যা বলেছে, ঠিক সে-রকম ওদের গায়ের রঙ—সাদাও না, কালোও না। মরুভূমিতে জন্ম, সেখানকার রোদ গাঢ় বাদামী করে দিয়েছে ওদের চামড়া। মাথায় পাগড়ি জড়ানো। পা খালি, জুতো-স্যান্ডেল কিছু নেই। তুষার মাড়াচ্ছে, অথচ ভঙ্গি দেখে মনে হয় না কোন অসুবিধে হচ্ছে। কঠিন লোক ওরা।

কথা বলতে বলতে একবার হাতিটার দিকে, একবার ছেলেদের দিকে তাকাচ্ছে নেতা।

ওদের উদ্দেশ্য আন্দাজ করতে পারছে কিশোর।

'তাঁবুতে হামলা মনে হয় এরাই চালিয়েছে,' বাংলায় বলল সে। 'কোনভাবে জেনেছে, হাতি ধরতে এসেছি আমরা। ওরাও এসেছে একই উদ্দেশে। আমাদের হাতিগুলো ওরা চুরি করেছে। এটাকে ধরতেও বাধা দেবে।'

'এমন ভঙ্গি করো, যেন কোনই আগ্রহ নেই আমাদের।'

'তাই করতে হবে। চুপচাপ সরে পড়ি চলো। অবশ্য যদি যেতে দেয়।'

যেতে দিল না ওরা। যেই পা বাড়াল ছেলেরা, পিস্তলের নল ঠেসে ধরা হলো পিঠে। কাপড় ছিঁড়ে চোখ বেঁধে ফেলল। কেড়ে নেয়া হলো ছুরি দুটো। তারপর এগোনোর জন্যে বেশ জোরে, ব্যথা দিয়ে খোঁচা মারল পিঠে।

চলতে চলতে পাথরে পিছলে, হোঁচট খেয়ে, কিংবা উঁচু-নিচুতে তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে এগোল দু'জনে। সেসব ক্ষেত্রেও খোঁচার বিরাম নেই। অকারণেই মারছে। কখনও গালাগাল, কখনও তলোয়ারের খোঁচাও সহ্য করতে হচ্ছে।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?' মুসার প্রশ্ন।

'বোধহয় ওদের ক্যাম্পে। জায়গাটা কোথায় গোপন রাখতে চায়, সে-জন্যেই চোখ বেঁধেছে।'

'নিয়ে গেলে ভালই হয়। আউরোকে দেখতে পাব। মুক্ত করতে পারব।'

জবাব দিল না কিশোর। মুসার দুঃসাহস যে কতখানি, ভাল করেই জানে সে। যত সহজে মুক্ত করার কথা বলছে, একদল গলাকাটা ডাকাতের হাত থেকে সেটা যে তত সহজ হবে না, মুসা নিজেও বুঝতে পারছে। তবু আশা ছাড়ছে না।

খুব কষ্ট হচ্ছে এগোতে। শ্যাওলার সুড়ঙ্গে হামাগুড়ি দিয়েই কাহিল হয়ে গেছে। এখন এই দুর্গম পথ। তার ওপর খিদে। পা চলতে চায় না। তবে একটাই স্বস্তি, এই হাঁটাহাঁটির ফলে শরীরটা গরম রয়েছে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও জমে যায়নি এখনও। অবশ্য পিঠে ধারাল তরবারির ফলা ঠেকে থাকলে, আর কখন খচ করে ঢুকে যায় ভাবলে এমনিতেই গরম হয়ে থাকে শরীর।

সোজাসুজি না গিয়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ঘুরপথে নেয়া হলো ওদের, কোন দিকে যাচ্ছে দ্বিধায় ফেলে দেয়ার জন্যে, যাতে পথ চিনতে না পারে।

তবে একটা ব্যাপারে অসাবধান হলো ডাকাতেরা, বাতাস। এ অঞ্চলে আসার পর থেকে লক্ষ করেছে কিশোর, বাতাস বয় পশ্চিম থেকে পুবে। অনেক ঘোরাঘুরির পর অবশেষে যখন সোজা এগোল ওরা, খেয়াল করল বাতাস লাগছে তার পিঠে। তথ্যটা মনে গেঁথে নিল সে। ডাকাতের আস্তানা থেকে বেরোতে পারলে বাতাসের বিপরীতে এগোতে হবে। তাহলে পৌঁছে যাবে হোয়াইট লেকে, সেখান থেকে ব্ল্যাক লেক আর গ্রীন লেক পেরিয়ে ক্যাম্পে ফিরে যেতে পারবে।

কিন্তু যদি মুক্তি পায় ডাকাতদের কবল থেকে, তবে তো; মস্ত একটা 'যদি' রয়ে যাচ্ছে।

প্রায় ঘণ্টা দুই একটানা চলার পর সামনে কথার শব্দ শোনা গেল।

হঠাৎ করে পিঠ থেকে বাতাস এবং তলোয়ার দুটোই সরে গেল। বেশ উষ্ণ এখানে আবহাওয়া। রান্নার সুগন্ধ ভুরভুর করছে।

বন্দিদের চোখ থেকে কাপড় খুলে নেয়া হলো।

বিরাট এক গুহায় এসে ঢুকেছে ওরা। সে-জন্যেই আর বাতাস লাগছে না পিঠে। মশালের আলোয় আলোকিত। আগুনের বড় কুণ্ড গরম করে রেখেছে গুহাটা। ছাত থেকে স্ফটিকের ঝাড়বাতির মত ঝুলে আছে স্ট্যালাকটাইট। ঝালর লাগানো দামী কাপড়ে ঢাকা দেয়াল। মেঝেতে চিতাবাঘের চামড়ার কার্পেট। সাদা আলখেল্লা পরা মানুষেরা বসে আছে তাতে। বাঘের মাথাকে তাকিয়া বানিয়ে ঠেস দিয়েছে। হাতে পুদিনার গন্ধ মেশানো চায়ের পেয়ালা।

'এ কোথায় ঢুকলামরে বাবা!' কিশোর বলল। 'মনে হচ্ছে হাজার বছর পেরিয়ে এসে ঢুকেছি আরব্য রজনীর জগতে!'

'কিংবা কাউন্ট মন্টিক্রিস্টোর প্রাসাদে!' বিড়বিড় করল মুসা।

বারো

'তোমাদের পছন্দ হয়েছে জেনে খুশি হলাম!' ইংরেজিতে কথা বলল কেউ।

সাংঘাতিক ভারি কণ্ঠস্বরটা এল যেন গুহার দেয়াল ভেদ করে। জবাব যখন দিয়েছে, নিশ্চয় তাদের বাংলা বুঝতে পেরেছে। এই বিদেশ-বিভূঁইতে বাংলা বোঝে কেউ, এটা জেনে হাঁ হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।

বিশালদেহী একজন মানুষ। সাত ফুটের কাছাকাছি লম্বা, সেই পরিমাণ চওড়া। অন্যদের মত সাদা পোশাক পরেনি। বরং তার আলখেল্লাতে রামধনুর সাতটা রঙই বিদ্যমান, খুব দামী, চমৎকার সিল্কের কাপড়ে তৈরি, মশালের আলোয় চকচক করছে। সোনা-রূপায় তৈরি, মূল্যবান পাথর বসানো একটা ব্রেস্ট প্লেট পরেছে বুকে। মাথায় পাগড়ির বদলে রয়েছে সিংহের কেশরে বানানো মুকুটের মত একটা জিনিস। কোমরের বেল্টের জন্যে জীবন দিতে হয়েছে একটা তুষার-চিতাকে। একপাশে খাপে ঝোলানো অলঙ্করণ করা একটা বড় পিস্তল, আরেক পাশে তলোয়ার। সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারি করা স্লিপার পায়ে, কিশোরের পায়ের

প্রায় দ্বিগুণ হবে একেকটা পা। বিশাল পায়ের ছাপের কথা মনে পড়ল তার।

দাস ব্যবসায়ীদের সর্দার লোকটা, বুঝতে অসুবিধে হলো না ছেলেদের। একেই উয়াটুসিরা বজ্রমানব বলে জানে।

কিন্তু এক্ষণে বজ্রমানবের মুখে মেঘ বা বজ্রের কোন চিহ্ন নেই, তার জায়গায় রয়েছে উজ্জ্বল রোদ। তামাটে রঙের মুখে ঝকঝক করে উঠল সাদা দাঁত।

মাথা নুইয়ে সালাম জানাল লোকটা। ইংরেজিতে বলল, 'বাংলা বুঝতে পারি, বলতে পারি না। আমার তেলের কোম্পানিতে অনেক বাংলাদেশী আর ভারতীয় আছে, তারা বাংলায় কথা বলে। নোয়াখালীর একজন ফোরম্যানের কাছে অল্প-স্বল্প বাংলা শিখেছি। যাই হোক, আমার বাড়িতে স্বাগত জানাচ্ছি তোমাদের। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। বিশ্রাম দরকার। এসো আমার সঙ্গে।'

লোকটার মোলায়েম ব্যবহারে পিত্তি জ্বলে গেল কিশোরের। অনেকগুলো বাজে কথা মুখে এসে গিয়েছিল, কিন্তু চেপে গেল। এ সব বলার সময় নয় এখন।

পর্দা সরিয়ে আরেকটা ছোট গুহায় ঢুকল বজ্রমানব। এটা আরও জমকালো করে সাজানো। চিতার চামড়ার ওপর রাখা পুরু গদি। নরম বালিশে হেলান দিয়ে তাতে আধশোয়া হলো লোকটা। কিশোর-মুসাকেও গদি দেখিয়ে আরাম করতে বলা হলো।

কঠোর পরিশ্রমের পর গা এলিয়ে দিতে পেরে খুশিই হলো ওরা।

ট্রে হাতে ঢুকল একজন চাকর। ট্রেতে পুদিনার সুগন্ধ দেয়া তিন কাপ গরম চা আর কিছু কেক।

'দেখো আমাদের চা খেতে পারো কিনা,' বজ্রমানব বলল। 'সরি, কফি দিতে পারলাম না, নেই। ইউরোপ-আমেরিকায় ঘোরার সময় কফিই খাই, তবে বাড়ি ফিরলে চা।'

'এটা আপনার বাড়ি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না না,' হেসে উঠল বজ্রমানব। 'এটা সাধারণ শিবির। পারস্য উপসাগরের তীরের একটা দেশে পঞ্চাশ হাজার মানুষের আমি শেখ। টাকার অভাব নেই আমার। কিন্তু শুধু টাকায় মন ভরে না, অ্যাডভেঞ্চারের প্রবল নেশা, তাই বেরিয়ে পড়ি মাঝে মাঝে। প্রাসাদ ছেড়ে চলে আসি গুহায়। লোক রেখে আসি আমার প্রজাদের প্রতি যাতে কোন অবিচার না হয় সেটা দেখার জন্যে, আর আমি এসে এখানে আইন ভাঙি।'

'বেআইনী কাজ যে করেন স্বীকার করছেন?'

'করব না কেন? যেটা তোমরা জেনেই গেছ, সেটা লুকিয়ে লাভ কি? কয়েকবার গেছি তোমাদের ক্যাম্পে। তোমাদের বন্ধু উয়াটুসিদের গ্রাম থেকে বেশ কয়েকজনকে ধরে এনেছি, খুব ভাল চাকরের কাজ করতে পারে ওরা। ওদেরকে এমন লোকের কাছে পাঠাই, যারা ভাল টাকা দেয়।'

'সর্দারের ছেলেকে ধরে এনেছেন। তাকেও পাঠিয়ে দিয়েছেন?'

'না, এখনও এখানেই আছে। দেখতে চাও?'

জবাবের অপেক্ষায় না থেকে হাততালি দিল শেখ।

একজন চাকর ঢুকল।

আরবিতে তাকে হুকুম দিল শেখ।

খানিক পর পর্দা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকল আউরো। বন্ধুদের দেখে আনন্দে চিৎকার করে ছুটে এসে তাদের হাত চেপে ধরল।

'তোমরা এসেছ! জানতাম আমাকে নিতে আসবে!'

'তোমাকে নিতে আসিনি,' শুকনো স্বরে বলল কিশোর। 'আমরাও তোমার মতই বন্দি। তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না।'

দপ করে আলো নিভে গেল ওগারোর মুখ থেকে।

'অ। হাসিমুখে মিঠে মিঠে কথা বলছে আর খাবার দিচ্ছে বলেই এই শেখকে বিশ্বাস কোরো না। ও খুনী।'

হা হা করে হেসে উঠল শেখ।

'ছেলেটাকে আমার ভীষণ পছন্দ। ওর তেজ আছে। এ ভাবে আমার সামনে কথা বলতে সাহস করে না কেউ। সর্দারের ছেলে তো, সর্দারের মতই কথা।'

কালো হয়ে গেল তার মুখ। বুনো রাগ ফুটল চোখের তারায়। দূর হয়ে গেল হাসি হাসি ভাবটা।

'তবে সর্দারের ছেলেরা বেয়াদব হয়, ওকে আদব শিক্ষা দেব আমি! কিছু শিক্ষা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছে। এই ছেলে, ঘোরো, দেখাও তোমার বন্ধুদের।'

নড়ল না আউরো।

আরবিতে তীক্ষ্ণ আদেশ দিল শেখ। দৌড়ে ঘরে ঢুকল একজন চাকর। আউরোকে চেপে ধরে জোর করে তার পিঠ ঘোরাল কিশোর-মুসার দিকে। চামড়ার চাবুক দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে দেয়া হয়েছে পিঠ।

মৃদু হাসল শেখ।

কড়া গলায় বলল মুসা, 'লাগতে হলে সমানে সমানে লাগা উচিত। একটা বাচ্চা ছেলেকে ধরে সবাই পেটাতে পারে, এতে বীরত্ব জাহির হয় না। কথা না শুনলে কি করবেন? পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলবেন?'

'না না, মারব কেন? টাকা আসে এমন কোন কিছুকেই মেরে ফেলি না আমি। ভাল গোলাম হবে ও। তবে তার আগে ওর তেজটা নষ্ট করতে হবে। ঘোড়াকে যেমন করে বশ মানানো হয়।'

'এই নিষ্ঠুরতার কি কোন প্রয়োজন আছে?' কিশোরের প্রশ্ন।

'নিষ্ঠুর? কি বলছ তুমি? আমরা অনেক ভদ্র। কি দিয়ে মেরেছি, দেখাচ্ছি, দাঁড়াও।'

দেয়ালে ঝোলানো খুব সাধারণ দেখতে একফালি চামড়া নামাল শেখ।

'দেখো হাত দিয়ে,' বলল সে। 'একেবারে নরম। আমাদের ভাষায় একে যা বলে তার বাংলা করলে দাঁড়াবে কোমল শিক্ষা।'

'মনে করেছেন চিনি না,' কিশোর বলল। 'অত্যাচার করার জন্যে যত খারাপ জিনিস বানিয়েছে মানুষ, তার মধ্যে এটা একটা। দক্ষিণ আফ্রিকায় একে বলে স্যামবক। গণ্ডারের চামড়া কেটে বানিয়ে সিংহের চর্বি ডলে নরম করা হয়। নরম করাই হয় যাতে মারলে বেশি ব্যথা লাগে। চামড়ায় ছুরির মত কেটে বসে যায়। আপনার মত নিষ্ঠুর মানুষেরা যারা একটা ছেলেকে পেটাতে দ্বিধা করে না,

তারাই কেবল একে কোমল বলতে পারে। নিজের পিঠে পড়লে আর এই নাম রাখত না।'

জ্বলে উঠল বজ্রমানবের চোখের তারা, তবে মুখে হাসি লেগে রইল।

'মনে হচ্ছে তোমাদের এই বন্ধুটির মত একই শিক্ষা দরকার তোমাদেরও। তবে সেটা না করতে হলেই খুশি হব আমি। বেয়াদবি আমি সইতে পারি না। যারা করে, তাদেরকে আদব শিখিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।' চাকরের দিকে চাবুকটা ছুঁড়ে দিল শেখ। সেটা লুফে নিয়ে আউরোকে সহ পর্দার ওপাশে চলে গেল চাকর।

ছেলেদের দিকে তাকাল শেখ। 'আশা করি ওর পিঠে আরও বিশ ঘা চাবুক লাগবে। সেটা ওকে তো বটেই, তোমাদেরও ভদ্র হতে শেখাবে। পর্দার ঠিক ওপাশেই কাজটা করা হবে, যাতে চিৎকারটা তোমরাও শুনতে পাও।'

চাবুকের প্রথম বাড়িটা পড়তেই বাঘের মত লাফিয়ে উঠল মুসা।

টেনে তাকে বসিয়ে দিল কিশোর।

'কিছু করলে আউরোর ক্ষতিই করবে শুধু। বসে থাকো। আমাদের সুযোগ আসবে।'

বিশটা বাড়ি শেষ হলো। টুঁ শব্দ শোনা গেল না আউরোর। নিরাশ হলো শেখ, তার চেহারাই সেটা বলে দিচ্ছে। প্রতিটি বাড়ি পড়েছে আর দাঁতে দাঁত চেপেছে কিশোর-মুসা, যেন তাদের নিজের পিঠে পড়েছে।

শেষ হয়ে গেলে শেখ বলল, 'ওরটা আপাতত শেষ। এবার তোমাদের ব্যবস্থা। হয়তো ভাবছ ধরে নিয়ে আসা হলো কেন?'

'আমাদেরও গোলাম বানানোর ইচ্ছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না। তোমাদের কিনতে রাজি হবে না কেউ। তোমাদের দিয়ে কাজ তো হবেই না, অকারণে ঝামেলা বাড়াবে। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে থেকে থেকে ওদেরই মত হয়ে গেছ তোমরাও। বশ মানানো কঠিন। সব সময় খালি পালানোর চিন্তায় থাকবে। যেহেতু তোমরা আমেরিকার নাগরিক, তোমাদের সরকারও গোলমাল করতে পারে। না, কোটিপতির প্রাসাদের আরামের জীবন তোমাদের জন্যে নয়। ভাগ্য এত ভাল নয় তোমাদের।'

'তাহলে আটকে রেখেছেন কেন?'

'কারণ আছে। জানোয়ার ধরার ওস্তাদ তোমরা। আজ একটা সাদা হাতির কাছে তোমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে আমার লোকেরা। এত দামী জানোয়ার সারা দুনিয়ায় আর নেই। তোমরা ওটাকে ধরার চেষ্টা করবেই। তাই তোমাদের ঠেকিয়েছি।'

'কেন?'

'কেন, সেটা না বোঝার মত বোকা নও তোমরা। তোমাদের মত আমিও জানি ওটাকে কোথায় বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যাবে। একটা হাতির দামে দশটা ক্যাডিলাক গাড়ি কিনতে পারব। হাতিটা ধরে বিক্রি না করা পর্যন্ত তোমাদের আটকে রাখতেই হচ্ছে।'

'ততক্ষণ কি আমার লোকেরা বসে বসে আঙুল চুষবে মনে করেছেন? ওরা

আমাদের খুঁজবে। খুঁজে বের করবে এই গুহা। দলে ওরা অনেক, সেই তুলনায় আপনারা অনেক কম। শুধু শুধু প্রাণ খোয়াবেন। প্রাণের চেয়ে কি বড় হয়ে গেল একটা হাতি?'

কুটিল হাসি হাসল বজ্রমানব।

'সাধারণ হাতি হলে অন্য কথা ভাবতাম। কিন্তু শ্বেতহস্তী সাধারণ নয়। জানো, অনেক দেশে দেবতা মানা হয় একে? পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছি আমি, বার্মায় গেছি, সিয়ামে গেছি–থাইল্যান্ডকে অনেকে বলে সিয়াম, আমারও এই নামটাই ভাল লাগে। শ্বেতহস্তীকে নিয়ে যে কি করে ওরা, না দেখলে বুঝবে না।'

'পাগল-ছাগল সব দেশেই আছে,' মুখ গোমড়া করে বলল মুসা।

'তা বলতে পারো। মস্ত এক ধনীর বাড়িতে একবার একটা সাদা হাতি দেখেছিলাম। মার্বেল পাথরে বাঁধানো শানদার বিশাল এক চত্বরে ওটাকে রাখা হত। সোনা-রূপার কারুকাজ করা অনেক দামী সিল্কের কাপড়ে সারাক্ষণ ঢেকে রাখা হত ওটার পিঠ। কাপড়ের ঝুলগুলোর কি বাহার, একেবারে গোড়ালির ওপর নামানো। সোনার মালা বানিয়ে পরিয়ে রাখা হত দাঁতে। মাথার ওপর ধরে রাখা হত রাজকীয় ছাতা, যাতে রোদে কষ্ট না পায় হাতি।

'হাতির সেবা করার জন্যে অস্থির হয়ে থাকত অনেক বড় বড় নামী-দামী মানুষেরা। কেউ উটপাখির পালকের পাখা দিয়ে বাতাস করত, কেউ গা থেকে মাছি তাড়াত, কেউ বা সোনার পাত্র থেকে তুলে নিয়ে দুর্লভ ফল খাওয়াত ওটাকে।

'নদীতে নিয়ে যাওয়া হত গোসল করানোর জন্যে। তখন সোনার সুতোয় কাজ করা কাপড়ে ঢেকে দেয়া হত ওটার শরীর। আটজন লোক ওই সময় সদাব্যস্ত থাকত ওটার সেবায়, কোন ভাবে যেন কোন কষ্ট না হয়। বাজনা বাজাতে বাজাতে আগে আগে যেত ব্যান্ড পার্টি। নদী থেকে গোসল সেরে এসে চত্বরে উঠলে রূপার গামলায় করে গরম পানি এনে পা ধুয়ে দেয়া হত হাতির, তারপর সুগন্ধী মাখিয়ে দেয়া হত।'

'গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত ব্যাটাদের,' গজগজ করতে লাগল মুসা। 'নির্বোধের দল! একটা হাতিকে নিয়ে এই কাণ্ড!'

হাসল শেখ। 'ওটা হাতি নয় ওদের কাছে, দেবতা। দেবতার পূজা তো করবেই। ওই হাতি মারা গেলে তাকে রাজার সম্মান দেয়া হয়েছে। বিশাল মঞ্চে সাতদিন শুইয়ে রাখা হয়েছে লাশ। তারপর চন্দন কাঠের মত দামী কাঠ দিয়ে পোড়ানো হয়েছে। পোড়া ছাইগুলোও সাংঘাতিক পবিত্র, নেয়ার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু দিনরাত কড়া নজর রেখেছে প্রহরীরা, যাতে কেউ নিতে না পারে। সেই ছাই কুড়িয়ে নিয়ে দামী বাক্সে ভরে কবর দেয়া হয়েছে এমন জায়গায়, যে গোরস্থানে রাজারাজড়াদেরই কেবল ঠাঁই মেলে।

'শ্বেতহস্তীর ব্যাপারে নানা মজার মজার কিচ্ছা-কাহিনীও চালু আছে। এক সময় নাকি গোটা পৃথিবীটা ছিল বিশাল এক সাদা হাতির পিঠে। হাতিটা কোন কারণে নড়লেই পৃথিবীও কাঁপত, ফলে ভূমিকম্প হত। একবার রানী

ভিক্টোরিয়াকে কি উপহার দিয়েছিলেন সিয়ামের এক রাজা, জানো? একটা সোনার বাক্স, তার তালা খোলার চাবিটাও সোনার। সবাই ভেবেছিল এত দামী বাক্সে করে নিশ্চয় দামী দামী পাথর কিংবা অলঙ্কার পাঠানো হয়েছে। কিন্তু বাক্স খুলে দেখা গেল তাতে রয়েছে রাজার সাদা হাতির কয়েকটা রোম। রাজার কাছে মনে হয়েছিল, ইংল্যান্ডের রানীকে পাঠানোর জন্যে এর চেয়ে দামী জিনিস আর তাঁর সাম্রাজ্যে নেই। আর সিয়ামের রাজদূত রানীর প্রশংসা করার সময় বলেছেন, রানীর চোখ, ভাবভঙ্গি, এবং আরও অনেক কিছুই একেবারে সাদা হাতির মত। এরপরও বলতে চাও এই হাতি সাধারণ হাতি?'

'না,' মাথা নাড়ল মুসা, 'দামের দিক থেকে অসাধারণ। মানুষই এর দামটা বাড়িয়েছে। প্রাণী হিসেবে আর দশটা সাধারণ হাতির মতই হাতি এটাও।'

মাথা ঝাঁকাল শেখ। 'বুদ্ধিমান ছেলে। আমার কাছেও দামটাই বড়। যাই হোক, ওই হাতি যতদিন ধরা না পড়ে তোমরা আমার মেহমান। উল্টোপাল্টা কিছু কোরো না, আমিও তোমাদের কিছু করব না। কিন্তু আমার কাজে নাক গলাতে এলে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে না, এটা মনে রেখো।'

তেরো

হাততালি দিল শেখ।

চোখের পলকে উদয় হলো চাকর।

ছেলেদেরকে শেখের গুহা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হলো পেছনের বড় গুহায়। পুরোপুরি অন্ধকার এখন ওটা। খালি।

গুহার চারপাশে অনেক পর্দা ঝোলানো। ওগুলোর অন্যপাশের ছোট গুহা থেকে আসছে নাক ডাকানোর শব্দ। কোন কোনটাতে কথা বলছে একাধিক লোক, তাসটাস খেলছে হয়তো, ঘুমায়নি এখনও।

বড় গুহার পেছনের ছোট একটা গুহায় কিশোর-মুসাকে নিয়ে আসা হলো। পুদিনা মেশানো চায়ের কড়া গন্ধ এখানে। অগ্নিকুণ্ডের ওপর বিরাট পাত্রে চা তৈরি হচ্ছে, বাষ্প উঠছে ওটা থেকে, পুদিনার গন্ধ ছড়াচ্ছে। একটি মাত্র মশাল জ্বলছে গুহাটায়, অন্ধকার কাটছে না। এখানে আরামের ব্যবস্থা নেই, চিতার চামড়ার কার্পেট নেই, গদি নেই। নগ্ন দেয়ালের গা থেকে বেরিয়ে আছে খোঁচা খোঁচা পাথর। ঠাণ্ডা পাথুরে মেঝে। এককোণে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে একটা ছেলে, খালি গা। মানুষের সাড়া পেয়ে নড়ে উঠল। উঠে দাঁড়ালে চেনা গেল, সর্দার ওগারোর ছেলে।

'আউরো!' এগিয়ে গেল মুসা। 'এই জঘন্য জায়গায় এনে তোমাকে রেখেছে ওরা! উয়াটুসির রাজকুমারের জন্যে যোগ্য জায়গাই বটে!'

দুর্বল হাসি হাসল আউরো। 'এটা গোলামদের ঘর। পাচার করার আগে এখানেই বন্দি করে রাখা হয়। কাল পর্যন্ত অনেকেই ছিল। ওদেরকে নিয়ে

যাওয়া হয়েছে জাহাজে তুলে দেয়ার জন্যে। লোহিত সাগরের কোন বন্দরে নিয়ে যাওয়া হবে। ওরা বলেছে, আমাকেও নিয়ে যাবে আগামীকাল, পারস্য উপসাগরের তীরে।'

ঘরটা দেখতে দেখতে বলল মুসা, 'মাটির নিচের কয়লা রাখার ঘরও এরচেয়ে ভাল। আর কিছু না থাক, ওসব ঘরের একটা খুদে জানালা হলেও থাকে, এটার তা-ও নেই।' আগুনে চাপানো পাত্রটার দিকে তাকাল। 'যাই হোক, এই ঠাণ্ডায় চা যে খেতে দিচ্ছে এটাই বেশি।'

'চা কি আর আমাকে দেয়? ওটা প্রহরীদের জন্যে। যাতে জেগে থাকতে পারে।'

'তোমাকে কি খেতে দেয় ওরা?'

'কিছু না। একেবারেই কিছু না। ওরা বলে, হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে যখন চাইব, তখনই কেবল দেবে। ওরা বলে, সর্দারের ছেলে আমি—এই ভাবনাটা মাথা থেকে বিদেয় না হলে ভাল গোলাম হতে পারব না। বলেছে, না ভোলা পর্যন্ত খেতে দেবে না। না দিক। না খেতে খেতে মরে যাব, তবু মাথা থেকে বিদেয় করব না।'

মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা গর্বিত কিশোরটির দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে কিশোর। পিঠের জখমগুলোতে নিশ্চয় অকল্পনীয় যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু মুখের ভাবে সেটা একবিন্দু প্রকাশ পাচ্ছে না ছেলেটার। এই ছেলে ভাঙবে তবু মচকাবে না। সুযোগ পেলে অনেক বড় নেতা হতে পারবে।

কিন্তু আগামীকাল ওকে দেশ থেকে সরিয়ে নেয়া হলে সেই সুযোগ আর কোনদিনই পাবে না আউরো। গোলামির ঘানি টেনেই কাটবে সারাজীবন। তাকে বাঁচাতে হলে কিছু একটা করা দরকার, এবং সেটা আজ রাতেই।

গুহাটা খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল কিশোর। দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি, ছাত, মেঝে, কোন জায়গা বাদ দিল না।

কিন্তু কোন রকম ফাঁকফোকর দেখল না। খোলা জায়গা একটাই আছে, যেখান দিয়ে ঢুকেছে ওরা। সেটার পাহারায় রয়েছে ছয়জন প্রহরী। তিনজন বসেছে দরজার বাইরে, তিনজন ভেতরে। আলখেল্লার ঝুল পেতে বসেছে, যাতে ঠাণ্ডা এড়াতে পারে। চা খেতে খেতে নিচু স্বরে আলাপ করছে। বিশালদেহী মানুষ একেকজন। সঙ্গে পিস্তল আর তলোয়ার রয়েছে।

ওরকম অস্ত্র থাকলে একজন লোকই নিরস্ত্র তিন বন্দিকে সামলানোর জন্যে যথেষ্ট। ছয়-ছয়জন সশস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই।

ছয়জনের কাছে যদি অস্ত্র না-ও থাকত, তাহলেও হাতাহাতি লড়াইয়ে কাবু করতে পারত কিনা সন্দেহ। তার ওপর ওদের চিৎকারে আরও লোক ছুটে আসত।

অলৌকিক কোন উপায়ে যদি কাবু করতে পারে এই ছয়জনকে, তাহলেও ঝামেলা শেষ হবে না। বড় গুহাটা পেরোতে হবে, যার চারপাশে ছড়িয়ে আছে ডাকাতদের ঘর। সবাই ঘুমায়নি। হঠাৎ উঁকি দিয়ে বসতে পারে একআধজন। চোখে পড়ে গেলেই চিৎকার শুরু করবে, আবার ধরে আনা হবে ওদেরকে।

পালানোর কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না কিশোর। আপাতত হাল ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়াই উচিত মনে করল। ঘুমিয়ে আগে ক্লান্তি দূর করা দরকার। কিন্তু যা শীতল মেঝে, ঘুম হবে বলে মনে হয় না।

বুশ জ্যাকেটের পকেটে শক্ত একটা কিছু ক্রমাগত চাপ দিচ্ছে কোমরের নিচে, অস্বস্তিকর। সামান্য একটু নড়েচড়ে শুলো, যাতে চাপটা না লাগে।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বসল সে। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। পকেটের জিনিসটা কাজে লাগানো যেতে পারে!

পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছুঁয়ে দেখল জিনিসটা। আধ ইঞ্চি ব্যাসের তিন ইঞ্চি লম্বা একটা বিশেষ কার্তুজ।

বড় জানোয়ার ধরার সময় হরদম ব্যবহার করা হয় এগুলো। ভেতরে সেরনিল নামে এক ধরনের তরল ঘুমের ওষুধ ভরা থাকে। মাথায় ইঞ্জেকশনের সুচের মত সুচ লাগিয়ে তীর ছোঁড়ার যন্ত্রে পরিয়ে ছুঁড়ে মারা হয় জানোয়ারকে লক্ষ্য করে।

গায়ে ফোটার পনেরো মিনিটের মধ্যে নিথর হয়ে ঘুমিয়ে যায় জানোয়ার। তারপর চার ঘণ্টার জন্যে আর খবর নেই। ট্রাকে তুলে বয়ে নিয়ে গিয়ে খাঁচায় ভরার জন্যে যথেষ্ট সময়।

যে কার্তুজটা আছে তার পকেটে, এটা একটা বড় গণ্ডার, মোষ কিংবা হাতিকে কাবু করে ফেলতে পারে। ছয় থেকে বারোজন মানুষকে গভীর ঘুমে অচেতন করে দিতে পারে।

কিন্তু লোকগুলোর শরীরে ঢোকাবে কি করে এই ওষুধ? তার কাছে ছোঁড়ার যন্ত্র নেই। থাকলেও অবশ্য লাভ হত না। ওদের দিকে যন্ত্র তাক করতে দেখলেই গুলি করত।

চোখ পড়ল চায়ের পাত্রটার ওপর। আগুনে কি ওষুধের গুণ নষ্ট করবে? জানা নেই। পেয়ালার পর পেয়ালা চা খাচ্ছে লোকগুলো। এত চা খায় কি করে আল্লাহই জানে! কয়েক মিনিট পর পরই পেয়ালা ভরছে। পাত্রটাতে যদি কোনমতে গিয়ে ওষুধটা ঢেলে দিয়ে আসতে পারে···

মোড়ামুড়ি শুরু করল। আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে আগুনের কাছে। যেন শীত লাগছে, উত্তাপ চায়, এমন ভঙ্গি।

সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ফিরে তাকাল লোকগুলো।

হাত তুলে জ্বলন্ত কয়লা দেখাল সে। বোঝাল, উষ্ণতা দরকার।

সন্দেহ করল না লোকগুলো। এত ঠাণ্ডার মধ্যে আগুনের আরাম সবাই চায়। আর নজর দিল না তার দিকে।

গড়াতে গড়াতে এমন একটা জায়গায় চলে এল সে, লোকগুলো রইল তার একপাশে, আরেক পাশে আগুন। লোকগুলো আলাপে মগ্ন হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় রইল সে। সাবধানে পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওদের অলক্ষ্যে বের করল কার্তুজটা। শরীরের আড়ালে রেখে প্লাগ খুলে চায়ের পাত্রে ঢেলে দিল ভেতরের ওষুধ। খালি কার্তুজটা পকেটে ভরে রাখল। ওষুধ কাজ করলেই হয় এখন।

ঘুমের মধ্যেই যেন সরছে, এমন করে চলে এল আবার মুসা আর আউরোর

কাছে।
কিশোর কি করে এসেছে, বুঝে ফেলেছে মুসা।
আউরো আন্দাজ করেছে কিছু একটা করা হয়েছে, কিন্তু কি, বুঝতে পারেনি। চুপ করে রইল। নড়লও না কেউ। প্রহরীদের সন্দেহ জাগে এমন কিছু করল না।
উঠে গিয়ে আবার পাত্র থেকে চা ভরে এনে খেতে লাগল লোকগুলো।
উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে কিশোর। কাজ হবে তো? এটাই ওদের শেষ ভরসা। গরমে ওষুধ নষ্ট হয়ে গেলে আর কিছুই করার নেই।
আচ্ছা, ওষুধের গন্ধ পেয়ে যাবে না তো? আশা করল, পাবে না, পুদিনার তীব্র গন্ধ ঢেকে দেবে ওষুধের গন্ধ।
চা খাচ্ছে লোকগুলো।
কিশোরের মনে হচ্ছে, যুগ যুগ ধরে খেয়েই চলেছে ওরা। তবু কিছু ঘটছে না। অনন্তকাল পেরিয়ে যাচ্ছে যেন।
কিন্তু আসলে পেরোল পনেরো মিনিট। কথা কেমন জড়িয়ে এল ওদের। তারপর থেমে গেল। ঢুলতে শুরু করল প্রহরীরা।
আনন্দে দুলে উঠল কিশোরের মন। হচ্ছে, কাজ হচ্ছে!
একজন আরেকজনকে জেগে থাকার জন্যে হুঁশিয়ার করতে লাগল ওরা। কিন্তু গিলেছে তো সবাই। কে জেগে থাকবে? ওষুধ কাবু করে ফেলল ওদেরকে। কয়েক মিনিটেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেল।
পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগোল তখন তিনজনে।
নড়ছে না প্রহরীরা।
সাবধানে ওদেরকে ডিঙিয়ে এল কিশোর। পর্দা সরাল কয়েক ইঞ্চি। উঁকি দিয়ে দেখল বড় গুহাটায় কেউ আছে কিনা।
প্রায় অন্ধকার গুহা। অল্প কয়েকটা মশাল জ্বলছে এখনও। এই সামান্য আলোয় এতবড় গুহার কিছুই আলোকিত করতে পারেনি।
প্রথমে কিছু চোখে পড়ল না তার। আরও ভাল করে তাকাতে দেখতে পেল কয়েকজন লোক ঘুমিয়ে আছে। চিতার মাথাকে বালিশ বানিয়েছে।
ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'কঠিন ঠাঁই। কেউ জেগে উঠলেই এখন মরেছি।'
'অন্ধকার তো,' মুসা বলল। 'দেখতে পাবে?'
'স্পষ্ট না দেখলেও আমাদের পোশাকই বুঝিয়ে দেবে ওদের দলের লোক নই। হলে আলখেল্লা থাকত।'
ঘুমন্ত প্রহরীদের দিকে তাকাল মুসা। 'তাহলে আলখেল্লাই পরে নেব।'
লোকগুলোর ভারি শরীর থেকে আলখেল্লা খোলাটা অত সহজ হলো না, তবে খোলা গেল শেষ পর্যন্ত। দ্রুত সেগুলো পরে নিল ওরা। চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ফলে কেউ এখন বুঝতে পারবে না ওরা কারা।
নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে বড় গুহাটা ধরে এগোল তিনজনে। বুক কাঁপছে। দৌড় দিতে ইচ্ছে করছে। ধরা পড়ার ভয়ে দিল না।

প্রথম লোকটার পাশ কাটাল নিরাপদে।

মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে আরেক দিকে। তবে প্রয়োজন ছিল না—পরনে আলখেল্লা, মুখ তো দেখাই যায় না।

দ্বিতীয় লোকটার কাছে আসতেই মাথা তুলল সে। তিনটে সাদা আলখেল্লা পরা মূর্তি নজরে পড়ল। আবার মাথা নামিয়ে চোখ মুদল সে।

ধীরেসুস্থে তৃতীয় এবং চতুর্থ লোকটার পাশ কাটাল ওরা।

গুহার বাইরে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অলস ভঙ্গিতে তাকাতে লাগল এদিক ওদিক। যেন ভেতরে দম বন্ধ হয়ে আসছিল বলে বাইরের খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিতে এসেছে।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করল কেউ পাহারায় আছে কিনা।

কাউকে চোখে পড়ল না।

একদিকে হাঁটা দিল তখন। তারপরেও যখন কেউ ডাকল না, হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরে। আলখেল্লার ঝুল তুলে দিল দৌড়।

আগে আগে ছুটছে কিশোর। বাতাস গায়ে লাগতে মোড় ঘুরল। মনে আছে, বাতাসের বিপরীতে যেতে হবে। দিনের মত এত জোরাল না বাতাস, তবু বোঝা যায়।

দুর্গম পথ। চাঁদ আছে আকাশে। কিন্তু থাকলেই কি, কুয়াশার জন্যে ঠিকমত চোখে পড়ে না। এর ওপর নির্ভর করে চলা মুশকিল।

তবু থামল না ওরা। ছুটছে। কাঁটায় লেগে হাত-পায়ের চামড়া ছড়ে গেল, চোখা পাথরে পা কাটল, কিন্তু ছোটার বিরাম নেই।

চোখে পড়ল হোয়াইট লেক। সামনে, মৃদু চিকচিক করছে ঘোলাটে চাঁদের আলোয়।

'ওই যে হাতিটা!' বলে উঠল মুসা।

আশ্চর্য! দিনের বেলা যেখানে দেখেছিল, ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে ওটা।

'কিন্তু আমি তো দেখছি দুটো,' কিশোর বলল। যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ করে ফেলেছে দৃষ্টি। 'মনে হচ্ছে আরেকটা কালো হাতিও আছে। নাকি সাদাটারই ছায়া?'

গুড়ি মেরে মেরে কাছে এগোতে লাগল ওরা।

মুহূর্তের জন্যে সরে গেল কুয়াশা। পরিষ্কার হলো ধোঁয়াটে চাঁদের আলো। না, আসলেই আছে আরেকটা হাতি। মদ্দা। স্পষ্ট দেখা গেল এখন। ওর কালো চামড়া এই আলোতেও বোঝা যাচ্ছে। নিচে নামবে কি করে ভাবল কিশোর। পথ একটাই, শ্যাওলার ভেতরের সুড়ঙ্গ। খুঁজে বের করা কঠিন হলো।

'আবার ওটায় ঢুকব?' ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না মুসার। 'এই মাঝরাতে!'

'ওটার মধ্যে দিনই কি আর রাতই কি? একই রকম অন্ধকার।'

'কিন্তু রাতের বেলা যদি চিতাবাঘ ঢুকে বসে থাকে?'

'থাকলে কিছু করার নেই। আর কোন উপায় নেই আমাদের। অসুবিধে একটাই হবে, হাতে-পায়ে পেঁচাবে এই আলখেল্লা।'

'খুলে ফেলব?'

খুলে রেখে যেতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু ভীষণ ঠাণ্ডা। শেষে নিচের ঝুল তুলে কোণগুলো শক্ত করে কোমরে পেঁচিয়ে বাঁধল ওরা। ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গে।

ভেতরে ছোট ছোট হাজারো শব্দের কোলাহল। অদ্ভুত সব শব্দ। কারা করছে, মোটামুটি জানা আছে ওদের। কিন্তু ছোট ছোট প্রাণীগুলোকে পরোয়া করল না। করার দরকারও নেই। কারণ ওগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আর হিংস্রতম যেটা, সেটা সিভেট ক্যাট। একধরনের বনবিড়াল। ওদের সাড়া পেয়ে ভয়ে ছুটে পালাল।

ঢোকার সময় যে অসুবিধে হয়েছিল মুসার, এখন পথ জানা থাকায় সেটা আর হলো না। বাইরে বেরিয়ে এল নিরাপদে।

নামতে নামতে ব্ল্যাক লেক আর গ্রীন লেকের পাশ কাটাল, তারপর বাঁশে ছাওয়া গরিলা-বনের ভেতর দিয়ে এসে পৌঁছল ক্যাম্পে।

এতটাই ক্লান্ত, কথা বলার শক্তিও আর নেই। সোজা বিছানায় পড়তে ইচ্ছে করছে, পড়েই ঘুম।

'কিন্তু এখুনি একটা কাজ না সারলে হবে না,' কিশোর বলল। 'ডাকাতদের আস্তানা কোথায় জেনে গেছি। পুলিশকে খবর দিতে হবে।'

আউরোর বাবাকে জাগানো হলো।

রাতদুপুরে ছেলেকে দেখে প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাইল না। শেষে নেচে উঠল আনন্দে। তক্ষুণি একজন লোক পাঠাল পর্বতের পাদদেশে মুটুয়াঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে।

এত রাতে ঘুম থেকে ডেকে তোলায় মহা বিরক্ত হলো পুলিশেরা। সকালের আগে বেরোতে পারবে না, সাফ বলে দিল।

কি আর করা? অপেক্ষা করতেই হলো।

তবে কথামত সকালবেলা ওগারোর গাঁয়ে এল ওরা। পথ দেখিয়ে ডাকাতদের গুহায় তাদের নিয়ে চলল কিশোর। সঙ্গে নিয়েছে তার দলবল।

গুহার কাছে পৌঁছল দুপুরের সামান্য আগে। কিন্তু গুহায় ঢুকে দেখা গেল খালি গুহা। কোন মানুষ নেই।

বন্দিরা পালিয়েছে জেনেই সাবধান হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয় ডাকাতেরা। পালিয়েছে। জিনিসপত্র সব নিয়ে গেছে। বাতাসে ভাসছে কেবল পুদিনার গন্ধ।

'ভীষণ শয়তান ব্যাটারা!' নাকমুখ কুঁচকে বলল কিশোর।

সাংঘাতিক দুর্গম পথ পার হয়ে আসতে পুলিশেরও কষ্ট হয়েছে। শীতে কাবু হয়ে গেছে ওরা। হাত-প'য়ের নানা জায়গায় জখম। রাগটা পড়ল কিশোরদের ওপর। কিন্তু যেহেতু ডাকাতরা গুহায় থাকার প্রমাণ আছে, দোষ দিয়ে কিছু বলতে পারল না। কেবল কালো মুখগুলোকে আরও কালো করে রাখল।

চোদ্দ

এরপর কি করবে ডাকাতেরা বুঝতে পারছে কিশোর। সাদা হাতিটা দেখেছে। এই এলাকা ছাড়ার আগে ওটা ধরার চেষ্টা করবে বজ্রমানব।

'সময় কম,' বলল সে। 'ইতিমধ্যেই ধরে ফেলেছে কিনা কে জানে! তবে বোধহয় পারেনি। কারণ সকালটা গেছে জিনিস গোছগাছ করতে। সুযোগ একটা পেলেও পেতে পারি।'

হোয়াইট লেকের দিকে ফিরে চলল ওরা।

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছে মুসা।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'ভাবছ মনে হয় কিছু?'

মুখ তুলে তাকাল মুসা। 'হ্যাঁ, ভাবছি। একটা চালাকি করলে কেমন হয়?'

'কি চালাকি?'

বুদ্ধিটা খুলে বলল মুসা।

হাসল কিশোর। 'এতে কাজ হলেও হতে পারে। এখান থেকে ক্যাম্পে যাওয়ার নিশ্চয় অন্য কোন পথ আছে, শর্ট কাট। নইলে গাঁ থেকে হাতি ধরে আনতে পারত না ডাকাতেরা। একজন পুলিশকে সাথে নিয়ে যাও তুমি, রাস্তাটা খুঁজে বের করো। আমি অন্যদের নিয়ে ঘুরপথে যাই।'

'বেশ। এক ঘণ্টার মধ্যে খুদে দানবকে নিয়ে হোয়াইট লেকে পৌঁছে যাব।'

শর্ট কাট রাস্তাটা খুঁজে বের করতে সময় লাগল না। সেটা ধরে একজন পুলিশের সঙ্গে ক্যাম্পে এসে পৌঁছল মুসা।

সাপ্লাই ট্রাক খুঁজে একটা স্প্রে গান বের করল। সাদা রঙ ভরল সেটাতে। অবাক হয়ে তার কাজ দেখছে গ্রামবাসীরা। কিন্তু ওদের কৌতূহল মেটানোর জন্যে কোন কথা বলল না সে।

ডাক দিল খুদে দানবকে।

আনন্দে শুঁড় তুলে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে এল হাতির বাচ্চা।

'তোর জন্যে একটা কাজ ঠিক করেছি, খুদে। আয় আমার সঙ্গে।'

পুলিশ সঙ্গীকে নিয়ে আবার হোয়াইট লেকে ছুটল মুসা। বাচ্চাটা চলল পেছন পেছন।

পাহাড় বেয়ে ওঠা সহজ কাজ নয়, তার ওপর তাড়াহুড়ো করতে হচ্ছে, হাঁপিয়ে পড়ল দু-জনে। খুদে দানবের অবশ্য অতটা অসুবিধে হলো না। পাহাড়ে চড়ার অভ্যেস আছে তার।

হ্রদের তীরে পৌঁছে দেখল ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে কিশোররা। অধৈর্য হয়ে উঠেছে পুলিশ। বার বার চলে যেতে চাইছে। ওদেরকে বোঝাতে বোঝাতে অস্থির হয়ে গেছে কিশোর।

হাতে স্প্রে গান আর সঙ্গে একটা বাচ্চা হাতিকে নিয়ে মুসাকে দেখে ভুরু

কুঁচকে গেল ওদের। হাজারটা প্রশ্ন করতে লাগল।

তাদের প্রশ্নের জবাব দিল না মুসা। কুয়াশার মধ্যে সাদা হাতিটাকে খুঁজছে তার চোখ।

'দেরি করে ফেললাম নাকি?' আনমনে বিড়বিড় করল সে। 'ডাকাতেরা ধরে নিয়ে গেল না তো?'

'এখনও নেয়নি,' কিশোর বলল। 'তবে খারাপ খবর আছে। একজন লোক পাঠিয়েছিলাম খবর নিতে। গোপনে দেখে এসেছে ডাকাতেরা অনেক লোক, যা আন্দাজ করেছিলাম তারচেয়ে অনেক বেশি। আমাদের ডবল। এদিকেই আসছে। সবার কাছে পিস্তল আছে। সেই তুলনায় আমাদের কাছে তেমন কোন অস্ত্র নেই। পুলিশের আছে বল্লম, কুলিদের কাছে ছুরি।'

আগ্নেয়াস্ত্র না থাকারই কথা, শিকার করতে আসেনি ওরা। যদি কোন কারণে বিপদে পড়ে যায়, সে-জন্যে সতর্কতা হিসেবে একটা রাইফেল এনেছে, মুংগার হাতে আছে সেটা।

'একসাথে দল বেঁধে এসে যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের ওপর,' কিশোর বলছে, 'ওদের সঙ্গে পারব না আমরা। তবে তোমার রঙের বুদ্ধিটা কাজে লাগলে বোকা বনতেও পারে, তাতে ছড়িয়ে পড়বে ওরা। এক এক করে কাবু করব তখন।'

'তা তো হলো। কিন্তু আমাদের শ্বেতহস্তী কোথায়?'

'ওদিকে। ওই পাথরগুলোর কাছে।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কুয়াশার মধ্যে খুঁজতে লাগল মুসা। প্রথমে সাদা-কালো কিছু পাথর চোখে পড়ল। তারপর নড়ে উঠল সাদা একটা পাথর। তার পর পরই জায়গা বদল করল কালো একটা পাথর, শুঁড় তুলে চিৎকার করে উঠল।

পা টিপে টিপে কালো হাতিটার কাছে চলে এল কিশোর আর মুসা।

ওদের দেখেই সরে যেতে লাগল হাতিটা।

দৌড়ে ওটার কাছে চলে এল দু-জনে। স্প্রে গান তুলে সাদা রঙ ছিটাতে শুরু করল ওটার শরীরে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো হাতিটা পরিণত হলো সাদা হাতিতে। পুরো শরীর রঙ করার দরকার পড়েনি। কুয়াশার মধ্যে বোঝারই উপায় রইল না ওটা কালো হাতি।

মানুষের অদ্ভুত আচরণে ভড়কে গেছে হাতিটা। চিৎকার করছে সমানে।

'করুক,' কিশোর বলল। 'যত চেঁচাবে, তত তাড়াতাড়ি এটাকে খুঁজে পাবে ডাকাতেরা।'

শোনা গেল ডাকাতদের হই-চই। ছুটে আসছে ওরা।

দ্রুত নির্দেশ দিল কিশোর। দশ-পনেরোজন কুলিকে পাঠাল রঙ করা হাতিটার পেছনে। বাকিরা সাদা হাতিটার কাছাকাছি হ্রদের তীরে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল কিশোর–হে কুয়াশা, আরও, আরও বেশি করে পড়ো! ঘন হয়ে পড়ো! যাতে ডাকাতেরা হাতিটাকে চিনতে না পারে!

যেন তার প্রার্থনা সত্যি শুনতে পেল চাঁদের পাহাড়। সাহায্য করল ওদেরকে। হঠাৎ করে সাংঘাতিক ঘন হয়ে গেল কুয়াশা। দশ হাত দূরের জিনিসও চোখে পড়ে না।

কুয়াশার মধ্যে শোনা গেল চিৎকার, আরবিতে চেঁচিয়ে কথা বলছে ডাকাতেরা। কি ঘটছে আন্দাজ করতে পারছে কিশোর। রঙ করা হাতিটাকে তাড়া করেছে ওরা।

পরিকল্পনার একটা অংশ তো ঠিকঠাক মতই হচ্ছে। বাকিটা হবে তো? সাদা হাতিটা এখন ডাক ছাড়লেই হয়। কিশোর দেখেছে, এটা মাদী হাতি। কালোটা পুরুষ। ওটা বিপদে পড়েছে বুঝে ডাকাডাকি করবে তো? করলে কয়েকজন ডাকাত দেখতে আসতে পারে। তখন হামলা চালিয়ে কাবু করে ফেলা যাবে ওদের।

কিন্তু সাদা হাতিটা অতিমাত্রায় ভদ্র। চুপচাপ রইল। এত শোরগোলও যেন ওটার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙাতে পারল না। তবে কি ব্যর্থ হতে যাচ্ছে মুসার পরিকল্পনা?

আর বসে থাকা যায় না। মরিয়া হয়ে কিশোরই হাতির ডাক ডাকতে আরম্ভ করল। চিৎকারের পর চিৎকার।

সাড়া দিল ডাকাতেরা। হট্টগোল আর ছুটন্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল। দৌড়ে এল একজন ডাকাত।

মুহূর্তে তাকে কব্জা করে ফেলল পুলিশ। পিস্তল ব্যবহারের সুযোগই পেল না লোকটা, কেড়ে নেয়া হলো। ধরেই হাত-পা বাঁধা শেষ।

কুয়াশা ফুঁড়ে বেরিয়ে এল আরেক ডাকাত। তাকেও আটকে ফেলা হলো।

তারপর বেরোল তিনজন একসঙ্গে। দু-জনকে কাবু করে ফেলা গেল কোন গোলমাল ছাড়া, কিন্তু তৃতীয়জন পিস্তল তুলে গুলি করে বসল।

পড়ে গেল একজন পুলিশ।

গুলির শব্দ শুনে দল বেঁধে ছুটে এল ডাকাতেরা। দশ-বারোজন একসঙ্গে বেরিয়ে এল কুয়াশার আড়াল থেকে। প্রচণ্ড হাতাহাতি লড়াই বেধে গেল পুলিশ আর কুলিদের সঙ্গে।

শেষ পর্যন্ত পারল না ডাকাতেরা। আটক হলো। হাতে গুলি খেল কিশোরের সবচেয়ে ভাল যোদ্ধাদের একজন, হামবি। কিন্তু তারপরেও লড়াই বন্ধ করল না।

ওষুধ লাগিয়ে তার জখম বেঁধে দিতে চাইল কিশোর।

'ওসব পরে,' বলে এড়িয়ে গেল হামবি।

রঙ করা হাতিটাকে নিয়ে কি ঘটছে দেখার জন্যে দৌড়ে গেল মুসা। একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখল, ওটাকে ঘিরে ফেলেছে ডাকাতেরা। মোটা মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করছে। দুই দিকে হাতির ডাক শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে কয়েকজন ডাকাত। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কোনদিকে যাবে। যারা হাতির বেশি কাছে রয়েছে, তারা বুঝে ফেলেছে এটা রঙ করা হাতি, বিমূঢ় হয়ে গেছে এরা। ব্যাপারটা কি ঘটেছে মাথায়ই ঢুকছে না তাদের।

হঠাৎ আরেকটা হাতির চিৎকার কানে এল মুসার। এটা কিশোরের কণ্ঠ থেকে বেরোয়নি।

কি হয়েছে দেখার জন্যে দৌড়ে গেল সে। দেখল, সাদা হাতিটা সরে গিয়েছিল, ওটাকে ঘিরে ফেলেছে কয়েকজন ডাকাত। তলোয়ার দিয়ে খোঁচা মেরে মেরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে ওদের ক্যাম্পের দিকে। রাগে, যন্ত্রণায় চিৎকার করছে জানোয়ারটা।

ওদের নিষ্ঠুরতা দেখে মুসার মনে হলো এই লোকগুলোই হয়তো গাঁয়ে গিয়ে সেদিন কিশোর হাতিটার শুঁড় কেটেছিল।

কিন্তু সাদা হাতি ভদ্র হলেও সহ্যের একটা সীমা আছে। কত আর কষ্ট সহ্য করবে? আচমকা ঘুরে গিয়ে রুখে দাঁড়াল সে। এ রকম কিছু ঘটতে পারে আশা করেনি বোধহয় লোকগুলো। সরে যাওয়ারও সুযোগ পেল না। চোখের পলকে দু-জনকে দাঁত দিয়ে গেঁথে ফেলল হাতি। পা দিয়ে পিষে ভর্তা করে দিল আরেকজনকে। শুঁড় দিয়ে বাড়ি মেরে শুইয়ে দিতে লাগল নাগালে যাকে পেল।

সাদা হাতিটার চিৎকার শুনে সমস্ত বাধা পায়ে দলে পড়িমরি করে ছুটে এল কালো মদ্দা হাতিটা। আক্রমণ করে বসল ডাকাতদের।

দুটো খেপা হাতির আক্রমণ ঠেকানোর সাধ্য হলো না ডাকাতদের। ঘাবড়ে গিয়ে এদিক ওদিক দৌড় মারল। গিয়ে পড়ল পুলিশ আর কুলিদের খপ্পরে।

ওরা জিতে গেছে, বুঝতে পারল কিশোর। কিন্তু বজ্রমানবের কথা ভুলে গিয়েছিল সে।

কুয়াশা সরে এসে ঢেকে ফেলল কিশোরকে। কয়েক সেকেন্ড পর সেটা সরতেই দেখল, ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে শেখ।

কুটিল হাসি হাসল ডাকাত সর্দার। 'বাহ্, তুমি এখানে! তোমাকেই খুঁজছিলাম!'

খাপ থেকে পিস্তল খুলল সে।

'দাঁড়ান,' হাত তুলল কিশোর, 'আমার কাছে পিস্তল নেই। আমি শুনেছি, আরব যোদ্ধারা মুখোমুখি লড়াইয়ে নিরস্ত্র শত্রুকে হত্যা করে না। কাপুরুষতা মনে করে। আপনিও আরব। সাহস থাকলে পিস্তলটা ফেলে দিন। তারপর আসুন। দেখা যাক কে হারে, কে জেতে।'

পিস্তল ফেলল না শেখ, তবে খাপে ঢুকিয়ে রাখল।

'তুমি একজন আরব শেখকে কাপুরুষ বলো! এসো, দেখি, কতটা বাঘের বাচ্চা?'

বিশাল বপু নিয়ে দু-হাত বাড়িয়ে রেলইঞ্জিনের গতিতে কিশোরকে আঘাত করতে ছুটে এল শেখ।

শেষ মুহূর্তে পথ থেকে সরে গেল কিশোর। জুডোর কায়দা প্রয়োগ করল শেখের ওপর। লোকটার নিজের ওজন আর শক্তিকে কাজে লাগিয়েই কাবু করার চেষ্টা করল তাকে।

বিফল হলো না। দড়াম করে মুখ নিচু করে পাথরের ওপর আছড়ে পড়ল যেন পাহাড়। মাথা ঠুকে গেল ভীষণ ভাবে। অজ্ঞান হয়ে গেল।

যে কোন মুহূর্তে জ্ঞান ফিরে আসতে পারে লোকটার। সঙ্গে দড়ি নেই। তাড়াতাড়ি শেখের লম্বা আলখেল্লা ছিঁড়ে ফালি করে দড়ি পাকিয়ে তার হাত-পা বেঁধে ফেলল কিশোর।

চোখ মেলল শেখ। হাত-পা নড়ানোর চেষ্টা করে পারল না। বুঝতে পারল, আর কিছু করার নেই তার। চুপ হয়ে গেল।

কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল পুলিশেরা, সঙ্গে মুংগা। অবাক হয়ে একবার তাকাতে লাগল পড়ে থাকা দানবটার দিকে, একবার কিশোরের দিকে।

'ওরা বলছে,' মুংগা বলল কিশোরকে, 'আপনি সাদা মানুষের জাদু ব্যবহার করেছেন। নইলে এই দৈত্যের সঙ্গে পারতেন না। আপনাকে পিষে ফেলত।'

'জাদুই,' মুচকি হাসল কিশোর, 'তবে সাদা মানুষের নয়। এশিয়ানদের।'

কুলিদের সহায়তায় বন্দিদের নিয়ে চলে গেল পুলিশ।

কিশোর-মুসা রয়ে গেল। তাদের অন্য কাজ আছে।

খুদে দানবকে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রেখে একজন লোককে তার পাহারায় রেখে দিয়েছিল মুসা। এখন দেখল, বড় হাতি দুটোর সঙ্গে গিয়ে বন্ধুত্ব করে ফেলেছে বাচ্চাটা। তার পরিকল্পনার এটাও একটা অংশ ছিল।

হাতির স্বভাব ভাল করে জানা আছে তার। মা-হারা বাচ্চা হাতিকে দেখাশোনার ভার পড়ে অন্য বয়স্ক মাদী হাতির ওপর। স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব নিয়ে নেয় হস্তিনী। 'খালা' হয়ে যায় শিশুটার। প্রয়োজন পড়লে তাকে নিজের দুধ খাইয়েও বাঁচিয়ে রাখে।

মুসা দেখল, বাচ্চাটার সঙ্গে শুঁড় জড়াজড়ি করে আদর করছে সাদাটা। গলার ভেতর বিচিত্র ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে দুটোরই। এ যেন আদর করে চুমু খাওয়ার সঙ্গে সোহাগের কথা।

মুসাকে দেখেই আনন্দে চিৎকার করতে করতে তার দিকে ছুটে এল খুদে দানব।

ক্যাম্পে যাওয়ার জন্যে তাকে নিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল মুসা।

এইবার হবে অগ্নিপরীক্ষা। শিশু হাতির মায়ায় সাদাটা কি আসবে সঙ্গে সঙ্গে? লড়াইয়ের আগে হলে এককথা ছিল, কিন্তু এখন মানুষের ওপর ঘৃণা জন্মেছে হাতিটার, নিষ্ঠুর ভাবে তাকে তলোয়ার দিয়ে খুঁচিয়েছে মানুষ। শত্রু আর বন্ধুর পার্থক্য কি বুঝতে পারবে? জোর খাটিয়ে তাকে বন্দি করা যায়নি, মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে কি টেনে আনা যাবে?

বাচ্চাটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হাতিটা।

বাচ্চাটা একশো গজ সরে গেল...দুশো গজ...তবু নড়ছে না সে।

খালা যে আসছে না এতক্ষণে খেয়াল করল খুদে দানব। ফিরে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল।

হাতির ভাষা না জানলেও আন্দাজ করতে পারল কিশোর-মুসা, কি বলছে বাচ্চাটা। আদুরে গলায় বলছে ওটা—প্লীজ, খালা, এসো না আমাদের সঙ্গে! তোমাকে আমার ভাল লেগেছে!

এই ডাক উপেক্ষা করার ক্ষমতা নেই মাদী হাতির। কেঁদে উঠল মায়ের

অন্তর। জবাব দিল–ঠিক আছে, খোকা, আসছি! দাঁড়া!

এক পা দু-পা করে এগোতে শুরু করল শ্বেতহস্তী। গতি বাড়ছে। এগিয়ে আসতে লাগল হেলেদুলে। একবার দ্বিধা করে কালো হাতিটা পিছু নিল সাদাটার। সে-ও সঙ্গিনীকে হারাতে রাজি নয়।

তাদেরকে এগিয়ে আনার জন্যে আনন্দে চিৎকার করে ছুটে গেল বাচ্চাটা। দুটোর মাঝখানে থেকে গায়ে গা ঠেকিয়ে জড়াজড়ি করে নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। যেন বাবা-মাকে পেয়ে গেছে। এগোল কিশোরদের ক্যাম্পের দিকে।

স্তব্ধ হয়ে প্রাণী জগতের এক অপার বিস্ময় দেখছে দুই গোয়েন্দা। চোখে জল এসে গেল ওদের। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে, খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে ওরাও এগোল হাতিগুলোর পেছন পেছন।

***

ভলিউম ৫৪

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা।

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০